কাজী নজরুল ইস্‌লাম

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

স্মৃতি কথা

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

প্রথম সংস্করণ :
সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক :
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট
কলিকাতা-১৬

গ্রন্থণ :
কৃষ্ণা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬৭ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : শ্রীগণেশ বসু

উৎসর্গ

আবদুল হালীমকে

হালীম,

‘কাজী নজরুল প্রসঙ্গে :: স্মৃতিকথা’ নামক আমার ছোট্ট পুস্তকখানা তোমাকে দিয়েছিলেম। এই বড় পুস্তকখানা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত নূতন-লেখা হলেও এখানাও কাজী নজরুল ইস্‌লাম সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথাই। এই কারণে এখানাও তোমারই প্রাপ্য।

ভূমিকা

আমার এই পুস্তকখানা আমার লেখা 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে :: স্মৃতিকথা'র পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ নয়। এখানা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত নুতন-লেখা পুস্তক।

'বিংশ শতাব্দী' নামক মাসিক পত্রের কয়েকটি সংখ্যায় কাজী নজরুল ইস্‌লাম সম্বন্ধে আমি আমার স্মৃতিকথা লিখেছিলেম। সেই লেখাগুলিতে কোনো কোনো স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে, আবার কোথাও বা কিছু যোগ ক'রে 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে :: স্মৃতিকথা' নাম দিয়ে ১৬৬ পৃষ্ঠার একখানা বই ১৯৫৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশ করেছিলেন 'বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী'। প্রথম মুদ্রণের ২২০০ খানা বই বিক্রয় হতে সময় লেগেছিল তিন বছরেরও বেশী।

প্রথমে মাসিক পত্রিকার জন্যে লেখা হয়েছিল ব'লে 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে'তে আমি আমার কথাগুলি শুধু যে সংক্ষেপে বলেছি তা নয়, তাতে অনেক কথা আমি একেবারেই বলিনি। আমার অসাবধানতার বশে সেই লেখার ভিতরে আবার কিছু ভুল তথ্যও ঢুকে গিয়েছিল। এই সকল কারণে আমি পুস্তকখানার দ্বিতীয় মুদ্রণে রাজী হইনি। ভেবে দেখেছি যে তার একটি পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বা'র করলেও আমার কথাগুলি বলা সম্ভব হবে না।

১৯৫৩ সালে জেলে বন্দী থাকা অবস্থাতেই আমি স্থির করি যে কাজী নজরুল ইস্‌লাম সম্বন্ধে আমি আমার স্মৃতিকথা নূতন

ক'রে লিখব এবং আমার জানা কথাগুলি আমি সকলকে ব'লে যাব। আমার বয়স আমার বিরুদ্ধে ছিল। তবুও আমার সিদ্ধান্ত আমি বাইরে বন্ধুদের জানাই। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার ওপরে একটি বড় অস্ত্রোপচারের পূর্বক্ষণে আমি মুক্তি পাই। তারপরে, ১৯৫৪ সালের ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত আমি বাইরে থাকি। অস্ত্রোপচার জনিত দুর্বলতার কারণ তো ছিলই, তা ছাড়া, আরও অনেক কারণে 'কাজী নজরুল ইস্‌লাম : : স্মৃতিকথা'র লেখা শুরু করতে আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল। আবার যখন ১৯৫৪ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে আমি জেলে এলাম তখন পুস্তকখানার ৪৮ পৃষ্ঠা মাত্র ছাপা হয়েছে এবং আরও ৪৮ পৃষ্ঠা ছাপা হওয়ার মতো পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আছে। সমস্ত পুস্তক আগে লিখে ফেলব, তারপরে তা ছাপাবার জন্যে প্রেসে পাঠাব,—এই পথে আমি যাইনি, যদিও এই পথই সঠিক পথ। কিন্তু সঠিক পথে চললে আমার এই পুস্তক লেখা ও ছাপা হতো না।

জেলে যাঁরা বিনা বিচারে রাজনীতিক বন্দী হন তাঁদের লেখা চিঠি-পত্র ইত্যাদি সব কিছুই পুলিসের দ্বারা সেন্সর হয়ে বাইরে যায়। আমার লেখাও সেই ভাবে বাইরে যেতে পারত। তবুও আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের হোম ডিপার্টমেণ্টের নিকট হতে আমার পুস্তকখানা লেখার ও ছাপানোর জন্যে একটা বিশেষ অনুমতিও নিয়েছিলেম। সেন্সরিং-এর কাজটা অবশ্য পুলিসরাই করেছেন। তাঁরাও তো হোম ডিপার্টমেণ্টেরই লোক!

কাজী নজরুল ইস্‌লাম যখন সুস্থ ছিল তখন তার সম্বন্ধে আমি আমার স্মৃতিকথা লিখব, একথা কোনো দিন স্বপ্নেও আমার মনে আসে নি। সে বয়সে আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট। সে যদি কোনো দিন তার স্মৃতিকথা লিখত তবে তাতেই তো আমার সম্বন্ধে তার কিছু লেখার কথা। আমার চোখের সামনে সে যে এমন ব্যাধিগ্রস্ত ও জীবন্মৃত হয়ে যাবে তা কি আমি কোনো দিনও ভাবতে পেরেছিলেম?

১৯২০ সালে বাঙলার কাব্যক্ষেত্রে নজরুলের আগমনে সকলে চমকিত হয়েছিলেন। উনিশ শ' বিশের দশকেই তার লেখা নিয়ে বাঙলা ও ইংরেজি কাগজের সাহিত্যিক স্তম্ভে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। উনিশ শ' ত্রিশের দশকে তার সৃজন-কর্ম ছিল আরও বিরাট ও বিশাল। তা সত্ত্বেও, চল্লিশের দশকে তার ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সম্বন্ধে সব আলোচনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি খুবই মর্ম্মপীড়া বোধ করতাম। কিন্তু ১৯৫১ সালে তিন বছরের কিছু বেশী দিন পরে জেল হতে ফিরে এসে যখন দেখলাম যে নজরুল সম্বন্ধে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে তখন আমার আনন্দের আর সীমা থাকল না। আরও কিছু পরে দেখা গেল যে নানা স্থানে নজরুলের জন্মদিবসও পালিত হচ্ছে। এই সময়েই আবার কেউ কেউ তাঁদের স্মৃতি হতে নজরুলের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা কাগজে ছাপানো শুরু করেছিলেন। এই সবের অনেকগুলি অতিরঞ্জিত ও ভুল তথ্যে ভরা থাকত, দু' একটি হতো আগাগোড়া বানানো কথা। যে-সব কথা আমার জানার চৌহদ্দীর ভিতরে ছিল সেগুলি সম্বন্ধেই শুধু আমি আমার মত প্রকাশ করছি। মনে রাখতে হবে যে সব ঘটনা আমার জানা থাকার কথা নয়।

ওপরে লেখা কারণেই কাজী নজরুল ইস্‌লাম সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লেখার বাসনা আমার মনে প্রথমে জাগে। আমি ভাবলাম আমি যা জানি তা সকলকে আমার ব'লে যাওয়া উচিত। তাতে অনেকে অনেক নূতন তথ্য জানতে পাবেন। নজরুল ইস্‌লামের চরিতকাররাও তা থেকে তাঁদের দরকারের কিছু কিছু মাল-মসলা পেয়ে যাবেন।

এই পুস্তকখানার নাম হতেই সকলে বুঝতে পারবেন যে আমি নজরুল সম্বন্ধে শুধু আমার স্মৃতিকথাই লিখেছি, তার জীবনী আমি লিখিনি। জীবনী লেখার জন্যে যে-কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এই বয়সে (১৯৬৫ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে আমার বয়স ছিয়াত্তর বছর পুরো হবে) তা করার মতো শক্তি-সামর্থ্য আমার নেই।

তবে, এই স্মৃতিকথা যথাসম্ভব তথ্যনিষ্ঠ করার চেষ্টা আমি করেছি। হয় তো সব জায়গায় সফলকাম হতে পারি নি।

নজরুল ও মোহিতলাল সম্পর্কিত বিতর্কের বিচার যাতে পাঠকেরা নিজেরাই করতে পারেন তার জন্যে কবি মোহিতলাল মজুমদারের "আমি" ও কবি নজরুল ইস্‌লামের "বিদ্রোহী," আর নজরুল ইস্‌লামের "সর্বনাশের ঘণ্টা" (সাবধানী ঘণ্টা) ও মোহিতলালের "দ্রোণ-গুরু" আমি এই পুস্তকে পাশাপাশি তুলে দিয়েছি। "বিদ্রোহী" প্রায় সকলেই পড়েছেন কিংবা এখনও পড়ছেন, কিন্তু "আমি" পড়েছেন অল্প ক'জন লোক। আবার "সর্বনাশের ঘণ্টা" ('সাবধানী ঘণ্টা') ইচ্ছা করলেই যে কেউ পড়তে পারছেন, কিন্তু "দ্রোণ-গুরু" ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র একটি বিশেষ সংখ্যায়। এই সংখ্যাটি এখন দুষ্প্রাপ্য। 'মানসী'তে মুদ্রিত 'আমি' শীর্ষক লেখাটির একটি বাক্য হতে কোনো অর্থই বা'র হচ্ছিল না। 'মানসী' ছাপা হওয়ার সময়ে এধারের অক্ষর ওধারে সরে গিয়েছিল। সেই অক্ষর বাঁ দিকে টেনে আনায় বাক্যটি এই রকম দাঁড়িয়েছে: "আমি তাপসী মহাশ্বেতার নয়নসলিলার্দ্র তন্ত্রী বীণা"। কিন্তু আমার মনে হয় 'তন্ত্রী' শব্দটির আগে একটা কিছু ছিল। আমি নিজে এবিষয়ে কিছু জানিনে, তবে জানতে চেয়েছি অনেকের নিকটে। কেউ আমায় জানাতে পারলেন না যে 'তাপসী মহাশ্বেতা' কোন্ ধরনের বীণা বাজাতেন।

কারাবাসের সময়ে পুস্তক অনেকেই লিখেছেন। আমি জেলে ব'সে এই পুস্তকখানা শুধু লিখিনি, তার কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কয় পৃষ্ঠা বাইরে ছাপাও হয়েছে। ফলে, ঘষে-মেজে ভাষাকে কিঞ্চিৎ পরিচ্ছন্ন করার সুযোগ পাওয়া যায় নি। জেলের ভিতরের ও বাইরের টানা-পোড়েনের কারণে কিছু ছাপার ভুলও রয়ে গেছে। আমার অবস্থা বিবেচনা ক'রে আশা করি, পাঠকেরা এই দু'টি ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবেন।

নজরুলের সাহিত্য সম্বন্ধে যে একটি অধ্যায় এ পুস্তকে

যোগ করার ছিল তা আর দেওয়া হলো না। কারণ, পুস্তকের কলেবর আর বাড়ানো সম্ভব নয়।

বন্দীদশায় আমার 'কাজী নজরুল ইস্‌লাম ঃঃ স্মৃতিকথা'র লেখা ও ছাপা যে শেষ হলো তার জন্যে আমার খুবই আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যার সম্বন্ধে স্মৃতিকথা আমি লিখলাম ব্যাধিগ্রস্ত ও প্রায় জীবন্মৃত সেই কবি নজরুল ইস্‌লামের কথা মনে ক'রে আমার মন আজ বেদনায় ভরেও উঠেছে।

নজরুল নিজের জীবনে ও মানুষের মনে দীর্ঘজীবী হো'ক।

দমদম সেন্‌ট্রাল জেল,
কলকাতা-২৮

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

ধন্যবাদ

সকলের আগে আমি ধন্যবাদ জানাই ডক্টর মহাদেব সাহাকে। তিনি ছাড়া আর কে যে এই পুস্তকের জন্যে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার দৈনিক পত্রের ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারতেন তা আমি জানিনে। শুধু দৈনিক পত্রের ফাইলই নয়, এই একই কারণে ওই রকম পুরানো সরকারী খাতা-পত্রও তিনি খোঁজাখুঁজি করেছেন। জেলে না থেকে আমি আজ বাইরে থাকলেও আমাকে দিয়ে যে এই রকম কঠিন কাজ হতোনা তা সুনিশ্চিত। আমার এই পুস্তকখানাকে তথ্যনিষ্ঠ করার জন্যে যে চেষ্টা তিনি করেছেন তা কখনও ভুলবার নয়।

আমাদের বন্ধু শ্রীঅরুণকুমার রায় অনেক পরিশ্রম স্বীকার ক'রে এই পুস্তকের নির্ঘণ্ট তৈয়ার ক'রে দিয়েছেন। নির্ঘণ্ট না থাকলে এত বড় একখানা পুস্তকের কোনো মূল্যই থাকত না। তাঁকে যে কি ব'লে ধন্যবাদ জানাব তার ভাষা আমি জানিনে।

আমি ধন্যবাদ জানাই ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মী ও তরুণ কবি কমলেশ সেনকে। ১৯৬৩ সাল হতেই তিনি এই পুস্তকের জন্যে মাল-মসলা জোগাড় করেছেন। ৫১ বছর আগে রচিত কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের "আমি" শীর্ষক লেখাটি "মানসী" নামক মাসিক পত্রিকা হতে কপি ক'রে এনেছিলেন তিনিই।

আমি স্থির করেছিলেম যে নজরুলের 'সর্বনাশের ঘণ্টা' 'কল্লোলে'র মুদ্রণ হতেই এই পুস্তকে তুলে দেব। কিন্তু ১৩৩১

বঙ্গাব্দের পুরানো 'কল্লোল' কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত একজন অচেনা বন্ধু চৈতন্য লাইব্রেরীতে গিয়ে কবিতাটি পুরানো 'কল্লোল' হতে কপি করে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মী শ্রীবরুণ সরকারের মারফতে পাঠিয়ে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা-পাশে বেঁধেছেন।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশন বিভাগের কর্মী ও তরুণ কবি শ্যামসুন্দর দে এবং গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেডের মুদ্রাকর সমীর দাশগুপ্ত এই পুস্তক মুদ্রণের সময়ে আমার নিকট হতে কেবলই বকুনি খেয়েছে। দোষ তাদের যে ছিলনা তা নয়, কিন্তু তাদের আসল দোষ হচ্ছে এই যে তারা আমার চোখের সামনে ছোট থেকে বড় হয়েছে। সব কথা ছেড়ে দিয়ে, আজ যে তাদের হাত দিয়ে আমার 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃঃ স্মৃতিকথা' দিনের আলো দেখতে পেল তার জন্যে আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

আমি ধন্যবাদ জানাই গণশক্তি প্রিন্টার্সের সকল কর্মীকে,—তাঁদের ভিতরে যাঁরা আমার পুস্তক মুদ্রণের জন্যে পরিশ্রম করেছেন তাঁদের তো বটেই, যাঁরা পরিশ্রম করেন নি তাঁদেরও, কারণ, পুস্তকখানা ভালোয় ভালোয় বা'র হো'ক, এই সদিচ্ছা তাঁদেরও ছিল।

নজরুলের দুই ছেলে—কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ এই পুস্তক লেখার সময়ে নানা ভাবে সাহায্য করেছে। এই জন্যে আমি তাদেরও ধন্যবাদ ও স্নেহাশিস্ জানাই।

আমার পুস্তকখানা প্রকাশ করার জন্যে আমি ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডকে ধন্যবাদ জানাই, আর ধন্যবাদ জানাই এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীকে। পুস্তকখানার প্রকাশে তাঁদের প্রত্যেকের আগ্রহের অন্ত ছিল না।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচয় ও প্রথম সাক্ষাৎ

কি করে কাজী নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ও তার পরে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই কথাই বলছি। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে কলকাতার একটি সাহিত্য সংগঠনের নাম ছিল "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"। বহুজনের সহযোগে আমিও এই সংগঠনটিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেম।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি

মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব ছিলেন সমিতির সম্পাদক। তিনি কিন্তু "মোস্‌লেম ভারতে"র পরিচালক আফ্‌জালুল হক সাহেবের পিতা শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক সাহেব নন। তাঁর বাড়ী বাকেরগঞ্জ জিলার ভোলা শহরের নিকটবর্তী বাফ্‌তা গ্রামে। দু'-জনই কবি ও একই নামের ছিলেন বলে অনেক সময়ে বুঝতে ভুল হয়ে যায়। স্কুলসমূহের অবসর প্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর মৌলবী আবদুল করীম ছিলেন সমিতির সভাপতি। আমি ছিলেম সমিতির সহকারী সম্পাদক।

বাঙলা ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে (খ্রীস্টাব্দ ১৯১৮ সালের এপ্রিল-মে মাস) সমিতির একখানা ত্রিমাসিক মুখপত্র বা'র হয়

নাম দেওয়া হয়েছিল "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"। এই পত্রিকা যখন প্রথম বার হয় তখনও সমিতির আফিস ছিল ৪৭/১, মির্জাপুর স্ট্রীটের (এখন নাম সূর্য সেন স্ট্রীট) বাড়ীর নীচের তলার একখানা ঘরে। সমিতির কাজ বেড়ে যাওয়ায়, তার ওপরে পত্রিকাখানা বা'র হওয়ায়, এই একখানা ঘরে আর জায়গায় কুলাচ্ছিল না। আমরা তখন বড় জায়গায় উঠে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি এবং ৩২, কলেজ স্ট্রীটের দোতালায় রাস্তার দিককার অংশে বেশ বড় জায়গা পেয়েও যাই। এটা ১৯১৮ সালের শেষার্ধের কোনও একটি মাসের কথা। এই সময়েই আমি সমিতির সব-সময়ের কর্মীও হয়ে যাই। একজন কাউকে সব কিছুর ভার নিয়ে না থাকলে আর কাজ চলছিল না। আমার সব-সময়ের কর্মী হওয়ার আগে কবি শাহাদৎ হুসয়ন ও পাবনার আবু লোহানী সামান্য এলাউন্স নিয়ে কিছু দিন সমিতির আফিসে কাজ করেছিলেন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসের শুরু হতে আমি সমিতির বাড়ীতে থাকাও আরম্ভ করি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌) ও মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব ছিলেন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব তখনও বশিরহাটে ওকালতি করতেন। পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে তিনি তেমন নজর দিতে পারতেন না। পরে অবশ্য তিনি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার হয়ে আসেন। সেই সময়ে তিনি কিছু দিন "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"'র বাড়ীতেও আমার সঙ্গে একই ঘরে ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরে তিনি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুরোধে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান।

৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের (49th Bengali Regiment) কয়েকজন সৈনিক শুরু হতেই, অর্থাৎ ১৯১৮ সালের এপ্রিল-মে মাস

হতেই "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"র গ্রাহক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে পত্রালাপও করতেন। কাজী নজরুল ইস্‌লামও এই পত্রালাপকারীদের একজন ছিল। আমি সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলাম বটে, কিন্তু তার সব রকম কাজই আমায় করতে হত। পত্রিকার মোড়কগুলি আমি লিখতাম, পত্রিকার প্যাকেটগুলি ডাকে দিতাম আমিই এবং সমিতি ও পত্রিকা-সংক্রান্ত সমস্ত চিঠিপত্রও আমাকেই লিখতে হত। এমন কি পত্রিকার কিঞ্চিৎ সম্পাদনাও মাঝে মাঝে আমায় করতে হত। শহীদুল্লাহ সাহেবের কথা আমি আগে বলেছি। বি. এ. পাস করার পর হতে মোজাম্মেল হক সাহেব খুব আন্তরিকভাবে সমিতির কাজ করছিলেন। তবে, তাঁর সময় বড় কম ছিল। তিনি ল' ও এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রথমে বেকার হোস্টেলের এসিস্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ও পরে কারমাইকেল হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তার ওপরে তিনি ব্যারাকপুর গবর্নমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রিন্টিং ও পাবলিশিং কোম্পানীও তিনি গড়ে তুলছিলেন। কাজেই, নজরুল ইস্‌লামদের ও অন্যদের সঙ্গে পত্রালাপের কাজও যে আমাকেই করতে হতো তা বলা বাহুল্য। এই ভাবেই চিঠিপত্রের মারফতে ১৯১৮ সালে কাজী নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। এই সব পত্রে সে যে শুধু আমাদের কুশল সংবাদ জানতে চাইত তা নয়, আমাদের পত্রিকায় ছাপানো লেখা সম্বন্ধেও তার মতামত সে আমাদের জানাত। বর্ধমান জিলার অধিবাসী একজন জমাদার ছুটিতে এসে আমার সঙ্গে দেখাও করে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম কিছুতেই মনে করতে পারছিনে।

"কাজী নজরুল প্রসঙ্গে"র এগারোর পৃষ্ঠায় আমি লিখেছি :

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় ছাপানোর জন্যে নজরুল

যখন প্রথম লেখা পাঠিয়েছিল (১৯১৮ সনে) তখন হতেই তার সঙ্গে আমার পত্র লেখালেখি শুরু হয়।'

এখানে আমার অসাবধানতা যে প্রকাশ পেয়েছে তা আমায় স্বীকার করতেই হবে। এর একটি কারণ, আমি কম জায়গায় বেশী কথা বলার চেষ্টা করেছি। অন্য কারণ, লেখার সময়ে আমার হাতের কাছে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" ছিলনা। তাই, আমার স্মৃতি আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পেরেছে। ১৯১৮ সালে নজরুল ইস্‌লাম "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছাপানোর জন্যে কোনো লেখাই পাঠায় নি। সে আমাদের প্রথম লেখা—একটি কবিতা—পাঠিয়েছিল ১৯১৯ সালে।

আমি কবি বা সাহিত্যিক নয়। কাব্য বা সাহিত্যের আমি যে একজন সমঝ্‌দার সে-কথাও জোর গলায় প্রচার করার অধিকার আমার নেই। তবুও নজরুল ইস্‌লামের এই প্রথম কবিতাটির পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেম। সমালোচক ও সমঝ্‌দাররা এই কবিতাটির তারিফ করেন নি। কেউ কেউ বলেছেন কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। যিনি যা কিছু বলুন না কেন আমি কিন্তু নজরুল ইস্‌লামের এই কবিতাটিতে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেম। তার এই কবিতা এবং "হেনা" ও "ব্যথার দান" প্রভৃতি ছোট গল্প পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে বঙ্গ সাহিত্যে একজন শক্তিশালী কবি ও সাহিত্যিকের উদ্ভব হতে যাচ্ছে। আমি মনে মনে ভাবলুম কবিতাটিকে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছাপাতে তো হবেই, আর তার "কোরক"-এর স্তম্ভ হতেও তাকে বাঁচাতে হবে। "সাহিত্য পত্রিকা"য় "কোরক" শিরোনাম দেওয়া একটি স্তম্ভ ছিল। তাতে নূতন কবিদের কবিতা বর্জাইস টাইপে ছাপা হতো। এটি ছিল মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেবের অতি প্রিয় বিভাগ, আর আমার দু'চোখের বিষ। কারণ, ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা এই 'কোরকে'র স্তম্ভের

জন্যে আসত। তার অল্প ক'টি মাত্রই আমরা ছাপতে পারতাম। নজরুল ইস্‌লামের কবিতাটি অনেককে পড়িয়ে তার পক্ষে একটা আবহাওয়া আমি এই ভেবে তৈয়ার করে রেখেছিলেম যে "কোরকে" না ছাপানো নিয়ে মোজাম্মেল হক সাহেবের সঙ্গে আমার হয়তো মতভেদ ঘটতে পারে। এরূপ মতভেদ ঘটলে অন্যদের মতের চাপে তাঁকে নোয়াতে হবে এই ছিল আমার ইচ্ছা। কিন্তু মোজাম্মেল হক সাহেবের সঙ্গে আমার এই নিয়ে কোনো মতভেদ ঘটেনি। তাঁর পূর্ণ সমর্থনে কবিতাটির নামও বদলে দেওয়া হয়েছিল। সাধারণত কবিতা সম্বন্ধে আমি নির্লিপ্ত থাকতেম, কিন্তু কেন জানিনে, নজরুল ইস্‌লামের কবিতাটির বিষয়ে আমি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেম। অর্থাৎ, কবির কাঁচা রচনার কাঁচা সমঝ্‌দার বনে গিয়েছিলেম।

১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যক (খ্রীস্টীয় হিসাবে ১৯১৯ সালের জুলাই-আগস্ট মাস) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় নজরুল ইস্‌লামের "মুক্তি" শীর্ষক কবিতাটি ছাপা হয়। যতটা জানা গিয়েছে এটিই ছিল তার প্রথম পত্রিকায় ছাপানো কবিতা। তার আগেও সে অনেক কবিতা লিখেছে, কিন্তু এটিই প্রথম ছাপা হয়েছিল। কাঁচা লেখা মনে করে তার কোনো পুস্তকে এই কবিতাটিকে সে স্থান দেয় নি। তা হলেও কবিতাটি রক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। নীচে পুরো কবিতাটিই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা হতে তুলে দেওয়া হলো।

মুক্তি শীর্ষক কবিতা

মুক্তি *

রাণীগঞ্জের অর্জুনপটির বাঁকে,—
যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে বৌ কলস কাঁখে—
সেই সে বাঁকের শেষে
তিন দিক হতে তিনটে রাস্তা এসে'
ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিশে'
তেপথার সেই 'দেখাশুনা' স্থলে
বিরাট একটা নিম্ব গাছের তলে,
জটওয়ালা সে সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধত সেথা
গাঁজার ধুঁয়ায় পথের লোকের আঁতে হোত বেথা ;
বাবাজিদের 'ধুনি' দেওয়ার তাপে—
না সে তপের প্রতাপে—
গাছে মোটেই ছিল না'ক পাতা,
উলঙ্গ এক প্রেত সে যেন কঙ্কালসার তুলেছিল মাথা—
ভুলে যাওয়ার সে কোন্ নিশিভোর,
'আজান' যখন শহুরেদের ভাঙলে ঘুমের ঘোর,
অবাক হয়ে দেখলে সবাই চেয়ে,
শুক্‌নো নিমের গাছটা গেছে ফলে ফুলে ছেয়ে !
বাবাজিরাও তল্পি বেঁধে রাতেই
সটকেছেন সব ; বোধ হয় পড়েছিলেন বেজায় কাতেই।

* ইহা সত্য ঘটনা। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে এই দরবেশের কথিতরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পবিত্র সমাধি এখনও "হাত বাঁধা ফকিরের মজারশরিফ" বলিয়া কথিত হয়। —নজরুল ইস্‌লাম।

অত ভোরেও হোথা
হট্টগোলের লাগ্‌ল একটা বিষম জনতা।
দেখে কিন্তু লাগল সবার তাক্,
এ কোন্ মহাব্যাধিগ্রস্ত অবধূত নির্বাক ?
সে কি ভীষণ মূর্তি !—
ঈষৎ তার এক চাহনিতে থেমে গেল
গোলমাল সব স্ফূর্তি।
জট পাকান বিপুল জটা,
মেদিনী-চুম্বিত শ্মশ্রু, গুম্ফগুলো কটা,
সে এক যেন জটিলতার সৃষ্টি—
অনায়াসে সইতে পারে ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি,
পাদুটা তার বেজায় খাটো বিঘৎ খানিক মোটে,
দন্তপ্রাচীর লঙ্ঘি অধর ছুঁতেই পায়না ঠোঁটে,
চক্ষু ডাগর, নাকটা বেজায় খাঁদা
মস্ত দুটো লোহার শিকল দিয়ে হাত দুটো
তার সব সময়ই বাঁধা,
ভাষাটা তার এতই বাধো বাধো,
কইলে কথা বোঝাই যায়না আদৌ ;
ওপথ বেয়ে যেতে
দুষ্টু ছেলে যা তা দেয় খেতে
ফকিরও সে এমনি সোজা নেবেই তা মুখ পেতে,
বিষ হোক্ চাই অমৃত হোক।

দেখে অবাক লোক !
শহরে সে কতই কাণাঘুষি,—
কেউ বলে 'চাঁদ তল্লি বাঁধ, তুমি শুধুই ভুসি'।

কেউ বলে ভাই কাজ কি বকাবকির ?
হতেও পারে জবরদস্ত ফকির !
এই রকম সে নানান্ কথা বলে যার যা খুশি !
মৌন ফকির হাসে মুচকি হাসি !

* * *

দেখতে দেখতে এমনি ক'রে
নিম গাছটার দু'বার পাতা গেল ঝ'রে।
ফকির তেমনি থাকে,—
হঠাৎ সেদিন সেই পথেরি বাঁকে
নিশিভোরেই
বোঝাই গরুর গাড়ী হেঁকে যাচ্ছিল খুব জোরেই
খোট্টা গাড়োয়ান
ভৈরবীতে গেয়ে গজল গান।
'হো হো' করে হঠাৎ ফকির উঠল বিষম হেসে।
গাড়ী শুদ্ধ দামড়া বলদ চম্‌কে উঠে এসে
পড়ল হঠাৎ ফকিরেরই ঘাড়ে,
চাকা দুটো চলে' গেল একেবারে বুকের হাড়ে,
মড় মড়িয়ে উঠল পাঁজর যত !—
গাড়োয়ান ত বুদ্ধিহত
ক্ষ্যাপার মত ছুটোছুটি করছে থতমত !
পুলিস ছিল কাছেই
গাড়োয়ানেরে ধরে বাঁধলে ঐ নিম্বগাছেই।
লাগল হুড়োহুড়ি
তেমন ভোরেও লোক জম্‌ল সারাটা পথ জুড়ি।
রক্তাক্ত সে চূর্ণ বক্ষে বদ্ধ দুটি হাত
থুয়ে ফকির পড়ছে শুধু কোরানের আয়াত
হয়নি মুখে আদৌ বেথার কোমল কিরণ পাত

স্নিগ্ধ দীপ্তি সে কোন জ্যোতির আলোয়
ফেললে ছেয়ে বাইরের সব কুৎসিত আর কালোয়
সে কোন্ দেশের আনন্দগীত বাজ্‌ল তারি কানে,
সেই-ই জানে,—
শিশুর মত উঠল হেসে চেয়ে শূন্যি পানে।
ধ্যানমগ্ন ফকির হঠাৎ চমকে উঠে' চায়
কুণ্ঠিত সে গাড়ীওয়ালা গাছে বাঁধা হায়,
প্রহার-ক্ষতে রক্ত বয়ে যায়!
আকুল কণ্ঠে উঠল ফকির কেঁদে,—
'ওগো আমার মুক্তি দাতায় কে রেখেছে বেঁধে,
এ কোন জনার ফন্দি,
বাঁধন যে মোর খুলে দিলে তায় করেছে বন্দী!'
ভোরের সারা আকাশ আলো ব্যেপে
উঠল কেঁপে কেঁপে
দরবেশের সে ব্যাকুল বাণী অমৃত নিষ্যন্দী!—
চিরবদ্ধ হাতের শিকল অমনি গেল খুলে,
ঝুলি হতে দশটি টাকা তুলে,
লাল-পাগড়ির হাতে গুঁজে বল্‌লে, 'শুন ভাই
কোন দোষ এর নাই,
নির্দোষ এ অবোধ গাড়োয়ান,
এ ম'লে যে মরবে সাথে তিনটি ছোট্ট জান!'
নিমের ডালে হাজার পাখী উঠল গেয়ে গান!
পায়ে ধরে কেঁদে পুলিস কয়,
'এও কখন হয়?
ওগো সাধু, অর্থ লালসায়
আমি শুধু হব কি আজ বঞ্চিত দয়ায়?

তা হবেনা কভু
পরশমণির বিনিময়ে পাথর নেব প্রভু' ?
বুক বেয়ে তার ঝরে অশ্রুনীর—
দু' হাত ধরে' তুলে' তায় ফকির
বলে 'বাবা মোছ এ অশ্রুলোর
মুক্তি হবে তোর !—
ঐ যে মুদ্রাগুলি
গাড়োয়ানে দে তুলি—'
নিম্বগাছের সকল পাতা
ঝরঝরিয়ে পড়ল ঝরে—আর হ'লনা কথা।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম
(হাবিলদার, বঙ্গবাহিনী ; করাচি।)

"মুক্তি" শীর্ষক কবিতাটি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছাপা হওয়ায় খুশী হয়ে নজরুল ইস্‌লাম তার সম্পাদককে একখানা পত্র লিখেছিল। কি ক'রে জানি না, লেখার বহু বৎসর পরে এই পত্রখানা প্রথম ঢাকা হতে কাগজে ছাপা হয়। পরে ঢাকা হতেই প্রকাশিত "নজরুল রচনা সম্ভার" নামক পুস্তকেও (প্রকাশ কাল ২৫শে মে, ১৯৬১ সাল) তা স্থান পেয়েছে। কলকাতার "বিংশ শতাব্দী" মাসিক পত্রিকায়ও তা আরও অনেক পরে ছাপা হয়েছে। আমরা এই পত্রখানা "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় তখন ছাপি নি। পত্রিকার দু'জন সম্পাদকের মধ্যে প্রথমে ছাপা হতো মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের নাম। আমার মনে হয় নজরুল ইস্‌লাম শহীদুল্লাহ সাহেবের নামেই তার পত্রখানা লিখে থাকবে। মনে হয় সেই জন্যে তাঁকে তা পড়তে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর কাগজ-পত্রের সঙ্গে তা ঢাকায় চলে গিয়েছিল। কিংবা এও হতে পারে

যে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্ কাজী ইম্‌দাদুল হক সাহেবের সঙ্গে পত্রখানা ঢাকায় চলে যেতে পারে। সেই সময়ে তিনি কলকাতা ট্রেনিং স্কুলের (নর্মাল স্কুলের) হেড্ মাস্টার ছিলেন। পরে সেকণ্ডারী বোর্ড অফ এডুকেশনের সেক্রেটারী হয়ে তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তিনিও একজন কর্মকর্তা ছিলেন। সাহিত্য পত্রিকার লেখাও তিনি মাঝে মাঝে সম্পাদন করতেন। এঁদের দু'জনার কাগজ-পত্রের সঙ্গে মিশে না গেলে ঢাকা হতে এই পত্রের প্রথম ছাপা হওয়ার অন্য কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। যা-ই হো'ক, আমিও পত্রখানা নীচে ছাপিয়ে দিলাম।

From :

QAZI NAZRUL ISLAM
Battalion Quartermaster Havilder
49th Bengalis,
Dated, Cantonment, Karachi,
The 19th August, 1919

আদাব হাজার হাজার জানবেন!

বাদ আরজ, আমার নগণ্য লেখাটি আপনাদের সাহিত্য পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, এতে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি বেশী। আমার সব চেয়ে ভয় হয়েছিল, পাছে বেচারী লেখা 'কোরকে'র কোঠায় পড়ে। অবশ্য যদিও আমি 'কোরক' ব্যতীত প্রস্ফুটিত ফুল নই; আর যদিই সে-রকম হয়ে থাকি কারুর চক্ষে, তবে সে বে-মালুম ধুতরো ফুল। যা হোক, তার জন্যে আপনার নিকট যে কত বেশী কৃতজ্ঞ, তা প্রকাশ করার ভাষা পাচ্ছিনে। আপনার এরূপ উৎসাহ বরাবর থাকলে আমি যে একটি মস্ত জবর কবি ও লেখক হব, তা হাতে-কলমে প্রমাণ ক'রে দিব, এ

নজরুলের পত্র

একেবারে নির্ঘাৎ সত্যি কথা। কারণ, এবারে পাঠালুম একটি লম্বা চওড়া 'গাথা' আর একটি 'প্রায় দীর্ঘ' গল্প আপনাদের পরবর্তী সংখ্যা কাগজে ছাপাবার জন্যে, যদিও কার্তিক মাস এখনও অনেক দূরে। আগে থেকেই পাঠালুম, কেননা, এখন হতে এটা ভাল ক'রে পড়ে রাখবেন এবং চাই কি আগে হতে ছাপিয়েও রাখতে পারেন। তা ছাড়া আর একটি কথা। শেষে হয় ত ভাল ভাল লেখা জমে আমার লেখাকে বিলকুল রদ্দি ক'রে দেবে, আর তখন হয়ত এত বেশী লেখা না পড়তেও পারেন। কারণ আমি বিশেষরূপে জানি, সম্পাদক বেচারাদের গলদঘর্ম হয়ে উঠতে হয় এই নতুন কাব্যিরোগাক্রান্ত ছোকরাদের দৌরাত্মিতে। যাক, অনেক বাজে কথা বলা গেল। আপনার সময়টাকেও খামকা টুঁটি চেপে রেখেছিলুম। এখন বাকি কথা ক'টি মেহেরবানী ক'রে শুনুন।

যদি কোন লেখা পছন্দ না হয়, তবে ছিঁড়ে না ফেলে এ গরীবকে জানালেই আমি ওর নিরাপদে প্রত্যাগমনের পাথেয় পাঠিয়ে দেব। কারণ, সৈনিকের বড্ড কষ্টের জীবন। আর তার চেয়ে হাজারগুণ পরিশ্রম ক'রে একটু আধটু লেখি। আর কারুর কাছে ও একেবারে worthless হলেও আমার নিজের কাছে ওর দাম ভয়ানক। আর ওটা বোধ হয় সব লেখকের পক্ষেই স্বাভাবিক। আপনার পছন্দ হ'ল কিনা, জানবার জন্যে আমার নাম ঠিকানা লেখা একখানা stamped খামও দেওয়া গেল এর সঙ্গে। পড়ে মত জানাবেন।

আর যদি এত বেশী লেখা ছাপাবার মত জায়গা না থাকে আপনার কাগজে, তা হলে যে কোন একটা লেখা 'সওগাতে'র সম্পাদককে hand over করলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হব। 'সওগাতে' লেখা দিচ্ছি দু'একটা ক'রে। যা ভাল বুঝেন জানাবেন।

গল্পটি সম্বন্ধে আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য বা বক্তব্য থাকলে জানালেই আমি ধন্যবাদের সহিত তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিব, কারণ, এখনও সময় রয়েছে।

আমাদের এখানে সময়ের money-value ; সুতরাং লেখা সর্বাঙ্গসুন্দর হতেই পারে না। undisturbed time মোটেই পাই না। আমি কোন কিছুরই কপি duplicate রাখতে পারি না। সেটি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

By the by, আপনারা যে 'ক্ষমা' বাদ দিয়ে কবিতাটির 'মুক্তি' নাম দিয়েছেন, তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রকম দোষগুলি সংশোধন ক'রে নেবেন। বড্ডো ছাপার ভুল থাকে, একটু সাবধান হওয়া যায়না কি ? আমি ভাল, আপনাদের কুশল সংবাদ দিবেন। নিবেদন ইতি।

খাদেম
নজরুল ইস্‌লাম
("নজরুল রচনা সম্ভার" হতে উদ্ধৃত)

নজরুলের এই পত্রে 'সাহিত্য পত্রিকা'য় ছাপানোর জন্যে একটি বড় গাথা ও একটি গল্প পাঠানোর কথা লেখা আছে। "হেনা" শীর্ষক গল্পটি আমরা পেয়েছিলেম এবং কার্তিক, ১৩২৬, (অক্টোবর, ১৯১৯) সংখ্যক সাহিত্য পত্রিকায় তা ছেপেওছিলেম। সাহিত্য সমিতি আর সাহিত্য পত্রিকার নামে পাঠানো চিঠি-পত্র ও লেখা ইত্যাদি সবই প্রথমে আমার হাতে আসত। "হেনা" নামক গল্পের সঙ্গে কোনো গাথা যে এসেছিল তা কিছুতেই আমার মনে পড়ছে না। 'সওগাত'কে নজরুলের কোনো কবিতা যে আমি ছাপতে দিইনি (দিতে হলে আমিই দিতুম) একথা একরকম জোরের সঙ্গে বলতে পারা যায়। কারণ, নিজের বা পরের কোনো লেখাই

আমি কোনো দিন 'সওগাতে' ছাপতে পাঠাইনি। 'সওগাতে'র সংস্রবে অনেক গুরুত্বহীন কথাও আমার মনে আছে, নজরুলের কবিতা পাঠানোর কথা ভুলতে পারি ব'লে তো আমার মনে হয় না। মনে আছে একবার একজন যুবক তাঁর লেখা একটি গল্প সাহিত্য পত্রিকায় ছাপতে পাঠিয়েছিলেন। গল্পটি নির্বাচিত না হওয়ায় তিনি তা ফেরৎ নিয়ে যান। পরের মাসে দেখা গেল যে গল্পটি তাঁর স্ত্রীর নামে 'সওগাতে' ছাপা হয়ে গেছে। এই যুবক তাঁর পরবর্তী জীবনে কলকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক হয়েছিলেন।

"মুক্তি" নামক কবিতা যখন সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয় তখনই আমরা স্থির করেছিলেম যে নজরুল ইস্‌লামের সব লেখা আমরা সাহিত্য পত্রিকায় ছাপব, আর যতটা সম্ভব তাকে আমরা সকলের সামনে তুলে ধরব। কাজেই, তার গাথাটি ছাপার জন্যে নির্বাচিত না হওয়ার কথা উঠতে পারে না।

আমার মনে হয় নজরুল ইস্‌লাম তার পত্রখানাই প্রথম ডাকে দিয়েছিল, আর লেখা পাঠিয়েছিল পরে। তখন তার মনে এই পরিবর্তন এসে থাকবে যে কবিতাটি সে আর ছাপতে পাঠাবে না। তা না হলে এই কবিতাটি নিয়ে তার সঙ্গে অনেক পত্র লেখালেখি হতো। এমন একটি কথা ভুলতে পারি বলেতো আমার মনে হয় না, বিশেষ ক'রে তার লেখার একটি শব্দের পরিবর্তনের কথা পর্যন্ত যখন আমার মনে আটকে রয়েছে।

এই সময় হতে নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে আমার পত্রালাপ বেড়ে যায়। এর ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে, যদিও তখন পর্যন্ত আমি তাকে কোনো দিন দেখিনি। যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল। ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্টকে ভেঙে দেওয়ার কথাবার্তাও চলেছিল। নজরুল তাই তার ব্যক্তিগত ব্যাপারও আমায় জানানো শুরু করে দেয়। যেমন পল্টন ভেঙে গেলে সে কোথায় যাবে, কি করবে, ইত্যাদি। আমি তাকে লিখতুম আমার মতে তো বটেই,

আরও অনেকের মতেও, তার মধ্যে একটা বিরাট সাহিত্যিক সম্ভাবনা আছে। কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশেই তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্তই তার নেওয়া উচিত। নজরুল লিখত সে-সিদ্ধান্তই না হয় নিলুম, কিন্তু খাওয়া-পরার উপায় কি হবে? আমি যে তাকে খুব একটা উপায় বাতলাতে পারতুম তা নয়, তবে এটা জানাতুম যে কলকাতা শহরটি একটা অথই সমুদ্র নয়, শুকনো ডাঙামাত্র। উপায় একটা হবেই। এই ভাবেই চলছিল আমাদের তখনকার পত্রালাপ।

কিছু আগেকার কথায় আসা যা'ক। ১৯১৭ সালে নজরুল ইস্‌লাম রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তার সামনেই ছিল মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে সে সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে বসল। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন চলছিল। তার স্কুল-জীবনের পরম বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ই শুধু এই কথা জানতেন। তিনিও দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তবে রানীগঞ্জ হাইস্কুলে। দু'জনাই সাহিত্য ভালবাসতেন, দু'জনাই কিছু কিছু লেখার চর্চা করতেন, আর এরই টানে তাঁরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যদিও নজরুল ছিল একেবারেই সহায়-সম্বলহীন, আর শৈলজানন্দ ধনীর দৌহিত্র। নজরুলের সঙ্গে শৈলজানন্দও সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বড় লোক মাতামহ রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় পেছন হতে কি খেল যে খেললেন কে জানে, স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তিনি উৎরাতে পারলেন না। নজরুল ইস্‌লামকে একাই যেতে হলো সৈন্যদলে। ক'মাস পরেই যে-ছাত্রের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা হবে সে যদি কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ একদিন ফৌজে ভর্তি হয়ে যায় তবে স্বভাবতই অনেকের মনে ধারণা হবে যে ছেলেটি বুঝি পরীক্ষার ভয়ে স্কুল-

পালালো। নজরুল ইস্‌লামের বিষয়ে এমন ধারণা করা কিন্তু সহজ ছিল না। কারণ, সে ছিল তার ক্লাসের প্রথম ছাত্র। অনেকে মনে করতেন পরীক্ষা দিয়ে সে জলপানি পাবে। তাই, আমাদের বোঝা উচিত কেন সে ফৌজে নাম লেখাতে গেল? কিসের টানে গেল?

ব্রিটিশ আমলে বাঙালীদের ফৌজে ভর্তি করা হতো না। বাঙালীরা যুদ্ধে অপারগ ছিলেন এমন কথা ভাবা যায় না, তবে ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বাঙালীর হাতে অস্ত্র দিয়ে তাঁদের বিশ্বাস করতে পারতেন না। বাঙালীদের কেরানীরূপে ব্যবহার করাই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট অনেক বেশী লাভজনক মনে করতেন।

সৈন্যদলে ভর্তি

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জোর লেখালেখি হতে লাগল যে বাঙালীদেরও সৈন্যদলে ভর্তি করা হো'ক। শেষ পর্যন্ত ১৯১৭ সালে ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট একটি বেঙ্গলী ডবল কোম্পানী গঠন করতে রাজি হলেন। তখন সেই সময়ের দেশনেতারা সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার জন্যে বাঙালী যুবকদের আহ্বান জানালেন। অন্য অনেক যুবকের মতো রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র কাজী নজরুল ইস্‌লামও এই আহ্বানে সাড়া দিল। বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীতে, পরে বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে, যে-বাঙালী যুবকরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সকলের মনে কি ছিল তা জানিনে, তবে বহুসংখ্যক লোক ভেবেছিলেন যে এটা একটা দেশপ্রেমের কাজ। নজরুল ইস্‌লামও এই বহুসংখ্যকের একজন ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন যে যুদ্ধে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয় আছে, কিন্তু বাঁচলে তাঁরা যুদ্ধবিদ্যা ও নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার (অবশ্য আর্টিলারির ব্যবহার ভারতীয়দের শেখানো হতো না) আয়ত্ত করেই বাঁচবেন। দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে এর প্রয়োজনের কথা কে অস্বীকার করতে পারে?

হাবিলদারের বেশে কাজী নজরুল ইস্‌লাম

(একুশ বছর বয়সের এই নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গেই লেখকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল)

বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীকে শিক্ষার জন্যে প্রথমে নৌশহরাতে পাঠানো হয়েছিল। নৌশহরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ার জিলার একটি মহকুমা শহর। নৌশহরা পার হয়েই পেশোয়ার শহরে যেতে হয়। ডবল কোম্পানীতে প্রথম ভর্তি হওয়া সৈন্যদের যে-ছোট্ট দলটি সকলের আগে নৌশহরার দিকে যাত্রা করেছিলেন তাঁদের কলকাতা টাউন হলে বিদায় অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। এই অভিনন্দন সভায় একজন দর্শক হিসাবে আমি উপস্থিত ছিলাম। নৌশহরা যাওয়ার পথে লাহোর রেলওয়ে স্টেশনে সরলা দেবী চৌধরানী বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীর সৈন্যদের অভিনন্দন জানাতে আসতেন। তিনি তাঁর স্বামী পণ্ডিত রামভজদত্ত চৌধরীর সঙ্গে সেই সময়ে লাহোরেই থাকতেন। এই সৈন্যদের লক্ষ ক'রে একটি গানও রচিত হয়েছিল। নজরুলের "হেনা" নামক গল্পে তুলে দেওয়া নীচের কয় ছত্র

"আজ তলোয়ার সে খেলেঙ্গে হোরি
জমা হো গেয়ে দুন্‌য়া কা সিপাঈ।
ঢালোঁও কি ডঙ্কা বদন লাগি, তোপঁও কে পিচকারী,
গোলা বারুদকা রঙ্গ বনিহেয় লাগিহেয় ভারি লড়াঈ।"

এই গানটির একটি অংশ। এর রচয়িতা কে,—নজরুল সরলা দেবীর নাম বলেছিল, না, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম, তা এখন আমার মনে নেই।

বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীর সৈন্যরা যখন নৌশহরাতে শিক্ষা গ্রহণ করছিল তখন দুর্গাপূজা এসে গিয়েছিল। সেই সময়কার খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল যে পেশোয়ারের বিখ্যাত বাঙালী চিকিৎসক. ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এই উপলক্ষে বাঙালী সৈন্যদের খাইয়েছিলেন।

বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীর আয়তন ক্রমশই বাড়তে বাড়তে

তা একটি রেজিমেণ্টে (Battalion-এ) পরিণত হয়েছিল। এর নাম হয়েছিল উনপঞ্চাশ নম্বর (উনপঞ্চাশতম) বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট, ইংরেজিতে 49th Bengalis, কিন্তু বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট নামটিই প্রচারিত ছিল। আরব সাগরের তীরে করাচিতে স্থাপিত হয়েছিল এর সদর স্টেশন (হেডকোয়ার্টার্স)।

আগেই বলেছি, রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে মেট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ার সময়ে নজরুল ইস্‌লাম ফৌজে ভর্তি হয়েছিল। এই স্কুলেই সে বেশী দিন পড়েছিল এবং এটাই ছিল তার পাঠ্য জীবনের শেষ স্কুল। বাল্যকালে তার গ্রামের মক্‌তব হতে সে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেছিল এবং শুধু স্বরচিহ্নের সাহায্যে অর্থ না বুঝে আরবী ভাষার কুর্‌আন্‌ও সে পড়তে শিখেছিল। যতটা বোঝা যায় সামান্য কিছু পারসী ভাষাও সেই সময়ে সে তার কাকা (বাবার চাচাত ভাই) কাজী বজলে করীমের নিকটে পড়েছিল।

নজরুল ইস্‌লাম চুরুলিয়া গ্রামের কাজী পরিবারের ছেলে। কাজীরা মুস্‌লিম সমাজে মানভাজন লোক। তাঁদের পূর্ব পুরুষরা বাদশাহী আমলে বিচারকের কাজ করতেন বলে তাঁদের গৌরববোধ বড় বেশী। চুরুলিয়া জামুরিয়ার অধীন একটি গ্রাম। জামুরিয়া আবার বর্ধমান জিলার আসানশোল মহকুমার অন্তর্ভুক্ত একটি থানা। (আগে চুরুলিয়া রানীগঞ্জ থানার অধীনে ছিল)। পরগনার নাম শেরগড়। চুরুলিয়ার কাজীরা বাদ্‌শাহী আমলে পাওয়া আয়মা সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আমরা তাকে লাখিরাজ (নিষ্কর) সম্পত্তিও বলে থাকি। কিন্তু নজরুলের পিতা কাজী ফকীর আহ্‌মদ নিঃস্ব অবস্থায় মরেছিলেন। নজরুলকে তাই নিজের ভাগ্য নিজেকে গড়ে তুলতে হয়েছে। অশেষ দুঃখ-কষ্টে কেটেছে তার বাল্য জীবন। যে-সময়ে তার মতো একটি ছেলের, তাও আবার কাজী বাড়ীর ছেলের, মনোযোগ সহকারে স্কুলে পড়াশুনা করা উচিত সেই সময়ে দারিদ্র্যের বিড়ম্বনা তাকে এখান থেকে ওখানে তাড়িয়ে নিয়ে

বেড়িয়েছে। একটি কথা আছে, কাজী বাড়ীর বিড়ালও কম পক্ষে তিনটি পাঠ পড়ে নেয়। আর কাজী বাড়ীর ছেলে নজরুল স্কুলে পাঠাভ্যাস করার পরিবর্তে লেটোর দলের গান বেঁধেছে, রেলওয়ের গার্ড সাহেবের বাসায় চাকরি করেছে, আর চাকরি করেছে আসানশোলের রুটির দোকানেও। কোনটা ছোট কাজ, আর কোনটা বড়, তাতে তার এতটুকুও আটকায়নি। সব কিছু শুনে যা ধারণায় আসে তাতে বোঝা যায় যে সেই সময়ে চুরুলিয়া কাজী পরিবারের মধ্যে কিংবা নজরুলের অন্য সব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাঁদের সচ্ছল অবস্থা ছিল তাঁরা নজরুলের বড় একটা খোঁজ-খবর নিতেন না। এটাও বুঝতে কষ্ট হয় না যে সে পড়াশুনা করতে চাইত। তার জন্যেই সে চার দিকে ছোটাছুটি করেছে। আবার এও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্কুলের ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করার চেয়ে সে দেশপ্রেমকেই উচ্চাসন দিয়েছিল। বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীতে যোগ দেওয়ার যে-ডাক তার কানে পৌঁছেছিল সে-ডাককে দেশপ্রেমের ডাক ধরে নিয়েই সে তাতে সাড়া দিয়েছিল।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে" হতে আমরা জানতে পারি যে শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময়ে নজরুলকে স্কুলের বেতন দিতে হতোনা, মুস্‌লিম হোস্টেলে তার খাওয়ার খরচ জমীদাররা দিতেন, তার ওপরে প্রতি মাসে আরও সাত টাকা সে জমীদার বাড়ী হতে পেত। এতগুলি সুবিধা পাচ্ছিল বলেই সে শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়তে পারছিল। এই স্কুলে তার ভর্তি হওয়া সম্পর্কেও একটি গল্প শুনেছি। আমার এই গল্পটির এম. আবদুর রহমান সাহেবের "কিশোর নজরুল" নামক পুস্তকে দেওয়া বিবরণের কিছু মিল আছে। আমার যতটা মনে পড়ছে গল্পটি আমি ডাক্তার হেরাসতুল্লার মুখে শুনেছি। তাঁর সঙ্গে আমার কলকাতায় পরিচয় হয়েছিল। বয়সে তিনি আমার অনেক বড়

ছিলেন। তিনি ক্যাম্বেল স্কুলের পাস করা ডাক্তার ছিলেন। তাঁর পাঠ্যজীবনে তিনি কলকাতায় যাঁদের বাড়াতে থাকতেন আমার পাঠ্য-জীবনেও (তাঁর পাঠ্যজীবনের অনেক পরে) আমি কিছু দিন সেই বাড়ীতে ছিলেম। ১৬, এন্টনীবাগান লেনের মুন্‌শী আবদুল আজীজের বাড়ী। এই বাড়ীতেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর বাড়ী বীরভূম জিলায় হলেও নজরুল ইস্‌লামদের চুরুলিয়া গ্রাম হতে খুব বেশী দূরে ছিলনা। নিজের গ্রামেই তিনি পসার জমিয়ে-ছিলেন। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হতো।

শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুল

নজরুল ইস্‌লামের লেখা তখন "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছাপা হয়েছে। তার সঙ্গে আমার পত্র লেখালেখিও চলেছে। এই সময়ে একদিন ডাক্তার হেরাসতুল্লাকে কলকাতায় পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম তিনি বাঙালী পল্টনের কাজী নজরুল ইস্‌লামকে চেনেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে খুবই চেনেন, চুরুলিয়ার অমুক কাজীর ছেলে। আরও বললেন, সকলে ভেবেছিলেন মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ছেলেটি জলপানি পাবে। অথচ সবাইকে হতাশ ক'রে, কাউকে কিছু না জানিয়ে সে কিনা পল্টনে চলে গেল! তখনই তিনি আমায় নজরুলের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার গল্পটি বলেছিলেন। তার কোনো বন্ধু কিংবা আত্মীয় শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়ত। তাকে উপলক্ষ করেই নজরুল শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সুযোগ খুঁজতে আসে। শেষ পর্যন্ত যে-সুযোগগুলি সে পেয়েছিল তার কোনো একটি না পেলে সে পড়তে পারত না। কিন্তু প্রথমে এ সবের কোনো আশ্বাস না পেয়ে সে খুবই হতাশ হয়ে পড়ে। এই হতাশাপীড়িত অবস্থায় বন্ধু স্কুলে চলে গেলে তার নামে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখে রেখে নজরুল ইস্‌লাম চলে যায়। স্কুল হতে ফিরে এসে বন্ধুটি পত্রখানা পায় এবং তা হেড্ মাস্টারের নিকটে পাঠিয়ে দেয়। এই পত্রের

ভাষা ও মান নজরুল যে-ক্লাসে ভর্তি হতে এসেছিল সেই ক্লাসের ছাত্রদের তুলনায় অনেক উঁচু ছিল। তাই থেকেই নজরুল এতগুলি সুবিধাসহ শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল।

ডাক্তার হেরাসতুল্লা খুব সম্ভবত বেঁচে নেই। তাঁর বড় ছেলে আবদুর রজ্জাক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময়ে কলকাতাতেই মারা যান। ছোট ছেলে আবদুল খালেকও এম. বি. পাস করেছিলেন।

নজরুল ইস্‌লাম নিজে আমাদের নিকটে তিনটি হাইস্কুলে পড়ার কথা বলেছে। ময়মনসিংহ জিলার দরিরামপুর হাইস্কুল, বর্ধমান জিলার মাথ্‌রুন হাইস্কুল এবং রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুল। আসানশোলে সে যখন একটি রুটির দোকানে কাজ করছিল তখন তার বুদ্ধি ও কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে ময়মনসিংহ জিলার অধিবাসী একজন পুলিস অফিসার তাকে নিয়ে গিয়ে নিজের জিলার দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। এই অফিসারের নানান রকম নাম নানা পুস্তকে ছাপা হয়েছে। আগে আমরা রফীকুদ্দীন ও রফীজুদ্দীন নাম দেখেছি, এখন ঢাকা হতে প্রকাশিত "নজরুল পরিচিতি" নামক পুস্তকে ছাপা হয়েছে যে নামটি আসলে কাজী রফীজুল্লাহ্‌। ঢাকা হতে ময়মনসিংহ বেশী দূরে নয়। আশা করি এবারে ঠিক নাম পাওয়া গেছে। বেশীর ভাগ লেখায় দেখছি নজরুল আবদুল ওয়াহেদের রুটির দোকানে কাজ করত। কিন্তু নজরুলের ভ্রাতুষ্পুত্ররা খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে আবদুল ওয়াহেদের দোকানে নয়, নজরুল কাজ করত হুগলী জিলার এম. বখ্‌শের দোকানে। এই তথ্যই বোধ হয় ঠিক। ময়মনসিংহ হতে ফেরার পরে নজরুল মাথরুন হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তার মুখে শুনেছি এই স্কুলে কাসিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থ সাহায্য ছিল। জায়গাটি বোধ হয় মহারাজার পৈতৃক গ্রাম। সম্বলহীন

নজরুল নিশ্চয় নানান সুখ-সুবিধা পাওয়ার আশায় এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের খবর এই যে শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে নজরুল সপ্তম শ্রেণীতে (Class VII) ভর্তি হয়েছিল। বার্ষিক পরীক্ষার পরে ডবল প্রমোশন নিয়ে সে নবম শ্রেণীতে (Class IX) ওঠে। তাইতেই সে শৈলজানন্দের একই ক্লাসের ছাত্র হতে পেরেছিল, যদিও তাঁরা বিভিন্ন স্কুলে পড়তেন।

রানীগঞ্জে নজরুলের আরও একজন বন্ধু জুটেছিলেন। তাঁর নাম ছিল শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ। নজরুল ইস্‌লাম মুসলমান, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় হিন্দু-ব্রাহ্মণ, আর শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ খ্রীস্টান। তিন বন্ধু একসঙ্গে বেড়াতেন। নজরুল ইস্‌লাম যে-রেলওয়ে গার্ডের বাড়ীতে চাকরী করেছিল তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী হিরণপ্রভা ঘোষ ছিলেন শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষের দিদি। গার্ড সাহেবের যখন ডিউটি থাকতনা তখনও তিনি অতি বেশী মদ পান করে বেহুশ হয়ে থাকতেন বলে হিরণপ্রভার সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। পরে তিনি মেডিকাল স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাস করে ডাক্তার হিরণপ্রভা ঘোষ হয়েছিলেন। কলকাতায় নজরুল মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যেত। শৈলজানন্দ বলছেন তাঁর বাড়ীর টেবল-হারমোনিয়ামটি নজরুলের আকর্ষণের বস্তু ছিল। শৈলেন ঘোষ আমাদের বাসায় প্রায়ই আসতেন। তাঁর সঙ্গেও আমাদের হৃদ্যতা হয়েছিল। শৈলেন ঘোষ আজ আর বেঁচে নেই। তাঁর দিদিও বড় পসার জমানোর পরে অকালে মারা গেছেন। নজরুলের রানীগঞ্জের আর একজন বন্ধু —আবদুল জব্বার সাহেবও আমাদের বাসায় আসতেন। তাঁর বাড়ী সম্ভবত বীরভূম জিলায় ছিল। তিনি বেঁচে আছেন আশা করি। কয়েক বছর আগে জে. সি. হুই কোম্পানীর আফিসে তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। ওখানে তো টাইপ আর প্রিন্টিং মেশিনের কারবার। জব্বার সাহেবের বোধ হয় ঢাকা, না, আর কোথাও প্রেস আছে।

'কাজী নজরুল ইস্‌লাম ঃঃ স্মৃতিকথা'য় তথ্য বিষয়ক সংশোধন

৩৯ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারাটি নিম্নলিখিতরূপে পুনর্লিখিত হবে :

শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের আরও একটি কথা এখানে বলে রাখি। শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক ওই স্কুলে নজরুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়ীও ছিল শিয়ারশোলেই। তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পশ্চিম বঙ্গীয় দলের, অর্থাৎ যুগান্তর দলের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। পল্টন হতে ফেরার পরে নজরুল নিজেই আমার নিকটে স্বীকার করেছিল যে সে শ্রীঘটকের দ্বারা তাঁর মতবাদের দিকে আকর্ষিত হয়েছিল। তাঁর মাসি-মা শ্রীযুক্তা দু'কড়িবালা দেবী (চক্রবর্তী) বোন-পো'র প্রভাবেই বোধ হয় সন্ত্রাসবাদী দলে এসেছিলেন। ১৯১৭ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীঘটক শিয়ারশোলে তাঁর নিজের বাডীতে ও শ্রীযুক্তা দু'কডিবালা দেবী বীরভূম জিলার নলহাটি থানার অধীন ঝাউপাডা গ্রামে তাঁর আপন বাডীতে অস্ত্র আইন অনুসারে একই সময়ে গিরেফতার হন। দু'কডিবালা দেবীর সহিত তাঁর গ্রামের সুরধনী মোল্লানীও (মোডলানীর উচ্চারণ বিকৃতি) গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন। এই মহিলার বাডীতেই দু'কডিবালা বে-আইনী অস্ত্র রেখেছিলেন। সিউড়ীতে স্পেশাল ট্রাইবিউনালে তাঁদের বিচার হয়েছিল। এই মোকদ্দমার রায় বা'র হয়েছিল ১৯১৭ সালের ৯ই মার্চ তারিখে। শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে ও শ্রীযুক্তা দু'কডিবালা দেবী দু' বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। রাজসাক্ষী হওয়ায় সুরধনী মোল্লানী ছাডা পেয়েছিল।* সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের যে-যুগ ১৯১৭ সালে শেষ হয়েছিল সেই যুগে আমি যতটা জেনেছি একমাত্র দু'কড়িবালা দেবী ছাডা অন্য কোনো মহিলা এই আন্দোলনের সংস্রবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন নি। বিনা-বিচারে বন্দিনী (ডেটেনিউ) অবশ্য কেউ কেউ হয়েছিলেন। শ্রীঘটকের শেষ জীবন ঝাউগ্রামেই কেটেছে। সেখানেই তিনি ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ৬ই পৌষ (১৯৬০

---

* শ্রীযুক্তা দু'কড়িবালা দেবীর অপ্রকাশিত "স্মৃতিকথা" হতে শ্রীঅরুণ চৌধুরী এই তথ্য আমায় যে পাঠিয়েছেন তার জন্যে আমি তাঁর নিকটে কৃতজ্ঞ। —লেখক

খ্রীস্টাব্দের ২১শে বা ২২শে ডিসেম্বর ?) তারিখে মারা গেছেন। ১৯৬৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখেও (ওই তারিখেই আমি শেষ খবর পেয়েছি) ৭৮ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্তা দু'কড়িবালা দেবী জীবিত ছিলেন।

এই পুস্তকের ২৯১ পৃষ্ঠার ২২ ও ২৩ ছত্রের "শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটকের ১৯৬০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যু হয়েছে" কথাটা কেটে দিতে হবে।

পুস্তকের ১৬৪ পৃষ্ঠায় :

আমি "ভাঙার গান" কবিতার রচনা-কাল সম্বন্ধে যা বলেছি তা ঠিক নয়। সুকুমাররঞ্জন দাশ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর কথা নিয়ে ঠিকই এসেছিলেন, তবে এসেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গিরেফ্‌তার হওয়ার অল্প পরে। ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন গিরেফ্‌তার হয়ে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। কাজেই, নজরুল "ভাঙার গান" লিখেছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে। "ভাঙার গান" বাঙ্গালার কথায় ছাপা হয়েছিল।

পুস্তকের ১৬৭ পৃষ্ঠায় আমি লিখেছি, "আমি যদি ভু'লে না গিয়ে থাকি তবে এরই জন্যে ('ভাঙার গানে'র জন্যে) শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর ছয় মাসের সাজা হয়েছিল।" সত্য আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বাসন্তী দেবী কখনও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন নি। পুরনো দিনের খবরের কাগজ (হিন্দু প্যাট্রিয়ট) ঘেঁটে এখন জানা গেছে যে ১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারার নির্দেশ অমান্য করে বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী ও সুনীতি দেবী দশ-বারো জন যুবকসহ বড়বাজার এলাকায় খদ্দর ফেরি করতে গিয়েছিলেন। পুলিস তাঁদের গিরেফ্‌তার করে কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখার পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

'ভাঙার গানে'র জন্যে কে জেল খেটেছিলেন তা জানা যায় নি।

আমার জীবনে ও শারীরিক সামর্থ্য থাকা অবস্থায় যদি এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বা'র হয় তার এই অংশটা আমি নূতন ক'রে লিখব। আপাতত এই পর্যন্ত।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের আরও একটি কথা বলে রাখি। শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক ওই স্কুলে নজরুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়ীও ছিল শিয়ারশোলেই। তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পশ্চিমবঙ্গীয় দলের, অর্থাৎ যুগান্তর দলের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। পল্টন হতে ফেরার পরে নজরুল নিজেই আমার নিকটে স্বীকার করেছিল যে সে শ্রীঘটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের যে আকর্ষণ ছিল তার পেছনে ছিল শ্রীঘটকের প্রভাব। তাঁর মাসি-মা এককড়িবালা দেবী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দলভুক্ত ছিলেন। সমস্ত বাঙলা দেশে তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি রাজনীতিক কারণে অস্ত্র আইনে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ১৯১৬ সালে তাঁর সাজা হয়েছিল। শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক কিছু কাল আগেও জীবিত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

নজরুলের ওপরে শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটকের প্রভাব

ঊনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট ভেঙে দেওয়ার অল্প কিছু দিন আগে নজরুল একবার সাত দিনের ছুটি পেয়েছিল। আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে"তে লিখেছি যে ১৯১৯ সালের শেষভাগে সে এই ছুটি পেয়েছিল। আমি জীবনে কোনো দিন রোজনামচা লিখিনি, লিখলেও তা আমার নিকটে না থেকে পুলিসের, অর্থাৎ গবর্নমেণ্টের মুহাফিজখানায় থাকত। তবে ১৯১৯ সালের শেষভাগে নজরুল ইস্‌লামের ছুটিতে আসার কথা লেখাটা আমার পক্ষে ভুল হয়েছে। আসলে সে ছুটিতে এসেছিল ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে, তার আগে নয়। এটা এভাবে বুঝতে পারছি যে ত্রিমাসিক "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"র ১৩২৬ সালের মাঘ সংখ্যা নজরুল ছুটিতে আসার আগে শুধু বা'রই হয়নি, করাচির সেনানিবাসে এ পত্রিকার এই সংখ্যাটি তার হাতে পৌঁছেও

পল্টন হতে নজরুলের সাত দিনের ছুটি ও আমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা

গিয়েছিল। তার প্রাপ্তি স্বীকার ক'রে যে-পত্রখানা সে আমায় লিখেছিল তাও আমি তার ছুটিতে আসার আগে পেয়েছিলেম। পত্রিকার এই সংখ্যার কথা সে তার বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কেও লিখেছিল। কারণ, তার "ব্যথার দান" শীর্ষক গল্পটি এই মাঘ সংখ্যক সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বাঙলা মাঘ মাস খ্রীস্টীয় মাসের হিসাবে ছিল জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস।

নজরুল ইস্‌লাম পল্টন হতে মাত্র সাত দিনের ছুটি পেয়েছিল। এই ছুটির তিন দিন সে কলকাতায় তার বন্ধু শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাটিয়েছিল। তার পরে গিয়েছিল সে চুরুলিয়া গ্রামে তার মায়ের নিকটে। চুরুলিয়া হতেই সে করাচির সেনানিবাসে ফিরে যায়। এই সাত দিনের ছুটির সময়েই নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাকে পথ চিনিয়ে ৩২, কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পরবর্তী কালে বাঙলার বিখ্যাত সাহিত্যিক। তিনি তখন কাসিমবাজার মহারাজার পলিটেক্‌নিক ইনস্টিটিউটে শর্টহ্যাণ্ড-টাইপ-রাইটিং শিখছিলেন। সে দিন নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে আমার যেমন হয়েছিল প্রথম সাক্ষাৎ, ঠিক তেমনই হয়েছিল শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সহিতও আমার প্রথম পরিচয়। প্রথম দেখাও বটে। নজরুলই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সে বলেছিল শৈলজানন্দও লেখক।

হাঁ, কাজী নজরুল ইস্‌লামকে সেদিন আমি প্রথম দেখলাম। সে তখন একুশ বছরের যৌবনদীপ্ত যুবক। সুগঠিত তার দেহ আর অপরিমেয় তার স্বাস্থ্য। কথায় কথায় তার প্রাণখোলা হাসি। তাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে যে কোনো লোক তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। আমার সঙ্গে তার অনেক কথা হলো। যে-সব কথা আগে চিঠি-পত্রের মারফতে হয়েছে সে-সব কথা আবারও হলো। তাকে আমি কলকাতায় এসে থাকতে

বললাম। সাহিত্য সমিতির ঘরগুলি তাকে দেখিয়ে দিলাম। বললাম, এখানেই তার থাকার জায়গা হবে। ঊনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট তখন ভাঙনের মুখে। হয়তো দু'এক সপ্তাহের ভিতরেই তার ভাঙন শুরু হয়ে যাবে এই রকম ছিল তার অবস্থা। আমি নজরুল ইস্‌লামকে বলে দিলাম রেলওয়ে স্টেশন হতে সে যেন সোজা সাহিত্য সমিতির অফিসে চ'লে আসে। তাতেই সম্মতি জানিয়ে সেদিন সে চলে গেল। তার "ব্যথার দান" গল্পের একটি কথা আমি বদলে দিয়েছিলেম। তার জন্যে সে করাচি হতেই আমায় ধন্যবাদ জানিয়েছিল। প্রথম সাক্ষাতের দিন সে কথা আবারও হলো, আবারো সে জানালো যে তার কথার পরিবর্তনে সে খুশী হয়েছে। কি কথার পরিবর্তন করেছিলেম সে কথা পরে বলব।

এই সঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত কথা ব'লে রাখা ভালো। পৃথিবীতে আমার 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করার লোকের সংখ্যা খুব কম। যাঁরা আমার চেয়ে বয়সে বহু বছরের ছোট অনেক হৃদ্যতা হওয়ার পরেও আমি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় 'আপনি' ব্যবহার করি। আমার এই অভ্যাস ভালো নয় একথা অনেকেই বলেন। তা সত্ত্বেও এই অভ্যাসটি আমার খানিকটা মজ্জাগত হয়ে গেছে। নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা অনেক বেড়ে যাওয়ার পরেও আমি তাকে "কাজী সাহেব" বলতাম। সে আমায় বলত "আহ্‌মদ সাহেব"। ক' বছর পরে নজরুলই একদিন জোর ক'রে আমাদের সম্পর্ককে 'তুমি'তে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল।

নজরুল কলকাতায় এলো

যতটা সঠিক খবর জোগাড় করতে পেরেছি ১৯২০ সালের মার্চ মাসে উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট (49th Bengali Regiment) পুরোপুরি ভেঙে গেল। এই ভাঙার কাজটি সম্ভবত ফেব্রুয়ারী মাসেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুরোপুরি তা ভাঙল মার্চ মাসেই। নজরুল ইস্‌লামও কলকাতায় ফিরে এলো এই মার্চ মাসে। আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে লিখেছি "আগেকার কথা মতো নজরুল তার গাঁটরি-বোচকা নিয়ে সোজা ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে উঠল।" এখন এত বছরের পরে দেখতে পাচ্ছি এই কথাটা পুরো সত্য নয়, আধা সত্য মাত্র। নজরুল ইস্‌লাম রেলওয়ে স্টেশন হতে সোজাসুজি ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির আফিসে চলে আসেনি। আমি ভেবেছিলেম সে তাই করেছে। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে" নামক স্মৃতিকথা প্রকাশিত হওয়ার পরে এখন জানতে পারছি যে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট ভেঙে দেওয়ার পরে নজরুল ইস্‌লাম কলকাতায় এসে প্রথমে রামকান্ত বোস স্ট্রীটে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বোর্ডিং হাউসে এসে উঠেছিল। তিন চার দিন সেখানে সে ছিলও। তার পরে বোর্ডিং হাউসের চাকর জানতে পারে যে নজরুল মুসলমান।

সে তার এঁটো বাসন ধুতে অস্বীকার করে। তখন শৈলজানন্দ নজরুলকে ২০, বাদুড়বাগান রো'তে (এখন ১, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট) তাঁর মাতামহের একটি খালি বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু সে ৩২, কলেজ স্ট্রীটেই যেতে চাইল। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সেখানে তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন। আমরা ভাবলাম শৈলজানন্দ বুঝি নজরুলকে রেলওয়ে স্টেশন হতে নিয়ে এসেছেন। আশ্চর্য এই যে শৈলজানন্দ কোনো দিন আমায় রামকান্ত বোস স্ট্রীটের ঘটনার কথা জানান নি, যদিও আমাদের পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। নজরুল ইস্‌লামও কোনো দিন ঘুণাক্ষরেও এই ঘটনার কথা আমায় বলেনি। দু'একবার কেউ কেউ আমায় এই ঘটনার কথা জিজ্ঞাসাও করেছেন। আমি তা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিয়েছি।

বাগবাজারের রামকান্ত বোস স্ট্রীট হয়ে এলেও কাজী নজরুল ইস্‌লাম শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসে এসে আস্তানা গেড়ে বসল। এটা ছিল শীলেদের ২/৩ মহলওয়ালা বাড়ীর দোতলার সামনের দিককার অংশ। এই অংশটা বাড়ীর অন্য অংশের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। রাস্তা থেকে ওপরে উঠে আসার সিঁড়ি ছিল। সামনের দিককার দু'খানা ঘরের একখানায় ছিল সাহিত্য সমিতির আফিস। আর একখানা ঘর সাহিত্য সমিতির নিকট হতে ভাড়া নিয়েছিলেন আফজালুল হক সাহেব। সাহিত্য সমিতি এই বাড়ী ভাড়া নেওয়ার অল্প ক'দিনের ভিতরেই আফজালুল হক্ সাহেব ওই ঘরখানা ভাড়া নেন। আমি সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে বাস করতে এসেছিলেম ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে। ৩ নম্বর কলেজ স্কোয়ারে (এখন নাম বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট) কুমিল্লার আশ্‌রাফ উদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরীর সঙ্গে যুক্ত মালিকানায় আফ্‌জালুল হক সাহেবের পুস্তকের দোকান ছিল। তার নাম ছিল "মোসলেম পাব্‌লিশিং" হাউস।

আমি সাহিত্য সমিতির আফিসের পাশের দিককার একখানা

ঘরে থাকতাম। সেই ঘরেই নজরুল ইস্‌লামের জন্যে আর একখানা তখ্‌ৎপোশ পড়ল। কৌতুহলের বশে আমরা তার গাঁটরি-বোচকা-গুলি খুলে দেখলাম। তাতে তার লেপ তোশক ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল। সৈনিক পোশাক তো ছিলই, আর ছিল শিরওয়ানি (আচ্‌কান), ট্রাউজার্স ও কালো উঁচু টুপি যা তখনকার দিনে করাচির লোকেরা পরতেন। একটি দূরবীনও (বাইনোকুলার) ছিল। কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি, ইত্যাদিও ছিল। পুস্তকগুলির মধ্যে ছিল ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ। তাতে মূল পার্সির প্রতি ছত্রের নীচে উর্দু তর্জমা দেওয়া ছিল। অনেক দিন পরে আমারই কারণে নজরুল ইস্‌লামের এই গ্রন্থখানা, আরও কিছু পুস্তক, কিছু চিঠি-পত্র, অনেক দিনের পুরানো কবিতার খাতা, বিছানা, কিট্‌ ব্যাগ স্যুটকেস্‌ এবং "ব্যথার দান" পুস্তকের উৎসর্গে বর্ণিত মাথার কাঁটা খোয়া যায়। মিউজিয়মে রক্ষিত মূল্যবান বস্তুর মতো নজরুল এই কাঁটাটিও রক্ষা করে আসছিল. উৎসর্গে লেখা আছে—

"মানসী আমার!

মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে
ক্ষমা করনি,
তাই বুকের কাঁটা দিয়ে
প্রায়শ্চিত্ত করলুম।"

কে ছিলেন এই কাঁটার মালিক তাঁর নাম সে আমায় কোনো দিন বলেনি। কি করে জিনিসগুলি খোয়া গেল সেই কথা হয়তো আমার রাজনীতিক জীবনের স্মৃতিকথায় কোনো দিন বলব। কিন্তু হবে কি লেখা সেই স্মৃতিকথা? কে জানে?

কাজী নজরুল ইস্‌লাম যে দিন প্রথম ৩২, কলেজ স্ট্রীটে থাকতে এসেছিল সে দিন রাত্রেই তাকে দিয়ে আমরা গান গাইয়ে

নিয়েছিলেম। গানের ব্যবস্থা হয়েছিল আফ্‌জালুল হক সাহেবের ঘরে। আমার ঘরখানা শীলেদের বাড়ীর প্রথম উঠোনের ওপরে ছিল। তাঁদের বাড়ীর ভিতরে যাতে কোনো আওয়াজ না পোঁছয় সে বিষয়ে আমি সতর্ক ছিলেম। তখনকার দিনে নজরুল সাধারণত রবীন্দ্রনাথের গানই গাইত, কিন্তু সে দিন সে গেয়েছিল "পিয়া বিনা মোর জিয়া না মানে বদ্‌রী ছায়ী রে"। ও-বাড়ীতে আসার পরে নজরুলের গানের আড্ডা বরাবর আফ্‌জাল সাহেবের ঘরেই বসত।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা এখানে ব'লে রাখছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার নিযুক্ত হয়ে আসার পরে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব আমার ঘরেই থাকতেন। নজরুল ইস্‌লাম যখন এসেছিল তখন তিনি ফিয়ার্স লেনে একটা মেডিকাল ছাত্রদের মেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে সেখানে উঠে গিয়েছিলেন। তাইতে আমার ঘরে নজরুলের ঠাঁই হতে পেরেছিল।

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর "নজরুল চরিত মানস" নামক পুস্তকে লিখেছেন, "নজরুল যে দিন সাহিত্য সমিতির আফিসে এসে ওঠেন, তার কিছু দিন পরে এই সমিতির একটি ঘর ভাড়া নেন আফজালুল হক সাহেব"। তিনি নিঃসন্দেহে আফ্‌জালুল হক সাহেবের নিকট হতে খবরটি পেয়েছেন। কিন্তু আসলে এটা সত্য খবর নয়। তার অনেক মাস আগে হতেই আফজালুল হক সাহেব ওই বাড়ীতে ছিলেন। নজরুল ইস্‌লাম আসার আগে আফ্‌জাল সাহেব ৩২, কলেজ স্ট্রীটে থাকতে এসেছিলেন, না, পরে এসেছিলেন তাতে তাঁর এমন কি আসে যায় তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনে। তাঁর স্মৃতিতে যখন বিভ্রম ঘটছে তখন তিনি কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলেই তো পারতেন। ওদুদ সাহেব তখন তাঁর সঙ্গে থাকতেন। আমি তাঁকে অনেক দিনের অনেক ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েও বোঝাতে পারিনি যে তিনি ভুল করছেন। সকলের স্মৃতি সকলকে প্রতারিত করে। অন্যদের

সঙ্গে আলোচনা করে সত্য ঘটনা নির্ণয় করা উচিত। এই ভুলটি তেমন বড় নাও হতে পারে, কিন্তু নজরুলের চরিতকারদের নিকটে বড় বড় ভুল তথ্যও তো তিনি সরবরাহ করতে পারেন। আমার ভয় সেখানেই। আজ নজরুলের যে কেনো সম্বিৎ নেই, সে যে কোনো কথাই বলতে পারে না, তা আমাদের ভুললে চলবে কেন?

কলকাতায় ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে দু'দিন থাকার পরে নজরুল ইস্‌লাম তার জিনিস-পত্র সেখানে রেখে দিয়ে চুরুলিয়া গ্রামে তার নিজের বাড়ীতে চলে যায়। আমার যতটা মনে পড়ে গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে সে সাত-আট দিন ছিল। এই সময়ে তার মায়ের সঙ্গে কিসের একটা মান-অভিমানের ব্যাপার তার ঘটে। তার পরে যতদিন মা জীবিত ছিলেন ততদিন তো সে চুরুলিয়া গ্রামে যায়ই নি, মায়ের মৃত্যুর পরেও সম্বিৎ থাকা অবস্থায় সে আর কখনও চুরুলিয়া গ্রামে ফেরেনি। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নজরুল ইস্‌লামের সম্বন্ধে একটি ডকুমেণ্টারি ফিল্ম যখন তোলা হচ্ছিল তখন তাকে একবার চুরুলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আরও একবার তাকে চুরুলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে তার স্ত্রী প্রমীলার মৃত্যু হওয়ার পরে। কিন্তু নজরুল কি বুঝেছিল কোথায় সে এসেছে? আমাদের দুর্ভাগ্য, আর দেশেরও দুর্ভাগ্য যে কোনও কিছু বোঝার ক্ষমতা তার আর নেই। কাজী নজরুল ইস্‌লাম—বাঙালীর প্রিয় কবি, গীতিকার ও সুরকার—আজ সম্বিৎহারা ও রুদ্ধবাক।

মায়ের প্রতি অভিমান—নজরুলের চুরুলিয়া বর্জন

নজরুলের মান-অভিমানের ব্যাপারটি যে কত গভীর ছিল আরও একটি ঘটনা হতে পরে আমি তা বুঝেছিলেম। ১৯২১ সালে সে যখন আমার সঙ্গে ৩/৪-সি তালতলা লেনের বাড়ীতে থাকছিল তখন একদিন তার বড় ভাই (জ্যেষ্ঠাগ্রজ) কাজী সাহেবজান ও তার কাকা (বাবার খুড়তুত ভাই) কাজী বজলে করীম সে বাড়ীতে এসে

উপস্থিত হন। তাঁরা নজরুলকে একবারটি চুরুলিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক সাধাসাধি করলেন, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে রাজি হলো না। চুরুলিয়া হতে নজরুল যখন কলকাতা ফিরে আসছিল তখন সে বর্ধমানে থেমে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আফিসে সব রেজিস্ট্রারের চাকরির জন্যে একখানা দরখাস্ত দিয়ে আসে। তাতে সে ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের ঠিকানা দিয়েছিল। সেই সময়ে পল্টন হতে যাঁরা ফিরেছিলেন তাঁদের মধ্যে লেখা-পড়া জানা লোকেদের সরকারী চাকরি হয়ে যাচ্ছিল। মেট্রিকুলেশন পাস না করলেও নজরুল লেখা-পড়া ভালোই জানত। ক্লাসের সে প্রথম ছাত্র ছিল। নোয়াখালীর মনীরুদ্দীন নামে একজন মেট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়লেও নজরুলের মতো ভালো লেখাপড়া জানতেন না। তবে, পল্টনে তিনি জমাদার হয়েছিলেন। তাঁর সব-ডেপুটি কলেক্টরের চাকরি হয়েছিল। জমাদার শম্ভু রায়েরও সব ডেপুটি কালেক্টরের চাকরী হয়েছিল। তবে, যতটা মনে পড়ে তিনি বি. এস্. সি. পর্যন্ত পড়েছিলেন।

সব রেজিষ্ট্রারের চাকরির উমেদওয়ার

৩২, কলেজ স্ট্রীটের ঠিকানাতেই নজরুল ইস্‌লামের নামে মুলাকত (ইন্‌টারভিউ) করার জন্যে পত্রও এসেছিল। আফজালুল হক সাহেব সহ আমরা অনেকেই তাকে সেই মুলাকাতে যেতে দিইনি। আমরা তাকে বুঝিয়েছিলেম যে সব-রেজিস্ট্রারের চাকরী হলে তাকে কোথাও দূরে গ্রামের মতো জায়গায় পড়ে থাকতে হবে। সে জায়গায় সে কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশ পাবে না। আর এই পরিবেশ হারালে তার শক্তির বিকাশে বাধা ঘটবে। এই কথা মোটেই সত্য নয় যে নজরুল ইস্‌লামের সব-রেজিস্ট্রারের চাকরির নিয়োগ-পত্র এসে গিয়েছিল।

আরও একটি কথা বলে রাখা দরকার মনে করছি। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে মঈনুদ্দীন হুসয়ন সাহেব আমাদের

সহকর্মী ছিলেন। সুশিক্ষিত উদারমনা ব্যক্তি। রাজনীতিতে ন্যাশনালিস্ট। আমার রাজনীতি রূপ পরিগ্রহ করার পরে আমি তাঁকে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করেছি, পারি নি। তিনি ন্যাশনালিস্টই থাকবেন। তাঁরা ছ'ভাই (সুলেখক, অধ্যাপক রেজাউল করীম তাঁর ছোট ভাই) জীবনে কোনো দিন দাড়ি কামাননি। মঈনুদ্দীন হুসয়ন সাহেব খানিকটা আড়ালে থাকতে ভালোবাসেন। মেট্রিকুলেশন হতে বি. এ. পর্যন্ত যত পরীক্ষা তিনি পাস করেছেন সবই অন্য নামে, সেটাই নাকি তাঁর আসল নাম। আমরা তাঁর বন্ধুরা তাঁর সে নাম জানি না। তিনি ক্লাসিকাল পার্সী-ভাষা ভালো জানেন। আমাদের স্কুল-কলেজে ক্লাসিকাল পার্সী-ভাষাই পড়ানো হতো। পার্সী হতে ইংরেজি এবং ইংরেজি হতে পার্সীতে তিনি তখনকার দিনের ছাত্রদের জন্যে একখানা অভিধান সঙ্কলন করেছিলেন। এই অভিধানখানা তখন খুব ভালো চলেছিল। এখন আর ছাপা নেই। এর সঙ্কলয়িতার নাম কিন্তু মঈনুদ্দীন হুসয়ন নন, সেখানে দেওয়া হয়েছে তাঁর আসল নাম। অতএব কেউ বুঝলেন না যে তিনি একখানা পার্সী অভিধানের সঙ্কলনকারী। তাঁর একটি ছোট্ট প্রকাশনভবন ছিল, নাম "নূর লাইব্রেরী"। সেই উপলক্ষেই তিনি কলকাতায় বাস করতেন। ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট উঠে গেলে কাজী নজরুল ইস্‌লাম কলকাতায় এসে আমার ওখানে উঠবেন একথা তাঁর জানা ছিল। কিন্তু যখন নজরুল এসে পৌঁছল তখন তিনি ছিলেন বীরভূম জিলার মাড়্গ্রামে। সেখানেই তাঁর বাড়ী। আমি তাঁকে পত্র লিখে জানালাম যে নজরুল ইস্‌লাম কলকাতায় পৌঁছে গেছে। তিনি তো জানতেনই যে টাকার দরকার হবে। একখানা রেজিষ্ট্রী করা খামে তিনি নজরুলের জন্যে কিছু টাকা আমায় পাঠিয়ে দিলেন। আমি "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে"তে লিখেছিলেম যে তিনি পঁয়ত্রিশ টাকা পাঠিয়েছিলেন।

মঈনুদ্দীন হুসয়ন ও নজরুল ইস্‌লাম
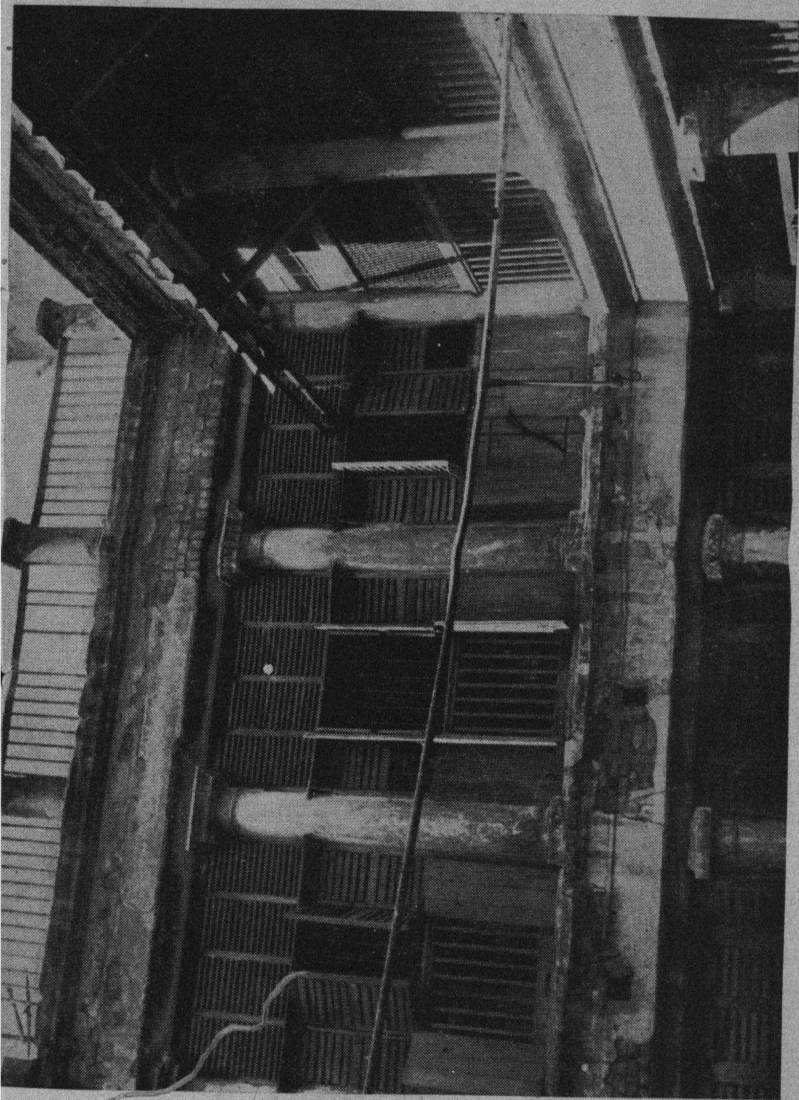
বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীর ফটোতে দেখানো দোতালার অংশটা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' ভাড়া নিয়েছিলেন। ফটো তোলার সময়ে তার ডান দিকের কিছুটা অংশ কেটে গেছে এবং একখানা ঘর আঁধার হয়ে গেছে। উনিশশ' বিশ সালের মার্চ মাসে ফৌজ হতে ফিরে কাজী নজরুল ইস্‌লাম ছবির এই আঁধার ঘরখানাতেই লেখকের সহকক্ষবাসী হয়েছিলেন।

পরে মঈনুদ্দীন সাহেব আমায় মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সেই খামে পঁয়ত্রিশ নয়, পঞ্চাশ টাকা ছিল।

কবি প্রসিদ্ধি লাভ করার আগেই মঈনুদ্দীন হুসয়ন সাহেব নজরুল ইসলামের জন্যে এই টাকা পাঠিয়েছিলেন। নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে এটাই ছিল তার প্রথম আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তি। আমার মতে এটা একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাই, এখানে লিখে রাখলাম। হয়তো মঈনুদ্দীন সাহেবের মনের কোণে এই আশা থাকতেও পারে যে (তিনি বলছেন, ছিল না) তিনি একদিন নজরুলের কিছু লেখা ছাপাবেন। মঈনুদ্দীন হুসয়ন সাহেব আজও জীবিত আছেন। কাজী নজরুল ইস্‌লামের সম্পর্কে অনেক তথ্য সরবরাহের অধিকার তাঁরও আছে।

হাঁ, কাজী নজরুল ইস্‌লাম এসে তো ৩২, কলেজ স্ট্রীটে উঠলেন। তারপরে সে-বাড়ীর কি অবস্থা হয়েছিল সে-কথা এখনও বলি নি। বাড়ীটির ওপরে বঙ্গ বাহিনীর সৈনিকদের এক রকম আক্রমণই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা দলে দলে আসছিলেন ও চলে যাচ্ছিলেন। শুধু এতটুকু হলেও কথা ছিল না, এই যুবকরা আবার নাচতেও চান। নীচে দোকান আছে ইত্যাদি কথা বলে আমি অতি কষ্টে তাঁদের নিবৃত্ত করি। ক'দিন আমাদের দাঁড়াবার জায়গা পেতেও অসুবিধা হচ্ছিল। ওই সৈনিকদের মুখেই

ছাড়া-পাওয়া সৈন্যদের ভিড়

শুনেছি যে বাঙালী পল্টনের সাত হাজার সৈনিকের প্রত্যেকেই পল্টনের দুই জন সৈনিককে ব্যক্তিগত-ভাবে চিনতেন। তার একজন হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম, আর অন্যজন হচ্ছেন জমাদার শম্ভু রায়। জমাদার শম্ভু রায় কলকাতা থাকলে প্রায় রোজই আসতেন। তাঁর চাকরি না হওয়া পর্যন্ত তিনি এইরূপ যাতায়াত চালু রেখেছিলেন। আগেই বলেছি যে তাঁর সব-ডেপুটি কলেক্টরের চাকরি হয়েছিল। পল্টনে নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন শম্ভু রায়। আমি অনেককেই তাঁর

নিকটে যেতে বলেছি,—বলেছি যে নজরুলের সৈনিক জীবনের কথা তিনি খুব ভালোভাবে বলতে পারবেন। কিন্তু খুব সম্প্রতি হুগলীর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় আমায় জানিয়েছে যে শম্ভু রায় আর বেঁচে নেই। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে তিনি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং হুগলীতেই বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকতেন, মারাও গিয়েছেন হুগলীতেই। নজরুল জীবনের একটা সময়ের অনেক বেশী তথ্য যিনি জানতেন তাঁর জীবন এমনভাবে ফুরিয়ে গেল কলকাতার এত কাছেই। অথচ আমি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম, অন্যদেরও কত বলেছি তাঁকে খুঁজে বা'র করতে। আমার নিজের একটা মস্ত বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে সরকারী চাকুরেরা আমার নিকটে ঘেঁষতে চান না পাছে না তাঁদের চাকরি চলে যায়। আবার পেন্সন পেলেও তাঁদের ভয় ভাঙে না। পেন্সনও তো কেটে যেতে পারে।

গোপী নামে একজন বাঙালী পল্টনের সৈনিকের কলকাতার পাঁচু খানসামা লেনে কিংবা ছকু খানসামা লেনে বাড়ী ছিল। নজরুল তাঁকে গুপী ব'লে ডাকত। তাঁর সঙ্গীতের ওপরে আসক্তি ছিল। পল্টনে তিনি হয় তো বিউগল বাজাতেন। তখন যা শুনেছিলেম এখন তা ভালো মনে নেই। এই গুপী নজরুলকে কী ভালোই না বাসতেন! নজরুলের গান কি করে রেকর্ডে উঠবে, এই ছিল তাঁর চিন্তা। নজরুলের কোনো একটি লেখায় সে গুপীর নাম উল্লেখ করেছে।

১৯২০ সালে অসন্তুষ্ট দেশ টগবগ করে ফুটছিল। তবুও তুরস্কের দুর্দশায় মুসলমানদের মনে কিছু হতাশার ভাবও ছিল। অবশ্য তাঁরা বিক্ষুব্ধ ছিলেন আরও অনেক বেশী। বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা যোগ না দিলে দেশ কখনও এত টগবগ করত না। নজরুল ইসলামের নিকটে কবি হাফিজের "দিওয়ানের" যে একখানা খুব ভালো সংস্করণ ছিল সে কথা আগে বলেছি। একদিন মঈনুদ্দীন সাহেব আর আমি

হাফিজের একটি কবিতা নজরুলকে দেখিয়ে দিয়ে তা বাঙলায় তর্জমা করতে বলি। কবিতাটির প্রথম পংক্তি ছিল—

"ইউসফ্-ই-গুম্‌গশ্‌তা বাজ আইয়েদ
ব-কিন্‌আন গম্ মখুর"

নজরুল তার তর্জমা করেছিল—

"দুঃখ কি ভাই হারানো ইউসফ্
কিনানে আবার আসিবে ফিরে"।

হতাশা ভোলানোর কবিতা। পুরো কবিতাটি মাসিক কাগজে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু পরে নজরুল তাতে অনেক পরিবর্তন করেছে এবং হাফিজের ভাবাবলম্বনে লিখিত কবিতা হিসাবে তা পুস্তকে স্থান পেয়েছে।

"মোসলেম-ভারত" ও কাজী নজরুল ইস্‌লাম

"মোস্‌লেম ভারত" একখানা প্রথম শ্রেণীর বাঙলা মাসিক পত্রিকা ছিল। তার প্রথম সংখ্যা বা'র হয়েছিল বাঙলা ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে। খ্রীস্টীয় হিসাবে ১৯২০ সালের এপ্রিল মাস হবে। ৩, কলেজ স্কোয়ারের (এখনকার বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের) "মোসলেম পাবলিশিং হাউস" ছিল "মোসলেম ভারতের" মালিক। নদীয়া-শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক সাহেব ছিলেন তার সম্পাদক। এক্‌ সময়ে পেশায় তিনি শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অন্য পেশা ছিল লেখা। আফজালুল হক সাহেব তাঁর পুত্র। আসলে "মোসলেম পাবলিশিং হাউস" ও "মোসলেম ভারতের" সব কিছুই ছিলেন আফজালুল হক সাহেব। পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনা ইত্যাদি সবই তিনি করতেন, পিতার নামটি শুধু তিনি ব্যবহার করতেন। কুমিল্লায় আশ্‌রাফউদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী "মোসলেম পাবলিশিং হাউসের" আর একজন মালিক হলেও তিনি কখনও দেখেন নি কি তাতে হচ্ছে।

একটি অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে হবে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসে কাজী নজরুল ইসলাম থাকতে এলো, আর কার্যত ওখান থেকেই বা'র হতে যাচ্ছিল "মোসলেম ভারত" নামক মাসিক পত্রিকাখানা। ওই বাড়ীতে আফজালুল হক সাহেবের বড়

তখ্‌ৎপোশখানাই ছিল "মোসলেম ভারতে"র অবিজ্ঞাপিত সম্পাদকীয় দফ্‌তর। নজরুল যেদিন এসেছিল সে রাত্রেই তাকে দিয়ে আফজাল সাহেবের ঘরে আমরা গান গাইয়ে নিয়েছিলেম একথা আমি আগে বলেছি। মোসলেম ভারতের কিছু কিছু লেখা প্রেসে চলে গিয়েছিল। পরের মাসেই তো বা'র হবে কাগজখানা। আমার সম্মুখে সেই রাত্রেই "মোসলেম ভারতে" লেখা দেওয়ার বিষয়ে আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে নজরুলের কথাবার্তা হয়ে গেল। আফজাল সাহেব সে রাত্রে নজরুলের ওপরে কতটা ভরোসা করতে পেরেছিলেন তা জানিনে, তবে তার কাছ থেকে লেখা তিনি চেয়েছিলেন। এর আগে তার কয়েকটি লেখা অন্যান্য কাগজে ছাপা হয়েছিল। নজরুল বলল সে একখানা পত্রোপন্যাস লেখা শুরু করেছে। তার ক'খানা পত্র সে যে করাচির সেনানিবাস হতে লিখে এনেছিল একখানা ফুলস্ক্যাপ ফলিও সাইজের খাতা খুলে আমাদের তা সে দেখিয়েও দিল। আফজালুল হক সাহেব রাজী হলেন যে পত্রোপন্যাসখানা তিনি তাঁর কাগজে ছাপাবেন। তার পরে নাম

বাঁধনহারা

নিয়ে কথা উঠল। নজরুল বলল, "ত্‌হমীনা" কিংবা "বাঁধনহারা" নাম দিতে পারেন। বলা বাহুল্য আমাদের "বাঁধনহারা" নামটিই পসন্দ হলো। নজরুল কেন পুস্তকখানার "ত্‌হমীনা" নাম দিতে চেয়োছিল তা জানিনে, তার পুস্তকে কোনো মেয়ের নাম "ত্‌হমীনা" আছে বলে তো মনে পড়ছে না। হয় তো নামটি তার কল্পনায় ছিল। পরে সে মত পরিবর্তন করেছিল।

"মোসলেম ভারতে"র জন্যে কপি দিয়ে নজরুল ইস্‌লাম চুরুলিয়া গিয়েছিল। যে কাগজ বৈশাখ মাসে বা'র হবে তার লেখার জন্যে আর অপেক্ষা করার সময় ছিল না।

কাজী নজরুল ইস্‌লামের লেখা ছাপানোর জন্যে "মোস্‌লেম ভারত" প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, না, এই কাগজখানার জন্যেই কাজী

নজরুল ইসলাম এক রকম রাতারাতি কবি প্রসিদ্ধি লাভ করতে পেরেছিল একথার জওয়াব এক কথায় দেওয়া মোটেই সহজ নয়। ব্যাপারটি দু'দিক থেকেই বিবেচনা করা যায় এবং আমার মনে হয় সত্য দু দিকেই আছে। করাচির সেনানিবাসে থাকার সময়ে নজরুল ইস্‌লামের তিনটি মাত্র কবিতা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যক "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছাপা হয়েছিল "মুক্তি"। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যক "সওগাতে" বা'র হয়েছিল "কবিতা-সমাধি", আর ওই বছরের পৌষ সংখ্যক "প্রবাসী"তে ছাপা হয়েছিল "আশায়" নাম দিয়ে হাফিজের ভাব নিয়ে লেখা ছয় ছত্রের একটি কবিতা। অন্য কোন কাগজে তার আর কোন কবিতা ছাপা হয়েছিল ব'লে তো আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না। বরঞ্চ তার ছাপানো গল্পের সংখ্যাই ছিল বেশী। "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছাপা হয়েছিল "হেনা" ও "ব্যাথার দান", আর "সওগাত" নামক মাসিকপত্রে বা'র হয়েছিল "স্বামীহারা" ও "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী" শীর্ষক গল্প। কাজেই, ফৌজ হতে ফিরে আসার আগে কাজী নজরুল ইস্‌লাম তেমন কোন কবি খ্যাতিই লাভ করেনি। তার কবিতার বান ডেকেছিল তার ফৌজ হতে ফিরে আসার পরে। সত্যই বান ডেকেছিল। কী সৌভাগ্য নূতন মাসিক "মোস্‌লেম ভারতে"র যে কাগজখানা বা'র হওয়ার মুখেই তা কাজী নজরুল ইস্‌লামের মতো একজন উদীয়মান কবিকে প্রায় বাঁধা লেখক হিসাবে পেয়ে গেল। আর, নজরুল ইস্‌লামেরও সৌভাগ্য বলতে হবে যে তার কবিতার স্রোত বইয়ে দেওয়ার জন্যে নূতন হলেও একখানা প্রথম শ্রেণীর মাসিক তার হাতের মুঠোয় আপনাআপনি এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে "মোসলেম ভারতে"র প্রথম শ্রেণীর কাগজ হওয়ার পেছনে নজরুলেরও অবদান আছে। তার কয়েকটি কবিতা কাগজে ছাপা হতে না হতেই তার খ্যাতি নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

"মোসলেম ভারত"-এ মুদ্রিত তার মাত্র দু'টি কবিতা—"খেয়াপারের তরণী" ও "বাদল প্রাতের শরাব"—পড়েই কবি ও সাহিত্যালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার "মোসলেম ভারতে"র সম্পাদকের নামে তাঁর বিখ্যাত পত্রখানা লিখেছিলেন। নজরুল ইস্‌লাম ও মোহিতলাল মজুমদারের বিষয়ে এই স্মৃতিকথার যে-অধ্যায় লেখা হবে আমরা সেখানে এই পত্রখানার পুনর্মুদ্রণ করব। আরও অনেকে পত্র লিখে এই নূতন কবির অভ্যুদয়কে নন্দিত করলেন। তাঁদের মধ্যে শান্তি-নিকেতনের সুধাকান্ত রায়চৌধুরীও ছিলেন। নজরুলের বয়স তখন মাত্র একুশ বছর।

১৩২৭ বঙ্গাব্দের, অর্থাৎ প্রথম বর্ষের "মোসলেম ভারতে" নজরুল ইস্‌লামের যে-কয়টি লেখা ছাপা হয়েছিল তার "শিরোনাম" আমি নীচে লিখছি :

(১) বাঁধন-হারা (ক্রমশ প্রকাশ্য পত্রোপন্যাস)।
(২) কোরবানী (কবিতা)।
(৩) বাদল বরিষণে (রূপক গল্প)
(৪) বাদল প্রাতের শরাব (কবিতা)
(৫) বোধন
(৬) মোহর্‌রম (কবিতা)
(৭) শাত্‌-ইল-আরব (কবিতা)
(৮) গান (তিনটি)
(৯) হাফিজের গজল
(১০) ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌দহম, আবির্ভাব (কবিতা)
(১১) বিরহ-বিধুরা (কবিতা)
(১২) মরমী (গান)
(১৩) স্নেহ-ভীতু (গান)

এর বেশীর ভাগ লেখাই, আশ্চর্য নয় যে সব ক'টিই, নজরুল যখন রচনা করেছিল তখন সে আমার সঙ্গেই থাকছিল। "কোরবানী"

কবিতাটি রচনার সময়ে সে নিঃসন্দেহে আমার সঙ্গে ছিল। কেউ কেউ লিখেছেন নজরুল ইস্‌লাম তরীকুল আলম সাহেবের একটি প্রবন্ধের উত্তরে কবিতাটি লিখেছিল। তখন জিল্‌হজ্জের মাস (যে-মাসে কোরবানী অর্থাৎ পশু বলি হয়) এসেছিল। কোরবানীর সময় ছিল বলে নজরুলের পক্ষে "কোরবানী" শীর্ষক কবিতা লেখা অসম্ভব ছিল না। তার পরে সে "মোহর্‌রম" ও "ফাতেহা-দোয়াজ্‌দহম" (এ মাসে মুহম্মদ জন্মেছিলেন) নাম দিয়েও কবিতা লিখেছিল। আমার পাশে বসেই নজরুল ইসলাম "কোরবানী" শীর্ষক কবিতাটি লিখেছিল। আমাকে সে কবিতাটি পড়েও শুনিয়েছিল। তরীকুল আলম সাহেবের কোনো প্রবন্ধের বিরুদ্ধে কবিতাটি লেখা হয়েছিল একথা কেন যে আমার মনে নেই তা আমি বুঝতে পারছিনে। কিন্তু আমি কথাটা উড়িয়েও দিতে পারছিনে। তরীকুল আলম সাহেবের পক্ষে পশুবলিকে বর্বরতা বলা মোটেই অসম্ভব ছিল না। তিনি উদারচেতা পণ্ডিত ব্যক্তি শুধু ছিলেন না, সাহসী লেখকও ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল তা'লীমুদ্দীন আহ্‌মদ। রংপুরের বিখ্যাত উকীল, কুর্‌আনের বঙ্গানুবাদক মৌলবী তস্‌লীমুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের পুত্র। যোগ্যতার সহিত এম. এ. পাস ক'রে তিনি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়েছিলেন। তাঁর নামের সঙ্গে "তরীকুল আলম" কথাটা কেন যোগ হয়েছিল তা জানিনে। বাঙলায় এর অর্থ হয় "বিশ্বপথিক"। কোনও সংগঠন হয় তো পাণ্ডিত্যের জন্যে তাঁকে "বিশ্বপথিক" উপাধি দিয়ে থাকবেন। তা'লীমুদ্দীন সাহেব স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন মাসিকপত্রে লিখতেন। এই সাহসী ও চিন্তাশীল লেখক অকালে মারা গিয়েছেন। বড় দুঃখ যে কেউ তাঁর প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে পুস্তকের আকারে ছাপালেন না।

কোরবানী শীর্ষক কবিতা

"খেয়া-পারের তরণী" শীর্ষক কবিতাটি কি ক'রে ও কেন রচিত হয়েছিল সেই কথাটি আমি এখানে ব'লে রাখতে চাই। তখন

নজরুল ইস্‌লাম আর আমি ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটে বাস করছি। কি কারণে জানি না, আফজালুল হক সাহেব ঢাকা গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর "মোস্‌লেম ভারতে" ছাপানোর উদ্দেশ্যে ঢাকার বেগম মুহম্মদ আজম সাহেবার (খান বাহাদুর মুহম্মদ আজমের স্ত্রীর) আঁকা একখানা নৌকার ছবি সঙ্গে নিয়ে আসেন। পত্রিকায় ছাপানোর আগে ছবিখানার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তার জন্যে ছবিখানা একদিন বিকাল বেলা নজরুল ইস্‌লামের নিকটে আফজালুল হক সাহেব রেখে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে নজরুল ইস্‌লাম গদ্যে এই আধ্যাত্মিক ছবিখানার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে দিবে। কিন্তু নজরুল তা করল না। সে রাত্রি বেলা প্রথমে মনোযোগ সহকারে ছবিখানা অধ্যয়ন করল এবং তারপরে লিখল এই ছবির বিষয়ে তার বিখ্যাত কবিতা "খেয়া-পারের তরণী"। এটি নজরুলের একটি বহুল প্রশংসিত কবিতা। সেই সময়ে তার কলম যেন পরশ পাথর হয়ে গিয়েছিল। তার ছোঁয়া লাগলেই তা থেকে সোনা বা'র হয়ে আসছিল। "খেয়া-পারের তরণী" নজরুলের স্বকীয় কলাকৌশলে অপূর্ব সৃষ্টি হলেও একথা মানতেই হবে যে এই সৃষ্টির ভিত্তি বেগম আজম সাহেবার সৃষ্টির ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এই কবিতার কথাগুলিও বেগম সাহেবার ছবি হতে বা'র হয়ে এসেছে। কবিতাটিকে ঘিরে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা একান্তভাবে বেগম সাহেবারই। আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে "খেয়া-পারের তরণী"র আলোচনা ও প্রশংসা যাঁরা করছেন তাঁরা বেগম আজমের ছবিখানার নামোল্লেখও করছেন না। ঢাকার সাহিত্যিকদের আলোচনায়ও যে বেগম সাহেবার ছবি বাদ পড়ে যাচ্ছে তাতে আমার আরও বেশী আশ্চর্য বোধ হচ্ছে।

খেয়া-পারের তরণী

আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে আমি লিখেছি :

"আগেই বলেছি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসের একখানা ঘর ভাড়া ক'রে আফজালুল হক সাহেব থাকতেন। তিনি তাঁর মোস্‌লেম পাবলিশিং হাউস হতে একখানা বাঙলা মাসিক কাগজ বা'র করার তোড়জোড় বেশ কিছুদিন ধ'রে করছিলেন। আমরা একত্রে থাকতেম ব'লে এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হ'ত। আমি তাঁর কাগজের নাম হতে 'মোসলেম' কথাটা বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেম। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম যে আমাদের সাহিত্য সমিতির নামের সঙ্গে "মুসলমান" কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর পাবলিশিং হাউসের নামের সঙ্গেও "মোস্‌লেম" কথাটা আছে, এখন তিনি তাঁর কাগজের নামের সঙ্গেও "মোসলেম" কথা যোগ করতে যাচ্ছেন। এইভাবে আলাদা হয়ে থাকার মনোবৃত্তি প্রকাশ পাচ্ছে না কি? আফজালুল হক সাহেব সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন লোক ছিলেন না। সুসাহিত্যিক ও কবি মোজাম্মেল হক সাহেব (শান্তিপুরের) ছিলেন তাঁর পিতা। হিন্দুদের মধ্যে তাঁর বন্ধুত্ব ও পরিচয় ব্যাপক ছিল। তবুও ব্যবসায়ের দিক থেকে তাঁর কাগজের নাম হতে 'মোস্‌লেম' কথাটি বাদ দিতে তিনি সাহস পেলেন না। মুস্‌লিম সম্পাদিত কাগজ যে হিন্দুরা বেশী কিনবেন এ-ভরোসা তাঁর ছিল না।"

মোসলেম ভারত ও আমি

"স্মৃতিকথা" লেখকের বিপদ পদে পদে। যে-সময়ের কথা তিনি লেখেন সেই সময়টা সর্বতোভাবে অতীত নয়, লেখক নিজেই তো বিগত হননি। যাঁদের নামের উল্লেখ স্মৃতিকথায় বারে বারে হয় তাঁরাও বেশীর ভাগ বেঁচে থাকেন। তাই, কোন না কোন তরফ হতে প্রতিবাদ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু "স্মৃতিকথা"র লেখক তো সম-সাময়িক ইতিহাসের মাল-মসলাই একত্র ক'রে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখতে হবে যে তিনি ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন না।

আফজালুল হক সাহেব আমায় বলছেন যে আমার সঙ্গে যে তাঁর কাগজের নাম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতো একথা তাঁর মনেই পড়ছে না। এটাকে জোরালো করার জন্যে তিনি বলছেন যে "মোসলেম ভারত" বা'র হওয়ার আগে তিনি ৩২, কলেজ স্ট্রীটে থাকতেই আসেননি। তর্কের খাতিরে আমি যদি মেনেও নিই যে আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে 'মোস্‌লেম ভারতের' নামকরণ নিয়ে আমার কোনো দিন কোনো আলোচনাই হয়নি, তবুও এই কথা তো সত্য যে তাঁর কাগজের নাম তিনি দিয়েছিলেন "মোসলেম ভারত", তাঁর পাবলিশিং হাউসের নাম দেওয়া হয়েছিল 'মোসলেম পাবলিশিং হাউস', এমন কি 'মোসলেম ভারতে'র সংক্ষিপ্ত তারের ঠিকানা পর্যন্ত ছিল "মিল্লাত"। মিল্লাত শব্দের মানে ধর্ম। উর্দুতে আমরা "মুল্ক্‌-ও-মিল্লাত" বলি। তার মানে দেশ ও ধর্ম। ব্যবসায়িক বিবেচনা হতেই তো তিনি এসব করেছিলেন। আমি তাঁকে লোকের নজরে খাটো করার জন্যেই কি তাঁর এত সব প্রশংসা করলাম ?

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আফ্‌জালুল হক সাহেবের পরিচয় ছিল না। আমি যে নজরুলের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেম একথা আশা করি আফজালুল হক সাহেব স্বীকার করেন। এই পরিচয় করানোর স্থানটি কোথায় ছিল ? ৩২, কলেজ স্ট্রীট নয় কি ? 'মোসলেম ভারতে'র প্রথম সংখ্যা এপ্রিল মাসে বা'র হয়েছিল। নজরুল মার্চ মাসে এসেই যদি লেখা না দিত সেই লেখা এপ্রিল (বৈশাখ) মাসে প্রথম সংখ্যা "মোসলেম ভারতে" কি করে ছাপা হতে পারত ? সেই সময়ে তিনি ৩২, কলেজ স্ট্রীটে না থাকলে কোন্ ঠিকানায় থাকতেন ? তাঁর স্মৃতিতে কিঞ্চিৎ বিভ্রম ঘটেছে (বৃদ্ধ বয়সে বেশীর ভাগ লোকেরই স্মৃতি-বিভ্রম ঘটে) এটা দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এক রকম জিদ করেই নজরুল চরিতকারদের ভুল তথ্য সরবরাহ করেছেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবকে পর্যন্ত তিনি একবার কথাটা জিজ্ঞাসা

করলেন না! নজরুল যখন এসেছিল তখন তো ওতুদ সাহেব তাঁর সঙ্গে ৩২, কলেজ স্ট্রীটেই থাকতেন। তথ্যটা এমন কিছু ভুল নয় যে যাতে তুনিয়া ওলট-পালট হয়ে গেছে, তবুও ভুল তথ্য তো বটে।

সাহিত্য সমিতির নাম কেন "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি" হয়েছিল সে সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন ডক্টর মুহম্মদ শহীতুল্লার একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকেই ব্যাপারটি বোঝা যায়। বক্তব্যটি এখানে তুলে দিলাম :

> "আমরা কয়েকজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য ছিলাম। সেখানে হিন্দু মুসলমান কোন ভেদ না থাকলেও আমরা বড়লোকের ঘরে গরীব আত্মীয়ের মতন মন-মরা হয়ে তার সভায় যোগদান করতাম। আমাদের মনে হলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিলোপ না করেও আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য-সমিতি থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ৯নং আন্তনিবাগান লেনে মৌলবী আবতুর রহমান খানের বাড়ীতে ১৯১১ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক সভা আহূত হয়। ....আমি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক হই।"
>
> (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)

আমি ১৯১৩ সালে কলকাতা এসেছি। ১৯১৪ সাল হতে অন্য অনেকের সঙ্গে এই সমিতিকে বাড়াবার জন্যে পরিশ্রম করেছি। ১৯১৮ সালে (১৩২৫ বঙ্গাব্দ) যখন সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র বা'র করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন আমরা অনেকেই (সম্ভবত আমরাই সংখ্যাধিক ছিলেম) পত্রিকাখানার নাম শুধু "সাহিত্য-পত্রিকা" করতে চেয়েছিলেম। কিন্তু আমাদের সভাপতি মৌলবী আবতুল করীম সাহেবকে আমরা কিছুতেই রাজী করাতে পারিনি। তাঁর যুক্তি ছিল যে হিন্দুরা এ পত্রিকা কিছুতেই কিনবেন না, তবে কেন মুসলমানদের মনে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করতে যাই!

মুসলমানরা অন্তত বুঝুন যে পত্রিকাখানা মুসলমানদের। এই ব্যাপার নিয়ে ভোটে সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করে আমরা আমাদের বৃদ্ধ সভাপতিকে হারাতে চাইনি। তাতে তিনি হয়তো রাগ ক'রে সাহিত্য-সমিতি ছেড়েও দিতে পারতেন। এটাই ছিল তখনকার লোকেদের মানসিক আব-হাওয়া। আফজালুল হক সাহেবও এই আব-হাওয়ার দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন। অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকাও সাম্প্রদায়িক কাগজ ছিল না, মোস্‌লেম ভারতও নয়।

কলকাতায় নজরুলের জনপ্রিয়তা

আগেকার পরিচ্ছেদে আমি যা লিখেছি তা থেকে একথা যেন কেউ বুঝে নিবেন না যে পল্টন হতে ফিরে আসার পরে নজরুল ইস্‌লাম শুধু "মোসলেম ভারতে"ই লিখেছে। লিখেছে সে আরও অনেক কাগজে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকাতে তো সে না লিখেই পারেনা। এই পত্রিকা ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিই তাকে প্রথম বাঙলার সুধী সমাজের সম্মুখে তুলে ধরেছিল। 'উপাসনা' নামক মাসিক কাগজেও নজরুলের কবিতা ছাপা হচ্ছিল এবং নজরুলের মারফতে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাও সেই সময়ে উপাসনায় ছাপা হয়েছে। "সওগাত" এবং আরও অনেক কাগজেও নজরুলের লেখা তখন বা'র হয়েছে। এটা ১৯২০ সালের কথা।

নজরুলের জনপ্রিয়তার অন্য একটি কারণ ছিল তার গান। আমার মতে নজরুল খুব সুকণ্ঠ গায়ক ছিল না। তবে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে সে গান গাইত। তাই, তার গান সব শ্রেণীর লোককে আকর্ষণ করত। সকলেই তার গান শুনতে চাইত। সময় হাতে থাকলে নজরুল কারুর অনুরোধ ফেলত না। প্রথমে তো হিন্দু-মুস্‌লিম ছাত্র ও কেরানীদের মেসগুলি হতেই গান গাওয়ার জন্যে নজরুলের আমন্ত্রণ আসতে লাগল। তার পরে ধীরে ধীরে

এই আমন্ত্রণ প্রসারিত হতে লাগল অনেক সব হিন্দু পরিবারেও। আমি অনেক সময়ে নজরুলের সঙ্গে অনেক মেসে গিয়েছি। গানের মজলিসের খরচ ছিল মাত্র কয়েক পেয়ালা চা। নজরুলের সঙ্গে কোনো হিন্দু পারিবারিক গানের মজলিসে আমি কখনও যাইনি। সেইসব পরিবারে নিশ্চয় নজরুলের অনেক যত্ন হতো। এইভাবে তার শুধু জনপ্রিয়তা যে বাড়ছিল তা নয়, সে একটা সামাজিক বাঁধও ভেঙে দিচ্ছিল।

অন্য গান যে নজরুল দু' একটা গাইত না তা নয়, কোনো হিন্দুস্তানী বস্তী সংলগ্ন জায়গায় গেলে সে হিন্দুস্তানী গানও গাইত, এমন কি দু' একটি হিন্দুস্তানী গান সে নিজেও রচনা করেছিল,—এসব সত্ত্বেও সে মূলত গাইত রবীন্দ্রনাথের গান। এত বেশী রবীন্দ্র-সঙ্গীত সে কি ক'রে মুখস্থ করেছিল তা ভেবে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। সমস্ত 'কুর্‌আন' যাঁরা মুখস্ত করেন তাঁদের হাফিজ বলা হয়। আমরা বলতাম নজরুল ইস্‌লাম রবীন্দ্র-সঙ্গীতের হাফিজ।

নানান জায়গায় গান গাওয়ার ভিতর দিয়ে শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহিত নজরুল ইসলামের সংযোগ ও পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়ক হিসাবে তখন কলকাতায় শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের খুব নাম। এই পরিচয়ের পর হতে হরিদাস বাবু ও নজরুল রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়ার জন্যে এক সঙ্গে অনেক জায়গায় যেতে লাগলেন।

নজরুল ইস্‌লামের মারফতে হরিদাস বাবুর সহিত আমরাও পরিচয় হয়েছিল। সুশ্রী যুবক, মোলায়েম স্বভাব, বয়সে নজরুলের চেয়ে কিছু বড়। কয়েকজন যুবক একবার তাঁর গান শুনতে চাইলেন। আমি হরিদাস বাবুকে বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। নজরুল তখন কলকাতায় ছিল না। হায়াত খান লেনে হরিদাস বাবুর প্রেস ছিল। খুব ভালো কাজ হতো এই প্রেসে।

যতটা মনে পড়ে নাম ছিল মডার্ন আর্ট প্রেস। ক্রমে প্রেসটি খুব বড় হয়ে যায় এবং বৌবাজারে দুর্গা পিতুরী লেনে উঠে আসে। বড় দুঃখ যে শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় অকালে মারা গেছেন। তাঁর বিরাট প্রেসও তাঁর আত্মীয়রা বেশী দিন চালাতে না পারায় বিক্রয় হয়ে গেছে।

নজরুল শুধু শিক্ষিত-সমাজে কাব্য-চর্চা করত না। তার পরিচয়ের পরিধিও সুবিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। আমি দেখেছি, তার গান ও কবিতার আবৃত্তি শোনার জন্যে চটকলের মজুরেরা পর্যন্ত তাকে ডেকেছে। পরে সে কৃষকদের ভিতরেও ঘুরেছে, বক্তৃতা দিয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজের গণ্ডীর ভিতরে সে শুধু নিজেকে ধরে রাখেনি। সে পৌঁছেছে জনগণের মধ্যেও। এই জন্যেই বাঙলা দেশের কবিদের ভিতরে নজরুল ইস্‌লাম সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছিল। আজও কারখানার মজুরেরা পর্যন্ত তার জন্ম-দিবস পালন করেন।

সান্ধ্য দৈনিক "নবযুগ"

আগেই লিখেছি বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীতে যোগদান করার যে-ডাক নজরুল ইস্‌লামের কানে পৌঁছেছিল সেটা ছিল তার নিকটে দেশ-প্রেমের আহ্বান। তা না হ'লে মেট্রিকুলেশন ক্লাসের প্রথম ছাত্র সে, সকলে মনে করছে পরীক্ষা দিয়ে সে জলপানি পাবে,—সে কি কারণে সব ছেড়ে দিয়ে ফৌজে চলে গেল? ফৌজ হতে তরুণ সৈনিকেরা প্রায়ই উদ্দাম স্বভাব নিয়ে ফিরে আসে, কিন্তু নজরুল ইস্‌লাম ফিরেছিল দেশ-প্রেমে ভরপুর হয়ে। নজরুল যে নিছক কবি নয়, সে যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিকও, এই কথাটি নজরুলের নূতন-পাওয়া সাহিত্যিক বন্ধুদের অনেকেই বুঝতে চাইতেন না, আর এই না বোঝার জন্যে অনেক অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আমি নজরুল ইস্‌লামের নিকটে জানতে চাইলাম সে রাজ-নীতিতে যোগ দেবে কিনা। জওয়াবে নজরুল বললে, 'তাই যদি না দেব তবে ফৌজে গিয়েছিলেম কিসের জন্যে?' দেশের অবস্থা তখন খুবই গরম। তাপের ওপরে চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষও সেই রকম টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ তখনও ভোলেন নি। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন দেশের

লোকেরা মেনে নিতে চাইছেন না কিছুতেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন সংস্কারকে কাজে লাগাতে চাইছেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌঁছেছে। মজুর শ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট চলেছে দেশের নানা জায়গায়। প্রথম মহাযুদ্ধে যে-সব ভারতীয়েরা বিরাট মুনাফা লুটেছেন তাঁরা নূতন কারখানা ইত্যাদিও করতে চাইছেন।

দু'চার জনকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল ইস্‌লাম আর আমি পরামর্শ করতে লাগলাম আমরা কিভাবে কাজে এগুব। এই পরামর্শে মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী ছিলেন। এই ওয়াজিদ আলী সাহেব একজন লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন, কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াজিদ আলী সাহেবের সঙ্গে কেউ যেন তাঁকে ভুল না করেন। ফজলুল হক সেলবর্সী ও মঈনুদ্দীন হুসয়ন সাহেবও আমাদের পরামর্শে ছিলেন। ফজলুল হক সেলবর্সী সীলেট জিলার লোক, খবরের কাগজে লিখতেন। আর মঈনুদ্দীন হুসয়ন সাহেবের কথা আমি আগেই লিখেছি। আমরা ঠিক করলাম যেমন করেই হো'ক একখানা ছোট্ট বাঙলা দৈনিক আমরা বা'র করব। এই কাগজে লেখার ভিতর দিয়ে আমাদের মত ও পথ নিরূপিত হয়ে যাবে।

একখানা ছোট্ট বাঙলা দৈনিকের পরিকল্পনা।

কিন্তু কাগজ তো বা'র করব, তার টাকা আসবে কোথা হতে? প্রথম মহাযুদ্ধের পরে একদিকে যেমন লোকের বিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল, অন্য দিকে আবার মুনাফাকারীরা নূতন নূতন জয়ণ্ট স্টক্ কোম্পানীও রেজিস্ট্রি করছিলেন। আমরা ভাবলাম টাকা সংগ্রহের জন্যে ওই রকম একটা কিছু করা যায় কিনা। পরামর্শের জন্যে মিস্টার এ. কে. ফজলুল হকের নিকটে যাওয়া স্থির হলো। মিস্টার আবুল কাসেম ফজলুল হক তখন কলকাতা হাইকোর্টের নামজাদা

উকীল (Vakil), আজকার ভাষায় এডভোকেট ছিলেন। তা ছাড়া, তিনি কংগ্রেস, মুস্‌লিম লীগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের যুক্ত নেতাও ছিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একদিন সকালে আমরা ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর নিকটে কথা তুলতেই তিনি বললেন, তাঁর একটা প্রেস আছে, কিছু টাকাও আছে,—আমাদের যদি কাগজ চালাবার সাহস থাকে তবে সব ব্যবস্থা তিনি ক'রে দিতে পারেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলাম। এখানে আগেকার কথা কিছু বলা দরকার। আমাদের ফজলুল হক সাহেবের নিকটে যাওয়ার কয়েক মাস আগে ১৯১৯ সালে, তিনি একবার মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেবের নিকটে দৈনিক কাগজ বা'র করার প্রস্তাব করেন। তিনি মোজাম্মেল হক সাহেবকে বললেন, "তোমার যাঁরা লোক আছেন তাঁদের অমুক দিন রাত্রে আমার এখানে নিয়ে আসবে। তাঁরা আমার এখানে খাবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁদের সঙ্গে আলাপও করব।" মোজাম্মেল হক সাহেব লোক খুঁজে পেলেন আমাকে ও আলী আকবর খানকে। আমরা গিয়ে ফলাউ খেলাম, আর কিছু কিছু কথাও বলে এলাম। কিন্তু আমি ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। মোজাম্মেল হক সাহেবকে বললাম যে তিনি আলী আকবর খানকে সঙ্গে নিয়ে অবিবেচকের কাজ করেছেন। খান সাহেব আমাদের কোন্ হাটে কিনে কোন্ হাটে যে বিক্রয় করবেন তার কোনো ঠিক নেই। এর পরে মোজাম্মেল হক সাহেব আর কোনো উৎসাহ না দেখানোতে প্রস্তাবটি তখনকার মতো চাপা পড়ে যায়। পরে আলী আকবর খানের সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করব।

মি. এ. কে. ফজলুল হক বাঙলা দৈনিকের প্রস্তাবে রাজী হলেন।

দৈনিক কাগজ বা'র করার নূতন প্রস্তাব নিয়ে ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে আমাদের দু'-তিন দিন বৈঠক হলো। ঠিক হলো

২০″ ইঞ্চি × ২৬″ ইঞ্চি সাইজের ছোট্ট একখানা সান্ধ্য দৈনিক আমরা বা'র করব। গোল বাধল কাগজের নাম নিয়ে। ফজলুল হক সাহেব মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের মতো একটি মুসলমানী নামের জন্যে জিদ ধরলেন। তাঁর যুক্তি এই যে "হিন্দুরা তোমাদের কাগজ কিনবেন না। পক্ষান্তরে মুসলমানরাও বুঝতে পারবেন না যে কাগজখানা মুসলমানদের। দু'দিক থেকেই তোমরা মার খাবে।" আমরা বললাম, মুসলমানী নামে আমরা কিছুতেই রাজী নয়। আর, বর্তমানে দেশের যে অবস্থা তাতে কাগজ দু'সম্প্রদায়ের লোকই কিনবেন। তাঁরা কাগজের লেখা কিনবেন, কাগজখানা চালাচ্ছেন, হিন্দু, না, মুস্‌লিম, তা তাঁরা দেখবেন না। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক সাহেব আমাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। কাগজের নাম স্থির হলো "নবযুগ"। ফজলুল হক সেলবর্সী, মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী, নজরুল ইস্‌লাম ও আমি স্থায়ীভাবে কাজ করব, একথা ফজলুল হক সাহেবকে বললাম, আর মঈনুদ্দীন হুসয়ন সাহেব যে প্রতিদিনই সাহায্য করবেন একথাও তাঁকে জানানো হলো। পরে আরও লোকের জোগাড় হবে সে খবরও তাঁকে দিলাম। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এক হাজার টাকা জমা দিয়ে মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী সাহেবের নামে ডিক্লারেশন নেওয়া হলো।

ওদিকে প্রেসের অবস্থা দেখে তো আমার চক্ষুস্থির। তাতে না আছে বাঙলা টাইপ, না আছে বাঙলা কেস। স্টিক্‌ ও রুলস্‌ ইত্যাদিও কিনতে হবে। মেসিনটাও ছিল খোঁড়া মতো। ফজলুল হক সাহেব ছিলেন বরিশালের লোক। তাঁর বরিশালের বন্ধু প্রিয়নাথ গুহ উচিত দামের কয়েক গুণ বেশী টাকায় তাঁকে এই প্রেস কিনে দিয়েছিলেন। এই প্রিয়নাথ গুহ একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। কি একটা উপলক্ষে "স্টেট্‌স্‌ম্যানে"র বয়কট ঘোষণা হলো। গুহ মশায় নিলেন এই বয়কট আন্দোলনের নেতৃত্ব। প্রতিদিন কলেজ স্কোয়ারে মিটিং হতে লাগল, আর সেই মিটিং-এ

পোড়ানো হতে লাগল স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ। স্টেট্‌সম্যানের প্রচার সত্যই কমে গেল। একদিন শ্রীগুহ কোথাও উধাও হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে বয়কট আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে গেল। লোকেরা অন্যান্য কাগজে লিখে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন P. N. G. (প্রিয়নাথ গুহ ওই রকমই লিখতেন নিজের নাম) কোথায় গেলেন? তারপরে প্রিয়নাথ গুহই একদিন স্টেট্‌স্‌ম্যানের মারফতে জওয়াব দিলেন যে তিনি স্টেট্‌স্‌ম্যানে মোটা বেতনের একটি চাকরী নিয়েছেন। ফজলুল হক সাহেবের এই রকম বন্ধু আরও ছিলেন।

যা'ক প্রেসটিকে তো চালু করতে হবে। গরমের দিনে প্রখর রৌদ্রে একে একে প্রেসের সরঞ্জামগুলি ঘুরে ঘুরে কিনতে হলো আমাকেই। আমার জীবনে দেখেছি এই জাতীয় কাজগুলি বরাবর আমাকেই করতে হয়। বাঙলা টাইপ কিনতে হবে। কোথা থেকে কার টাইপ কিনব তা আমি তখনও জানিনে। অনেকের নাম অনেকে বললেন, অধরের নাম কেউ কেউ বললেন, একজন কালিকা টাইপ ফাউণ্ড্রির কথাও বললেন। আমি গেলাম সেখানে। প্রতিষ্ঠাতা মালিক শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী নিজেই কারবার চালাচ্ছেন। তাঁর বড় ছেলে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী কিছু কিছু কারবার দেখাশুনা তখন শুরু করেছেন। ওখানে গিয়ে দেখলাম ভালোই করেছি। কারণ, শরৎ বাবু কথার খিলাফ কখনও করেন না, যেদিন টাইপ ডেলিভারি দেওয়ার ওয়াদা করেন, যেমন করেই হোক সেদিনই তিনি ডেলিভারি দেন টাইপ। সেই যে আমার মাথায় কালিকা টাইপ ফাউণ্ড্রি ঢুকেছে পঁচাত্তর বছর বয়স পার হওয়ার পরেও তা আমার মাথা থেকে আর বের হয়নি। কোনো না কোনো প্রেসের সঙ্গে সংযোগ তো রয়েছেই। শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর ছেলে শ্রীমলয় চক্রবর্তী এখন কারবারের দেখাশুনা আরম্ভ করেছেন। একজনদের সঙ্গে তিন পুরুষের কারবার কম কথা নয়। আমার তো ভাবতে বেশ লাগে। নজরুলের সঙ্গেও

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তীর হৃদ্যতা বেড়েছিল। তিনি নজরুলের কিছু বইও ছেপেছিলেন।

কামারডাঙ্গার বিপিনবাবু নামে একজন খুব তাড়াতাড়ি বাঙলা কেস্‌গুলি তৈয়ার করে দিলেন। কানে কম শুনতেন, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন তিনিও। পরে আরও দু'একবার তাঁর কাছে আমি গিয়েছি। ছোট ছোট সরঞ্জামও কেনা হয়ে গেল। ভোলানাথ দত্তের হ্যারিসন রোডের দোকান হতে রয়েল সাইজের কিছু নিউজ প্রিণ্ট কিনেও স্টক করা হলো। যদি ভুলে না গিয়ে থাকি এক পাউণ্ড নিউজ প্রিন্টের দাম তখন ছিল ছয় পয়সা।

সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। নুটবিহারী রায় নামক একজন খুব অভিজ্ঞ কম্পোজিটর কম্পোজিং-এর কন্‌ট্রাক্ট নিলেন। আমরা ঘোষণাও করে দিলাম যে অমুক দিন "নবযুগ" বা'র হবে। ইতোমধ্যে দু'একবার সাধু ও চলতি ভাষায় লেখা তৈয়ার করে নজরুল ইস্‌লাম ফজলুল হক সাহেবকে শুনিয়েও দিল। এর পরে হঠাৎ আমরা দু'টি বাধার সম্মুখীন হলাম। মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী সাহেব এমন একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন যে তিনি আর "নবযুগে"র সম্পাদকীয় কাজে যোগ দিবেন না জানালেন। তবে, একথাও ব'লে পাঠালেন যে তাঁর নামের ডিক্লারেশনে কাগজ বা'র হতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। ওয়াজিদ আলী সাহেবের খবরের কাগজে লেখার অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর যোগ না দেওয়ার ফলে আমাদের অসুবিধা নিশ্চয় হলো, তবুও তাঁর নামের ডিক্লারেশনে কাগজ বা'র করার সম্মতি তিনি যে জানালেন তাতে আমরা একটি বড় বাধা কাটিয়ে উঠলাম।

ফজলুল হক সাহেবের একটা বড় অসুবিধা ছিল এই যে তিনি মাসে একখানা কিংবা দু'খানা চিঠি তাঁর মাকে বাঙলায় লিখতেন। এটাই ছিল তাঁর একমাত্র বাংলা লেখার চর্চা। অবশ্য কলম হাতে নিলেই তিনি ইংরেজি লিখতে পারতেন। উঠে দাঁড়ালেই ইংরেজি,

বাঙলা ও উর্দু ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা তিনি দিতে পারতেন। তাঁর মনে সন্দেহ হলো যে আমরা মুসলমানের ছেলেরা হয়তো ভালো বাঙলা লিখতে পারব না। শুরুতেই হয়তো কাগজের বদনাম হয়ে যাবে। তাই, তিনি আমাদের নিকট প্রস্তাব করলেন যে প্রথমে কয়েক দিন শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি লেখানো হো'ক। তার জন্যে তাঁকে অবশ্য টাকা দেওয়া হবে। আমরা কিছুতেই রাজী হলাম না। আমরা বললাম, ইচ্ছা করলে আপনি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কেই কাগজ চালানোর ভার দিতে পারেন, তবে আমরা তাতে থাকব না। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নামজাদা সাংবাদিক ও বাঙলা ভাষার শক্তিশালী লেখক ছিলেন। শুনেছি তান্ত্রিক সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত নাকি কেউ ছিলেন না। কিন্তু নীতিহীন ভাড়াটে লেখক ছিলেন পাঁচকড়ি বাবু। টাকা পেলে যিনি যেমন চাইতেন তেমন লেখাই তিনি লিখতেন। ভোরের কাগজের জন্যে রাত্রে তিনি যা লিখতেন, সকাল বেলা সান্ধ্য দৈনিকের জন্যে তাঁর রাত্রের লেখার বিরুদ্ধেই আবার তিনি অবলীলাক্রমে লিখে যেতেন। এই ছিলেন শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের চেহারা দেখে ফজলুল হক সাহেব চুপ ক'রে গেলেন। হয়তো হতাশ হয়ে ভাবলেন যা হবার হো'ক। দ্বিতীয় বাধাও কেটে গেল। মিঃ শর্মা তখন (পরে নাইট হয়েছিলেন) এসোসিয়েটেড প্রেসে কাজ করতেন। তিনি ফজলুল হক সাহেবকে ধ'রে "নবযুগ"কে এসোসিয়েটেড প্রেসের গ্রাহক করে দিলেন। বাঙলা দৈনিকগুলি সবই বিকাল বেলায় বা'র হতো। তাঁরা ভোরের ইংরেজি কাগজ হতে খবর নকল করতেন, এসোসিয়েটেড প্রেসের গ্রাহক কেউ হতেন না। এটা হয়েছিল নবযুগের একটি বৈশিষ্ট্য।

নির্দিষ্ট দিনে কাজী নজরুল ইস্‌লাম ও আমার সম্পাদনায় "নবযুগ" বা'র হলো। নিশ্চয়ই নজরুলের জোরালো লেখার গুণে

প্রথম দিনেই কাগজ জনপ্রিয়তা লাভ করল। হিন্দু-মুসলমান দু'জনাই কাগজ কিনলেন। ফজলুল হক সাহেবের মেশিন খোঁড়া ছিল ব'লে আমরা চাহিদা মেটাতে পারলাম না। রয়েল সাইজের এক শীট্ কাগজের দাম করা হয়েছিল এক পয়সা। কাগজে নজরুল ইস্‌লাম ও আমার নাম ছাপা হত না। প্রধান পরিচালক হিসাবে এ., কে. ফজলুল হকের নাম ছাপা হতো। দৈনিক কাগজে লেখার অভিজ্ঞতা আমাদের ভিতরে একজনেরও ছিল না। নজরুল ইস্‌লাম কোনো দিন কোনো দৈনিক কাগজের অফিসেও ঢোকেনি। তবুও সে বড় বড় সংবাদগুলি প'ড়ে সেগুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত ক'রে নিজের ভাষায় লিখে ফেলতে লাগল। তা না হলে কাগজে সংবাদের স্থান হয় না। নজরুলকে বড় বড় সংবাদের সংক্ষেপণ করতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ঝানু সাংবাদিকরাও এ কৌশল আয়ত্ত করতে হিমশিম খেয়ে যান। তার পরে নজরুলের দেওয়া হেডিং-এর জন্যেও "নবযুগ" জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা তার পড়া ছিল। সেইসব কবিতার কিছু কিছু কথা উল্লেখ করেও সে হেডিং দিত। সে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়েনি। যেমন ইরাকের রাজা ফয়সলের কি একটা সংবাদকে উপলক্ষ ক'রে সে হেডিং দিয়েছিল :

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা ফয়সুল হে আমার।

দৈনিক "নবযুগে" নজরুল যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিল তার সবগুলি না হলেও অনেকগুলি, হয়তো বেশীর ভাগই, সংগ্রহ ক'রে "যুগবাণী" নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে ছাপা হয়েছে। পুস্তকাকারে ছাপানোর সময়ে সে হয়তো লেখায় কিছু কিছু পরিবর্তন করে থাকবে। এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে, খ্রীস্টীয় হিসাবে ১৯৫৪ সালে। কোথাও লেখা নেই যে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ কখন ছাপা হয়েছিল। তবে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত

হয়েছিল ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে। প্রকাশকদের দেওয়া একটি ছোট্ট ভূমিকার মতো তৃতীয় সংস্করণে আছে। তা থেকে খানিকটা নীচে তুলে দিলাম।

> "১৯২২ সাল আমাদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক সরকারের শোষণ ও অত্যাচারে দেশ তখন জর্জরিত, অন্যদিকে দেশবাসী অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এই অন্যায়, অবিচার, ভীরুতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। দৈনিক "নবযুগে"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে অনেক জ্বালাময়ী ও আবেগপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি লেখেন। তারই কতকগুলো নিয়ে এ পুস্তক প্রকাশিত হয়।"

এই ভূমিকা যাঁরাই পড়বেন তাঁরা ধরে নিবেন যে এই লেখাগুলি নজরুল্ ইসলাম ১৯২২ সালে দৈনিক "নবযুগে" লিখেছিলেন। অথচ ১৯২২ সালে দৈনিক "নবযুগে"র কোনো অস্তিত্ব ছিল না। নজরুলের লেখাগুলি সবই ১৯২০ সালের লেখা। ১৯২০ সালেই লেখাগুলি "নবযুগে" ছাপা হয়েছিল। যাঁরা বইখানা ছাপলেন তাঁদের এতটুকু জেনে নেওয়াও কি উচিত ছিল না?

আমরা যখন "নবযুগ" বা'র করি তখন ফজলুল হক সাহেব আমাদের কাগজের কোনো নীতির কথা বলেন নি। শুধু বলেছিলেন কৃষক ও শ্রমিকের কথাও তোমাদের লিখতে হবে। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব এম. এ. পাস করে তখন একটি সওদাগরি আফিসে ঘোরা-ফেরা করছিলেন। তাঁর ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজের চাকরী হয়েছিল আরও কিছু দিন পরে। তার সঙ্গে একদিন আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, বাঙলা কাগজগুলি বড় ভাব-প্রবণ হয়। আপনারা জনগণের সমস্যার দিকে মনোযোগ দিবেন। এসব রুশ বিপ্লবের পরোক্ষ প্রভাবের কথা বলেই আমার মনে হয়। ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে কাগজ বা'র করার কথা স্থির হওয়ার

পরে মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী সহ আমরা স্থির করেছিলেম যে আমাদের ইংল্যাণ্ডের মজুর শ্রেণীর কাগজ "ডেইলী হেরাল্ডে"র গ্রাহক হতে হবে। "ডেইলী হেরাল্ডে"র মারফতে ইউরোপের মজুর আন্দোলনের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। শেষ পর্যন্ত "ডেইলী হেরাল্ডে"র গ্রাহক আমরা হইনি। হাওয়াই ডাক তখন ছিলনা, জাহাজে কাগজ আসতে অনেক দিন লেগে যাবে, এই ভেবে আমরা নিরস্ত হয়েছিলেম।

আমরা নিজেরা লেখার যে ধারা গ্রহণ করেছিলেম সেটা অনেকটা ভাবপ্রবণ নিশ্চয়ই ছিল। দেশে যে আন্দোলন তখন চলেছিল ভাবপ্রবণতা দিয়েই আমরা সেটাকে তুলে ধরছিলেম। কোনো মত তখনও আমাদের মনের ভিতরে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। তবে আমরা মজুরদের কথা, কৃষকদের কথা লিখছিলেম। অভিজ্ঞতা হতেই সে-সব লিখতাম। আমার মনে হয় এই সব লেখা হতেই পড়াশুনা করে কিছু বোঝার বাসনা আমার মনে জেগেছিল। নজরুলের ভালো লেখাগুলি অন্তত পুস্তক হয়ে বা'র হয়ে গেছে। সকলে বুঝতে পারবেন কোন্ ধরনের লেখা নজরুল "নবযুগে" লিখত। কিন্তু আমার "নবযুগে"র লেখাগুলির অস্তিত্ব কোথাও নেই। খুব কম তো আমিও লিখিনি। সংরক্ষণের অভ্যাস না থাকাতেই আমার লেখাই লোপ পেয়ে গেছে। যে দিন সকালে কাগজের হাজার টাকার জামিন বাজয়াফ্‌ত্‌ হওয়ার খবর এলো আমরা ভেবেছিলেম সেই দিন বিকালে আমাদের কাগজ বা'র করতে দেওয়া হবে। অন্য কাগজকে তাই দেওয়া হতো। সেই জন্যে আমরা কপি তৈয়ার করেছিলেম, সব কিছু কম্পোজও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাগজ সেদিন আমাদের বা'র করতে দেওয়া হলোনা। আমি কোনো দিন ভাবপ্রবণ লেখা লিখতে পারিনে। সে দিন কিন্তু "দুর্যোগের পাড়ি" শিরোনাম দিয়ে আমি একটি ভাবপ্রবণ সম্পাদকীয় লিখে ফেলেছিলেম। কাগজ বা'র না হওয়ায়

আফজালুল হক সাহেব সেই লেখাটি নিয়ে গিয়ে তাঁর "মোসলেম ভারতে" ছেপে দিয়েছিলেন। "নবযুগের" জন্যে তৈয়ার করা আমার ওই একটি লেখাই এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যায়। লেখাটি আমার মেজাজের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায়না। তা এত ভাবপ্রবণ যে তার পুনর্মুদ্রণের কথা ভাবতেও আমার কেমন যেন বোধ হয়।

তখনকার দিনের প্রেস আইন অনুসারে এক হাজার টাকা কলকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে জমা রেখে আমরা যে কাগজ বা'র করেছিলেম সে কথা আমি আগে বলেছি।

"নবযুগের" গরম লেখার জন্যে পরে পরে দু'বার কিংবা তিন বার সরকার আমাদের সতর্ক করেছিল। শেষ সতর্ক করেছিল "মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধের জন্যে। প্রবন্ধটি নজরুল ইসলামের লেখা। আমার যতটা মনে পড়ে খিলাফৎ কমিটির একটি ইশ্তিহার ছাপানোকে উপলক্ষ করেই টাকাটা বাজয়াফ্ৎ করা হয়েছিল। এই ইশ্তিহারখানা কিন্তু আরও কাগজে ছাপা হয়েছিল, ছাপা হয়েছিল দৈনিক বসুমতীতেও। কিন্তু টাকাটা কেড়ে নেওয়া হলো "নবযুগের"। আমার মনে হয় নজরুলের "মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?" লেখাটিই ভারতের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে অসহ্য বোধ হয়েছিল।

১৯২০ সালে ভারতবর্ষে একটি আন্দোলন হয়েছিল যার নাম ছিল হিজরৎ আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে আঠারো হাজার কিংবা তারও বেশী মুসলমান ভারতবর্ষ ছেড়ে আফ্গানিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। হিজরৎ আরবী ভাষার কথা। তার মানে স্বেচ্ছা-নির্বাসন। যিনি এই নির্বাসন বরণ করেন তাঁকে বলা হয় "মুহাজির" অর্থাৎ নির্বাসিত। মুহাজিরিন কথাটা মুহাজির শব্দের বহুবচন। অত্যাচারের হাত হতে বাঁচার জন্যেই লোকে হিজরৎ বরণ করে। মক্কার লোকের অত্যাচার হতে বাঁচার জন্যেই মুহম্মদ

মক্কা হতে হিজরৎ করে য়াথ্‌রিব (মদীনা) গিয়েছিলেন। নজরুলের "নবযুগে" প্রকাশিত দু'টি লেখা আমি এখানে তুলে দেব।

(১) মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে ?

আমরা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যাই নাই হতভাগ্য হাবিবুল্লার হত্যা-বীভৎসতা। আজও মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন খবর আসিয়াছিল যে, সামরিক পুলিসের সঙ্গে একদল মুহাজিরিন গোলমাল করায় কাঁচাগাড়ী নামক স্থানে মুহাজিরিনদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। একদল ভারতীয় সৈন্য তিন তিনবার গুলিবর্ষণ করে, তাহাতে মাত্র একজন নিহত ও একজন আহত হয়। কোন্ মূর্খ বিশ্বাস করিবে একথা ?

আমরা বলি, একটি আঘাতের বদলেই তিন তিনবার গুলিবর্ষণ করা, এ কোন্ সভ্য দেশের রীতি ? তোমাদের ত সিপাহী সৈন্যের অভাব নেই—বিশেষ করিয়া সেই সীমান্ত দেশে। চল্লিশটি নিরস্ত্র লোককে, তাহারা যদি সত্যই অন্যায় করিয়া থাকে, সহজেই ত গেরেফ্‌তার করিয়া লইতে পারিতে। তাহা না করিয়া তোমরা চালাইয়াছিলে গুলি ! আর কাহাদের উপর ? যাহারা স্বদেশের, স্বজনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য তোমাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চলিয়াছিল।

কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই ? আমরা কি মানুষ নই ? তোমাদের একজনকে

মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন কর, আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠা কাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পাইব না? মনুষ্যত্বের, বিবেকের, আত্মসম্মানের স্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনও সহ্য করিতে পারে কি? এই যে সে দিন হতভাগারা হাজার বছরের পরিচিত, সারা জীবনের সুখ-দুঃখ-স্মৃতি বিজড়িত, বাপদাদার ভিটাবাড়ী, আত্মীয় পরিজন জননী জন্মভূমির মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, বড় দুঃখে বড় কষ্টে জীবনের সঙ্গে জড়ানো এই সব স্নেহ-স্মৃতির বন্ধন জোর করিয়া ছিঁড়িয়া এক মুক্ত স্বাধীন অজানার দিকে পাড়ি দিতেছিল, ইহাদের বেদনা বুঝিবার অন্তর তোমাদের আছে কি? মনুষ্যত্বের এই যে মস্তবড় একটা দিক, পরের বেদনকে আপন করে নেওয়া,—ইহা কি তোমাদের আছে? স্বাধীনতাকে, মনুষ্যত্বকে এমন নির্মমভাবে দুই পায়ে মাড়াইয়া চলিবে আর কত দিন? এই অত্যাচারের, এই মিথ্যার বনিয়াদে খাড়া তোমাদের ঘর—মনে কর কি, চির দিন খাড়া থাকিবে? এই সব অপকর্মের, এই সব অমার্জনীয় পাপের, এই সব নির্মম উৎপীড়নের জন্য বিবেকের যে দংশন তাহা হইতে তোমাদের রক্ষা করিবে কে? এই মহাশক্তির ভীষণতা আজো কি তোমার চক্ষে পড়ে নাই? তোমাদের অত্যাচারে, জুলুমে নিপীড়িত হইয়া, মানবাত্মার—মনুষ্যত্বের এত পাশবিক অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষের মত যাহারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারিল যে, এখানে আর ধর্মকর্ম চলিবে না, এবং চিরদিনের মত তোমাদের সংস্রব ছাড়িয়া তোমাকে সালাম করিয়া বিদায় লইল,—সেই বিদায়ের দিনেও তাহাদের উপর সামান্য পশুর মত ব্যবহার করিতে তোমার লজ্জা হইল না, দ্বিধা হইল না! সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া, ছল করিয়া গায়ে পড়িয়া তাহাদের সাথে গোলমাল বাধাইলে, হত্যা করিলে! আবার হত্যা করিলে

আমাদেরই ভারতীয় সৈন্যদ্বারা! যাহাকে হত্যা করিলে, তাহাকে হত্যা করিয়াও ছাড় নাই, তাহার লাশ তিন দিন ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়া পচাইয়া গলাইয়া ছাড়িয়াছ! মৃতের প্রতিও এত আক্রোশ, এত অসম্মান কেবল তোমাদের সভ্যজাতিই একা দেখাইতে পারিতেছে! তোমাদেরি কিচনার—লর্ড কিচনার মেহেদীর কবর হইতে অস্থি উত্তোলন করিয়া ঘোড়ার পায়ে বাঁধিয়া ঘোড়দৌড় করিয়াছে, তোমাদের এই সৈন্যদল যে তাহারই শিষ্য। না জানি আরো কত বাছাদের, আমাদের কত মা-বোনদের খুলি উড়াইয়াছ, তোমরাই জান। আমাদের যে ভাই আজ তোমাদের হাতে শহীদ হইল, সে এমন এক মুক্ত স্বাধীন দেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে তোমাদের গুলি পৌঁছিতে পারে না! সে যে মুক্তির সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল। মনে রাখিও, সে খোদার আরশের পায়া ধরিয়া ইহার দাদ (বিচার) মাগিতেছে। দাও, উত্তর দাও! বল তোমার কি বলিবার আছে!

এটা হলো নজরুল ইস্‌লামের এক ধরনের লেখা। অন্য ধরনের একটি লেখার নমুনাও এখানে দিলাম। এই "ধর্মঘট" শিরোনামের লেখাটি হতে সকলে বুঝতে পারবেন যে ১৯২০ সালেও মেহনতী জনগণের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ কতটা ছিল। সে কয়লা খনির দেশের লোক। তাই, লেখার সময়ে কয়লা খনির মজুরদের চেহারাই তার চোখের সামনে বেশী করে ভেসে উঠেছে। কোনো একটি ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে সে এ লেখাটা লেখেনি। ১৯২০ সালে দেশময় এখানে-ওখানে ধর্মঘট চলছিলই।

(২) ধর্ম্মঘট

দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'যে এলো চষে সে রইলো বসে, নাড়া-কাটাকে ভাত দাও একথালা কষে।' হুলের দংশন জ্বালা যথেষ্ট থাকলেও কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্বয়ং 'নাড়া-কাটা' প্রভুরাও এ কথাটা ভাল করিয়াই বুঝেন, কিন্তু বুঝিয়াও যে না বুঝিবার ভাণ করেন বা প্রতিকারের জন্য নিজেদের দরাজ দস্ত সামলান না, ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই আমাদের মনুষ্যত্বে বিবেকে আঘাত লাগে এবং তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা তুলিলেই হইল 'ধর্ম্মঘট'। চাষী সমস্ত বছর ধরিয়া হাড়-ভাঙা মেহনৎ করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পায় না, হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা টেনা বা নেঙট ছাড়া তাঁহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা জীবনেও ঘটিয়া উঠে না, ছেলে মেয়ের শাদ-আরমান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনেরা পায়ের উপর পা দিয়া বার মাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবী চালে দিন কাটাইয়া দেন! কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের বেশী বাঁচেনা; তাহারা দিবা রাত্রি খনির নীচে পাতালপুরীতে আলো বাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায় কেরোসিনের ধুয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া ফেলে। কোম্পানী তো তাহাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছেন, কিন্তু এ-হতভাগাদের স্বাস্থ্য আহার প্রভৃতির দিকে ভুলিয়াও চাইবেন না। এই কুলিদিগের চেহারার দিকে তাকাইয়া কেহ কখনো চিনিতে পারিবেন না যে, ইহারা মানুষ কি প্রেতলোক-ফেরৎা বীভৎস নর-কঙ্কাল। দোষ কাহাদের? কর্তাদের মতে

দোষ অবশ্য এই হতভাগাদেরই। কারণ পেট বড় মুদ্দই এবং পেটের জন্যই ইহারা এমন করিয়া আত্মহত্যা করে।

আমরা মাত্র এই দুই একটি নজির দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। দেশের সমস্ত কল-কারখানায়, আড়তে গুদামে 'ভাবিয়া চিন্তিয়া মানুষ হত্যার' এইরূপ শত শত বীভৎস নগ্নতা দেখিতে পাইবেন। আমাদের ক্ষমতা নাই যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলি। যাঁহারা এইসব কল-কারখানায় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এতটুকুও সংশ্লিষ্ট আছেন, বা একদিনের জন্যও ওদিক মাড়াইয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের এই বর্ণনার চেয়ে এর সত্যতা কতগুণ বেশী বুঝিতে পারিবেন। আজকাল বিশ্বমানবের মধ্যে larger humanity বলিয়া একটা মহত্তর মানবতার স্বর্গীয় ভাব জাগিয়াছে, এই কল-কারখানার অধিকাংশ কর্তা বা কর্তৃপক্ষেরই সে দিকটা যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের চোখের সামনে রাত্রিদিন মনুষ্যত্ব বিবর্জিত কত অমানুষিক পাশবতা তাঁহাদেরই এইসব কারখানায় আড়তে অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা নির্বাক নিশ্চল। নিজেরা 'মজা-সে' আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে থাকিয়া কুলি-মজুরের আবেদন নিবেদনকে বুটের ঠোক্কর লাগাইতেছেন! সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্ম-সম্মানের স্থূল সংস্করণরূপে নিদ্রিত থাকে, যেটা খোঁচা খাইয়া খাইয়া জর্জরিত না হইলে মরণ-কামড় কামড়াইতে আসে না। কিন্তু ইহাতে এই মনুষ্যত্ব-বিহীন ভোগ-বিলাসী কর্তার দল ভয়ানক রুষ্ট হইয়া উঠেন, তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন না যে, এ অভাগাদের বেদনার বোঝা নেহাৎ অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এ-বিদ্রোহের মাথা-ঝাঁকানি। উন্নত আমেরিকা-ইউরোপেই ইহার প্রথম প্রচলন। সেখানে এখন লোকমতের উপরই শাসন প্রতিষ্ঠিত, এই গণতন্ত্র বা ডিমোক্রাসিই সেদেশে সর্বেসর্বা; তাই শ্রমজীবী দলেরও

ক্ষমতা সেখানে অসীম। তাহারা যে রকম মজুরী পায়, তাহাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা আহার বিহার প্রভৃতির যে রকম সুখ সুবিধা, তাহার তুলনায় আমাদের দেশের শ্রমজীবীগণের অবস্থা কসাইখানার পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তাই এতদিন নির্বিচারে মৌন থাকিয়া মাথা পাতিয়া সমস্ত অত্যাচার অবিচার সহিয়া সহিয়া শেষে যখন রক্তমাংসের শরীরে তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহারাও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। এই ব্যুরোক্রাসি বা আমলা-তন্ত্র-শাসিত দেশেও তাহারা যখন তাহাদের দুঃখ-কষ্ট-জর্জরিত ছিন্নভিন্ন অন্তরে এমন বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলিল, তখন যাঁহার অন্তঃকরণ বা sentiment বলিয়া জিনিস আছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ইহাদের দুঃখ কষ্ট, অভাব অভিযোগ কত বেশী অসহনীয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এই ধর্মঘটের আগুন এখন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়, কেন না ভারতেও এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগ্যদের জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে, এদেশেও মহত্তর মানবতার অনুভব সকলেই করিতেছেন। সুতরাং শ্রমজীবীদলেও সেই সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডিমক্রাসির জাগরণও এদেশে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। কেহই উহাকে রুখিতে পারিবে না। পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমেই ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং এ ধর্মঘট ক্লিষ্ট মুমূর্ষু জাতের শেষ কামড়, ইহা বিদ্রোহ নয়।

"যুগবাণী" নামক পুস্তকে নজরুল ইস্‌লামের লেখা "নবযুগের" অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তা থেকে দু'টি লেখা নমুনা হিসাবে আমি ওপরে তুলে দিয়েছি। এই লেখা দু'টি "যুগবাণী"র তৃতীয় সংস্করণ হতে নেওয়া হয়েছে।

দরাজদস্ত—বিপুল হস্ত। শাদ-আরমান—সাধ ইচ্ছা। মুদ্দই—শত্রু।

"নবযুগ" বা'র হওয়ার পর হতে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সব-সময়ের কর্মী আর থাকলাম না। তার মানে এই নয় যে সাহিত্য সমিতির সহিত আমার সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার কর্মকর্তাদের একজন আমি তখনও থাকতাম। শুধু নজরুল ইস্‌লাম আর আমি স্থির করলাম যে সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে আমাদের আর থাকা উচিত নয়। তবে, এটাও আমরা সেই সঙ্গে স্থির করলাম যে সাহিত্য সমিতির বাড়ীই, অর্থাৎ ৩২, কলেজ স্ট্রীট হবে আমাদের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করার বা আড্ডা দেওয়ার জায়গা। নজরুল ইস্‌লাম কলকাতায় আসার আগে হতেই সাহিত্য সমিতি একটি সাহিত্যিক আড্ডা ছিল। মুস্‌লিম সাহিত্যিকরা তো বেশীর ভাগ আসতেনই। হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকরাও কেউ কেউ আসতেন। এই সূত্রে কবি শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন ও শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিতবাদীর সম্পাদক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও মাঝে মাঝে এসেছেন। কবি শশাঙ্কমোহনের সঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের আবার খুব ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল। এখানে আমি কাজী আবদুল ওদুদের সম্বন্ধে আমার একটি ভুলের সংশোধন করে দিতে চাই। আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" বা'র হওয়ার পরে তিনি এই ভুলের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদের বিষয়ে ভুলের সংশোধন

তেমন বড় ভুল অবশ্য নয়। আমি লিখেছিলেন "মুস্‌লিম লেখকদের মধ্যে এ-আড্ডায় [অর্থাৎ সাহিত্য সমিতির আড্ডায়] আসতেন না এমন লোক কম ছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি তো প্রতিদিনই আসতেন' (পৃষ্ঠা ১৮) ১৯১৩ সাল হতে কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি যে ১৯১৯ সালে এম. এ. পাশ করেছিলেন একথাও আমার জানা ছিল। তবুও ১৯২০ সালে (নজরুল ১৯২০ সালেই এসেছিল)

তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলাটা আমার ভুল হয়েছে। তিনি আমায় আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে নজরুল যখন ১৯২০ সালে সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে থাকতে এসেছিল তার আগে হতেই তো তিনি ওই বাড়ীতে আফজালুল হক সাহেবের ঘরে বাস করছিলেন। কাজেই নজরুল আসার পরে তাঁর (কাজী আবদুল ওদুদের) ওই বাড়ীতে প্রতি দিন আসার কথা কি ক'রে উঠতে পারে?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলে রাখছি। ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির আফিসে শুধু যে সাহিত্যিকরা আসতেন তা নয়, রাজনীতি যাঁদের পেশা ছিল তাঁরাও আসতেন।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জয়ন্তী হয়েছিল ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল তারিখে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে, তাতে সভাপতি ছিল কাজী নজরুল ইস্‌লাম। এখানে যে-ভাষণ সে দিয়েছিল সেটাই নাকি তার জীবনের শেষ ভাষণ। আমি এই উৎসবে যোগ দিইনি। ভারতের ব্রিটিশ সরকারের গিরেফ্‌তার এড়াবার জন্যে আমায় তখন আত্ম-গোপন করে থাকতে হয়েছিল। ফৌজ হতে ফিরে আসার পরে সাহিত্য-সমিতিতেই যে নজরুল আশ্রয় পেয়েছিল একথা সে তার ভাষণে বলেছে। একথাও সে বলেছে যে "সে দিন যদি সাহিত্য-সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত, তবে হয়ত কোথায় ভেসে যেতাম, তা আমি জানি না। এই ভালবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম; এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হ'ত কিনা, আমার জানা নেই।" এসেই যাঁদের কবি বন্ধুরূপে পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে 'মিস্টার আবুল কালাম শামসুদ্দীনের' নামের উল্লেখ আছে। এখানে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া সত্ত্বেও আমায় বলতে হচ্ছে যে তিনি তখনও সমিতির সামনের পংক্তিতে ছিলেন না। যতোটা মনে আছে শামসুদ্দীন সাহেব তখন ছাত্র ছিলেন

আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও নজরুল ইস্‌লাম

এবং কারমাইকেল হোস্টেলে থাকতেন। সমিতির সম্পাদক মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব ওই হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তাঁরই মারফতে সম্ভবত শামসুদ্দীন সাহেবের লেখা "চীনে ইস্‌লাম" (রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের ১৯১২ সালের আগস্ট মাসের "ঢাকা রিভিউ"তে মুদ্রিত Islam in China-র বঙ্গানুবাদ।) ১৩২৬ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। খ্রীস্টীয় হিসাবে ১৯১৯ সালের এপ্রিল ও জুন মাস। সাহিত্য সমিতির সভ্যও শামসুদ্দীন সাহেব ছিলেন। তবে, সে দিন যাঁরা নজরুলকে আগ বাড়িয়ে সাহিত্য সমিতিতে নিয়েছিলেন তাঁদের একজন তিনি ছিলেন না। তাঁকে নজরুল বন্ধুরূপে পেয়েছিল আরও পরে। ২১ বছর পরে ভাষণ দিতে গিয়ে সে যে ঘটনার বিবৃতিতে সামান্য ভুল করেছিল তা এমন কিছুই নয়। এর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ভবিষ্যতে অনেকে অনেক ভুল করতে পারেন সেই জন্যেই এখানে কথাটি বলে রাখলাম।

নজরুল ইস্‌লাম আসার পর হতে অনেক বেশী সংখ্যায় কবি ও সাহিত্যিকদের আনাগোনার ফলে সাহিত্য সমিতির আফিস আগেকার চেয়ে অনেক বেশী জমজমাট হয়ে উঠেছিল। যাঁরা আগে কখনও আসতেন না তাঁরাও তখন আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। যাঁদের নাম আমার মনে আছে তাঁদের কয়েকটি নামের উল্লেখ আমি এখানে করছি। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থি, কবি শ্রীকান্তি ঘোষ, শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও

নজরুলের আগমনে সাহিত্য সমিতিতে নূতন সাহিত্যিক আড্ডা

অনেককে আমি আসতে দেখছি। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে তো আসতেই হবে, তখনকার দিনে নজরুলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। পরিচয় হওয়ার পর হতে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারও এখানে আসতেন। কবি গোলাম মুস্তফা তো আগে হতেই আসতেন। তবে, নজরুল ইস্‌লাম আসার

পর হতে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর আসা কমিয়ে দিয়েছিলেন। হয় তো নজরুলের আসায় যে নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে তিনি খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। কিংবা তিনি গবর্নমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, আর ৩২, কলেজ স্ট্রীট রাজনীতি পেশাওয়ালা লোকদেরও আড্ডা হয়ে উঠেছিল,—হতে পারে এই জন্যেও তাঁর আসা তিনি কমিয়ে দিয়েছিলেন।

কথায় কথায় আসল কথা হতে অনেক দূরে আমি সরে এসেছি। নজরুল ইস্‌লাম আর আমি ৩২, কলেজ স্ট্রীট ছেড়ে দিয়ে প্রথমে মার্ক্‌ইস লেনের একটি বাড়ীতে উঠেছিলেম। এখানে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। জামিন বাজেয়াফ্‌ৎ হওয়ায় "নবযুগ" তখন সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। আমরা তাই কয়েকদিন "নবযুগ" আফিসেও (৬, টার্নার স্ট্রীটে) ছিলেম। তারপরে আমরা যে-বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছিলেম তার কিছু বর্ণনা এখানে না দিলেই নয়। বাড়ীটির নম্বর ছিল ৮/এ, টার্নার স্ট্রীট, "নবযুগ" আফিস হতে মাত্র এক-দু' মিনিটের পথ দূরে। টার্নার স্ট্রীটের এখন নাম নওয়াব আবদুর রহমান স্ট্রীট। অন্ধকার বাই লেনের ভিতরে একটি খোলার বস্তীর মধ্যেখানে ছিল ৮/এ নম্বরের ছোট্ট একতলা পাকা বাড়ীটি। তখনকার দিনে ভাড়া ছিল মাসিক দশ টাকার কিছু কম। বাড়ীটিতে জলের কল, পায়খানা, রান্নাঘর ইত্যাদি সবই ছিল। খানিকটা উঠোনও ছিল বাড়ীতে। বস্তীটি ছিল মুসলমানদের। বয়স্কা মহিলাদের সঙ্গে নজরুল তো খালা (মাসী) পাতিয়ে নিল। যাঁর গায়ের রং ফরসা ছিল তাঁকে সে রাঙা খালা ডাকত। এই খালারা মাঝে মাঝে আমাদের খাওয়ার সময়ে তাঁদের রান্নাকরা তরকারিও আমাদের দিয়ে যেতেন।

৮/এ টার্নার স্ট্রীটে—বহু সাহিত্যিকের আগমনে ধন্য, নজরুলের বিখ্যাত কবিতা-সমূহের রচনাস্থল হিসাবেও ধন্য।

আমাদের এই বস্তীর বাড়ীটি অনেক সাহিত্যিকের আগমনেও ধন্য হয়েছিল। কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার নেবুতলায় স্থিত ক্যালকাটা

হাইস্কুলের হেড্‌মাস্টার ছিলেন। তাঁর স্কুল ছুটীর পরে প্রায়ই তিনি এই বাড়ীতেও আসতেন। ৩২, কলেজ স্ট্রীটেও যে তিনি যেতেন তার উল্লেখ আগে করেছি। তাঁর সঙ্গে অনেক সময়ে, মাঝে মাঝে একলাও, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আসতেন। তিনি মাসিক কাগজে কবিতা লিখতেন। গবর্নমেণ্ট কলেজের একজন ব্রাহ্ম অধ্যাপকও মোহিত বাবুর সঙ্গে দু'-তিনবার এসেছেন। তবে তেমন কোনো আলোচনা কোনো দিন তিনি করেন নি। তার অনেক বৎসর পরে অন্য সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার আবারও পরিচয় হয়। তখন তাঁর নিকটে নজরুলের কথা তুলতেই তিনি বলে ফেললেন যে তিনি তাকে কখনও চিনতেন না। নজরুলের হিন্দু মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ব্রাহ্মরা কখনও মেনে নিতে পারে নি। মোহিতবাবু তাঁর দু'জন ছাত্রের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তারা শুধু নজরুলের নয়, আমারও স্নেহভাজন হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে শ্রীশান্তিপদ সিংহ পরে "ধূমকেতু"র ম্যানেজার হয়েছিল। আরও পরে নজরুল, ৮/১ পানবাগান লেনে শান্তির সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকত। শান্তি এখনও বেঁচে আছে, ভালো চাকরী করে। অপর ছাত্রের নাম ছিল নির্মল সেন। ভারত গবর্নমেণ্টের সার্ভে বিভাগে গেজেটেড্‌ অফিসার ছিল। শুনেছি সে আর বেঁচে নেই। শাঁখারীটোলার পোস্ট মাস্টার হত্যার মোকদ্দমার সংস্রবে নির্মলের নাম সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। নির্মলরা তখন যতু শ্রীমানি লেনে থাকত, খুব সরু একটি গলি। পোস্ট মাস্টার হত্যার পরে বরেন ঘোষ যখন ওই গলির ভিতর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, আর লোকেরা তাঁকে ধরার জন্য পেছন হতে তাড়া ক'রে আসছিলেন তখন নির্মল বরেন ঘোষের পায়ের ভিতরে পা ঢুকিয়ে দেয়। তাতে বরেন ঘোষ পড়ে যান। কিন্তু ওখানেই তিনি ধরা পড়েন নি, আরও কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পরে ধরা পড়েছিলেন। তবে, নির্মল তাঁকে ফেলে না দিলে নাকি

মোহিতলালের দুই ছাত্র — শ্রীশান্তিপদ সিংহ ও নির্মল সেন।

ধরা পড়তেন না। নির্মল কিন্তু সত্যই ভেবেছিল যে একজন চোরকে তাড়া করা হচ্ছে। শুনেছি, বরেন ঘোষ প্রকৃত হত্যাকারীও ছিলেন না।

৮/এ টার্নার স্ট্রীটেই নজরুল তার বহু বিখ্যাত কবিতা রচনা করেছে। এই সকল কবিতা সে লিখেছে দৈনিক "নবযুগে" কাজ করার সময়ে। আমরা দেখেছি কাজের চাপের ভিতর দিয়েই নজরুল তার শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ রচনা করতে পেরেছে। বাড়ীটিও এমন ছিল যার চারদিকে দারিদ্র্যের আব-হাওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই সবই নজরুলকে তার কবিতার প্রেরণা জুগিয়েছে। কম লোক নিয়ে দৈনিক কাগজের জন্যে লিখে কেউ যে কবিতা সৃষ্টি করতে পারেন তা ভাবতেও পারা যায় না। তার ওপরে রাত্রে কোনো কোনো দিন নজরুলকে সাহিত্যিক আড্ডায় যেতে হয়েছে।

"ওঠ কবি সৈনিক,
নবযুগ দৈনিক"

বলতে বলতে তাকে এই সকল আড্ডা হতে উঠেও আসতে হয়েছে। গানের মজলিসেও মাঝে মাঝে তাকে তখন যেতে হয়েছে। এইসব কিছু সত্ত্বেও নজরুলের কবিতা সৃষ্টি বন্ধ হয়নি। সত্য কথা বলতে গেলে তার শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ এই সময়ে, এই বাড়ীতে রচিত হয়েছে। ময়মনসিংহ জিলার এক মুসলমান ভদ্রলোক বাড়ী বেচা-কেনার ও লোন্ (ঋণ) সংগ্রহের দালালী করতেন। ৮/এ, টার্নার স্ট্রীট তাঁর লীজ নেওয়া বাড়ী ছিল। আমরা তাঁর নিকট হতে বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছিলেম। তিন-চার বছর আগে আমার ইচ্ছা হয় যে ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটের বাড়ীর একটি ফটো তুলে রাখব। অনুমতি নেওয়ার জন্যে আবদুল হালীম আর আমি বাড়ীর আসল মালিককে খুঁজতে খুঁজতে তালতলা বাজার স্ট্রীটে যাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম তিনি ছিলেন সীলেটের মুরারি চাঁদ কলেজের অবসর প্রাপ্ত প্রিন্সিপাল আবু সঈদ সাহেব। তিনি শুনে তো অবাক

যে নজরুল এক সময়ে ওই বাড়ীতে ছিলেন। বারে বারে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা ভুলও করিনি তো? খানিকটা রাস্তার দিকে এগিয়ে এসে যে দোতালা বাড়ীটি আছে নজরুল ইস্‌লাম হয়তো সেই বাড়ীতেই ছিল, তিনি বললেন। আমি যখন তাঁকে জানালাম যে নজরুলের সঙ্গে আমিও ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটে ছিলেম তখন তাঁকে কথাটা বিশ্বাস করতেই হলো। তিনি সর্বান্তঃকরণে ফটো তোলার অনুমতি দিয়েছিলেন। শুনেছি আবু সঈদ সাহেব আর বেঁচে নেই।

"নবযুগে" কাজ করার সময়ের আর একটি গল্প বলি। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত খেতাবধারীরা (যেমন রায় সাহেব, খান সাহেব, রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর ইত্যাদি) এবং আইন সভার সভ্যরা লাইসেন্স ছাড়াও অস্ত্র কিনতে ও রাখতে পারতেন। আমার ঠিক মনে নেই, সম্ভবত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরাও ওই ভাবে অস্ত্র রাখার অধিকারী ছিলেন। এ. কে. ফজলুল হক সাহেব আইন সভার সভ্য ছিলেন। সেই অধিকারে তিনিও একটি রিভলবার কিনেছিলেন, কিন্তু সেটি রাখার যে-ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন তা অত্যন্ত চমৎকার। বাড়ীর নীচের তলায় একটি স্টীল ট্রাঙ্কে তিনি তাঁর অস্ত্রটি রেখেছিলেন। এই ট্রাঙ্কের তালা কখনও বন্ধ করা হতোনা। ১৯১৯ সালের ভারতীয় শাসন সংস্কার আইন চালু হওয়ার পরে গবর্নমেণ্ট একটি হুকুম এই ব'লে জারী করেন যে যাঁদের নিকটে লাইসেন্স ছাড়া অস্ত্র আছে তাঁদের লাইসেন্স করিয়ে নিতে হবে। এই সময়ে

ফজলুল হক সাহেবের রিভলবার চুরি

ফজলুল হক সাহেবের মনে পড়ল যে তাঁরও একটি রিভলবার আছে, লাইসেন্স করিয়ে নেওয়া দরকার। তালা বন্ধ না-করা ট্রাঙ্কটির ডালা তুলে তিনি অস্ত্রটি পেলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুলিসে খবর দিলেন। তার পরে শুরু হলো সাদা পোশাকওয়ালাদের আনাগোনা। নজরুলকে আর আমাকে দু'চার কথা তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু সেটা তেমন কিছুই নয়। তবুও ওই বাড়ীতে তাঁদের আসা-যাওয়া কিছুতেই বন্ধ

হলো না। খোলাখুলিভাবে না বললেও তাঁদের মনে সন্দেহ হয়েছিল যে নজরুল ইস্‌লাম আর আমি অস্ত্রটি সরিয়েছি। নজরুলের ওপরেই তাঁদের সন্দেহ হয়েছিল বেশী। কারণ, পুলিসের ধারণা জন্মেছিল যে আর্মি ফেরৎ ওই রকম একটি জওয়ান ছেলে অস্ত্রটি চুরি না করেই পারেনা। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহম্মদ ইউসুফ ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করার অছিলায় এসে বসেই থাকতেন। এই ভাবে অনেক দিন ঘোরাঘুরি করার পরে সাদা পোশাকওয়ালারা আসা বন্ধ করে দিল। বলা বাহুল্য, ফজলুল হক সাহেবের বাড়ীর নীচের তলায় "নবযুগে"র আফিস ছিল। প্রেস ছিল অন্য বাড়ীতে।

ফজলুল হক সাহেবের একটি ছোকরা চাকর ছিল। সে বয়ঃ-সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছিল। সেই সময়ে যৌবনাগমনের কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বাসনা তার মনে জাগা অস্বাভাবিক ছিল না। তারজন্যে টাকা চাই। ফজলুল হক সাহেবের দুই ভাগিনেয় ওয়াজির আলি সাহেব ও ইউসফ আলি সাহেব সহ আমাদের মনে সন্দেহ হয়েছিল যে ছোকরা চাকরটিই রিভলবার সরিয়েছিল। টার্নার স্ট্রীটে অনেক এংলো ইণ্ডিয়ানের বাস ছিল। তাঁদের ভিতরে কিছু লোক চোরাই অস্ত্রের ব্যবসায় করত। কাজেই, সেই ছোকরা চাকরের পক্ষে অস্ত্র বিক্রয়ে কোনো অসুবিধা ঘটেনি। এক বা একাধিক এংলো ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েও সে এই কাজ করতে পারে। কিন্তু পুলিস ওই দিকটাই ঘেঁষল না। সাধারণ ক্রিমিনলদের পেছনে ছোটাছুটি করলে পলিটিকাল পুলিসের ইজ্জৎ থাকবে কেন? সেই কাজের জন্যে তো আলাদা পুলিস আছে। তা ছাড়া, সন্দেহ তো বিশেষভাবে নজরুলের ওপরেই হয়েছিল।

আগেই বলেছি, ফজলুল হক সাহেবের মনে একটা সন্দেহ জন্মেছিল যে আমরা মুসলমানের ছেলেরা হয় তো ভালো বাঙলা লিখতে পারব না, অথচ জবরদস্তী আমরাই আবার ঠিক করলাম যে

কাগজখানা হিন্দু-মুসলমান দু'জনারই হবে। কিন্তু কাগজ বা'র হওয়ার কয়েকদিনের ভিতরেই তাঁর হিন্দু বন্ধুরা কাগজের লেখার জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। কলকাতা হাইকোর্টের একজন ইংরেজ জজ (নাম যদি ভুলে না গিয়ে থাকি মিস্টার জস্টিস্ টিউনান) বাঙলা জানতেন এবং বাঙলা খবরের কাগজ পড়তেন। তিনি একদিন চেম্বারে ডেকে নিয়ে ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে "নবযুগের" লেখা নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, বড় বেশী গরম লিখছ তুমি। ফজলুল হক সাহেব সত্যই খুশী হলেন। আমাদের সে কথা তিনি জানালেনও। এটা 'নবযুগের' জামিন বাজেয়াফ্‌ৎ হওয়ার আগেকার কথা। অমনি তো আমাদের ওপরে তিনি খুশী ছিলেনই। কারণ, আমাদের ভিতরে চাকরী করার মতো ভাব একেবারেই ছিল না। আমরা কাজ ক'রে যাচ্ছিলেম নিজেদের রাজনীতিক কর্তব্য হিসাবে। কার কাগজ, কে মালিক এসব কথা আমাদের মনেই উঠত না। এমন কি বেতনের জন্যেও আমাদের দিক হতে তেমন পীড়াপীড়ি ছিল না।

আমাদের লেখার যোগ্যতা সম্বন্ধে ফজলুল হক সাহেবের সন্দেহ ঘুচল।

তখনকার আইন অনুসারে এক হাজার টাকার জামিন বাজেয়াফ্‌ৎ হলে আবার দু' হাজার টাকা চীফ্‌ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জমা দিয়ে কাগজ বা'র করতে হতো। ইতোমধ্যে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন এসে গিয়েছিল। ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অধিবেশন চলে। আমেরিকা হতে লালা লাজপৎ রায় অল্পদিন আগে ফিরে এসেছিলেন। তিনিই সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। নজরুল ইস্‌লাম আর আমি 'নবযুগের' প্রতিনিধিরূপে এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেম যদিও "নবযুগ" তখনও বন্ধ ছিল। কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু লিখব না, লিখলে আমার এই "স্মৃতিকথা" বড় বেশী দীর্ঘ হয়ে যাবে।

জামিনের দু'হাজার টাকা জমা দিতে ফজলুল হক সাহেব খুবই গড়িমসি করছিলেন। হয় তো কাগজ আর চালানো উচিত কিনা এই বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু টাকা জমা দেওয়ার জন্যে তাঁর বন্ধুরা এত বেশী পীড়াপীড়ি করছিলেন যে তিনি মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলেন না। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস যে তাঁর নিকটে আর টাকাও ছিল না। এই ধারণা আমার মনে জন্মানোর কারণ ছিল এই যে শেষ পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত টব্যাকো মার্চেন্ট আবদুর রহীম বখ্‌শ্‌ ইলাহীর নামে একখানা চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। সেই চিঠি নিয়ে গিয়ে আমি দু' হাজার টাকার একখানা বেয়ারার চেক পেলাম এবং টাটা ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ব্যাঙ্ক হতে (পরে সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে একীভূত হয়েছে) চেকখানা ভাঙিয়ে সেই দিনই জামিনের দু' হাজার টাকা কলকাতার চীফ্‌ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে জমা দিলাম। এবারে ডিক্লারেশন নিলাম আমার নামে। 'নবযুগ' আবার বা'র হতে লাগল।

দুই হাজার টাকা জমা দিয়ে 'নবযুগ' আবার বার হলো

এর মধ্যে দুর্গাপূজার ছুটি এসে গেল। কেউ কেউ কয়েক দিন ছুটির জন্যে ধরলেন। ফজলুল হক সাহেব বললেন, 'দিয়ে দাও ছুটি।' আমি বললাম, 'দৈনিক কাগজের এত বেশী ছুটি দেওয়া কি ভালো?' তবুও তিনি জিদ ধরে বললেন, 'ছুটি দিয়েই দাও।' তারপরে তিনি বরিশাল চলে গেলেন।

ফজলুল হক সাহেবের দুই ভাগিনেয়, ওয়াজির আলী সাহেব ও ইউসফ আলী সাহেবের নাম আমি আগেই উল্লেখ করেছি। ওয়াজির আলী সাহেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী ক'রে অবসর গ্রহণ করেছেন। কিছু দিন ওয়াক্‌ফ্‌ কমিশনারও তিনি হয়েছিলেন। ইউসফ আলী সাহেব কলকাতার রেজিস্ট্রার অফ্‌ এসিউরেন্স হয়েছিলেন। তিনিও অবসর গ্রহণ করেছেন। আমরা যখন

"নবযুগ" চালাচ্ছিলাম তখন তাঁদের দু'জনার একজনও চাকরী নেননি। দু'জনের সঙ্গেই নজরুল ও আমার হৃদ্যতা জন্মেছিল। ইউসফ আলী সাহেবের স্ত্রী মুতাহ্‌হিরা বানু কিছু কিছু কাব্য চর্চা করতেন। মাসিক পত্রে তাঁর কবিতা ছাপা হতো। মনে আছে, শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তা তাঁর একটি কবিতাতে অন্তত গানের সুর দিয়ে তার স্বরলিপি ছেপেছিলেন। সন্তানদের আগমনের পরে বোধ হয় মুতাহ্‌হিরা বানু তাঁর কাব্য চর্চা ছেড়ে দিয়েছেন। যাক সে কথা। ইউসফ আলী সাহেব তখন বরিশালে থাকতেন। তিনি বারে বারে বলে পাঠিয়েছিলেন যে দুর্গাপূজার ছুটিতে নজরুল যেন অবশ্যই বরিশালে তাঁদের বাড়ীতে যায়, আর বিশেষ বাধা না থাকলে আমিও যেন যাই। বাধা মানে 'নবযুগে'র বাধা। 'নবযুগে'র যখন ছুটিই হলো তখন আমিও নজরুলের সঙ্গে বরিশাল গেলাম। ফজলুল হক সাহেব বাড়ীতেই ছিলেন। আমাদের পেয়ে খুব খুশী হলেন। বরিশালে দু'দিন আমাদের বেশ আনন্দে কেটেছিল। আমরা বরিশালে থাকতে থাকতেই বর্ধমানের আবুল কাসেম সাহেব বরিশালে পৌঁছুলেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসের শুরুর দিকে তিনি খিলাফৎ ডেপুটেশনের সভ্য হিসাবে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। ফজলুল হক সাহেব বরিশাল যাওয়ার পরেই তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। সেখান থেকে তিনি চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন এবং চট্টগ্রাম থেকে গেলেন বরিশালে।

আবুল কাসেম সাহেবের কিছু পরিচয় দিচ্ছি এখানে। তিনি বর্ধমানের একটি বড় চাকরীওয়ালা পরিবারের লোক। তাঁর বাবা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, কাকা ছিলেন নওয়াব আবদুল জব্বার সি. আই. ই., এক সময়ে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। কাসেম সাহেব যে সময়ে বি. এ. পাশ করেছিলেন সেই সময়ে এই পরিবারের লোক হিসাবে তিনি ইচ্ছা করলেই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট অন্তত হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি হন নি।

ন্যাশনালিস্টরূপে দৈনিক "বেঙ্গলী"তে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি সহকারী ছিলেন। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে ক'জন মুসলমান দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এই কারণে যে তাঁরা চার বছর একসঙ্গে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিলেন। এহেন কাসেম সাহেব যে উল্টা সুর গাওয়া শুরু করেছেন তা আমরা টের পেলাম বরিশালে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়ার পরক্ষণেই। কলকাতায় ফেরার পরে আমরা দেখতে পেলাম যে আবুল কাসেম সাহেব ঠিক জোঁকের মতো ফজলুল হক সাহেবকে কামড়ে ধরেছেন। আমরা বুঝলাম যে তাঁর আর মুক্তি নেই।

ফজলুল হক সাহেব আবুল কাসেম সাহেবের প্রভাবে পড়লেন

মিস্টার এ. কে. ফজলুল হক সাহেব একজন বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু অদ্ভুত অব্যবস্থিত চিত্তের লোকও ছিলেন তিনি। আমার মনে আছে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত একদিন আমায় কথায় কথায় বলেছিলেন যে ফজলুল হক সাহেবের মতো একজন প্রতিভাবান লোক যদি অব্যবস্থিত চিত্তের না হতেন তবে তিনি ভারতবর্ষে সব কিছু হতে পারতেন। মোটের ওপরে আবুল কাসেম সাহেব তাঁর কামড় ছাড়লেন না। তাতে তাঁর নিশ্চয় সুবিধা হয়েছিল, কিন্তু সব দিক থেকে অপরিশোধনীয় ক্ষতি হলো ফজলুল হক সাহেবের। তিনি ডুবলেন।

আগেই বলেছি যে ফজলুল হক সেলবর্সীও আমাদের সঙ্গে "নবযুগে" কাজ করতেন। কিন্তু কাজে তাঁর মন ছিল না। এসেই দু'চারটি নিউজ তর্জমা করে দিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি চলে যেতেন। কোনো কোনো সময়ে আমার অগোচরে এমন লেখাও কাগজে ঢুকিয়ে দিতে চাইতেন যে-লেখা বা'র হলে কাগজের জামিনের টাকা আবারও নিশ্চিত বাজেয়াফ্‌ৎ হয়ে যেতো। বাধ্য হয়ে আমায় তাঁর সব লেখা পড়ে দিতে হতো। কলেজ স্কোয়ারে মাঝে মাঝে তিনি

বক্তৃতা দিতেন। তার পরে কাউকে কিছু না বলেই এক দিন তিনি উধাও হয়ে গেলেন। কোথায় তিনি গেলেন, কেনই বা গেলেন তার কিছুই আমরা জানলাম না। তারপরে একদিন আমরা খবর পেলাম ফজলুল হক সেলবর্সী হিজরৎ করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমানা পার হয়ে গেছেন। তিনি নাকি মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পরিচয় পত্র নিয়ে সীমানার বাইরে স্বাধীন জাতির ইলাকায় পৌঁছেও গিয়েছিলেন। তার পরে আবার কেন তিনি ভারতে ফিরে আসছিলেন তা আমরা জানিনে। অন্তত তাঁর ফেরার কারণ তিনি পরে কোনো দিন আমাদের জানান নি। হতে পারে সীমান্তের স্বাধীন ইলাকার কঠোর জীবন তাঁর নিকটে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। মোটের ওপরে, পেশাওয়ারের কাছাকাছি কোনও এক জায়গায় ভারতের ব্রিটিশ পুলিস তাঁকে গিরেফ্‌তার করে সীলেটে নিয়ে যায়। সুনামগঞ্জে কিংবা মৌলবী বাজারে আমার ঠিক মনে নেই, তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের (সিডিশনের) মোকদ্দমা হয়। তাতে তাঁর এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হলো। জেল হতে মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী"তে কাজ করতেন। আমি নিজে জেলে চলে গিয়েছিলেম।

ফজলুল হক সেলবর্সীর কাজে ঢিলেমি।

১৯২৬ সালে কলকাতায় ফিরে এসে সেলবর্সীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকে নি, মাঝে মাঝে দেখা অবশ্য হয়েছে। এর ভিতরে তিনি অনেক কিছু করেছেন। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা যখন চলছিল তখন হঠাৎ একদিন তাঁকে কোর্টে উপস্থিত দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। খবর নিয়ে জানতে পেলাম তিনি আমার বিরুদ্ধে ভারত গবর্নমেণ্টের হয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছেন। তাঁর কাজ ছিল আমার হাতের লেখা চিনিয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে প্রথম "মোহাম্মদী" সাপ্তাহিক ও "মোহাম্মদী" প্রেসের অন্যতম মালিক মৌলবী খায়রুল আনাম খানকে কোর্টে আনা হয়েছিল। আমার

হাতের লেখা একটা ইশ্‌তিহার মোহাম্মদী প্রেসে ছাপা হয়েছিল। সেই হাতের লেখা তাঁকে দিয়ে সনাক্ত (শনাখ্‌ৎ) করানোই সরকার পক্ষের উদ্দেশ্য ছিল। খায়রুল আনাম সাহেব বললেন, ছাপার কাজ তাঁর ম্যানেজার গ্রহণ করেন, তিনি নিজে করেন না। কাজেই, তাঁর সাক্ষ্য আর গ্রহণ করা হলোনা। অথচ, ফজলুল সেলবর্সী দশ-এগারো বছর আগে আমায় লিখতে দেখেছেন। তবুও নাকি আমার হাতের লেখা তাঁর মনে আছে। অবলীলাক্রমে আমার সব লেখা চিনিয়ে দিয়ে তিনি মোটা রাহা খরচ নিয়ে চলে গেলেন। পরে খায়রুল আনাম খান আমায় জানালেন যে ফজলুল হক সেলবর্সীর চাল-চলন ভালো নয়। রাজনীতিতে তাঁর পতন ঘটেছিল। "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" আমি যখন লিখেছিলেম (মে মাস, ১৯৫৯) তখন আমি জানতেম না তিনি বেঁচে আছেন কিনা। পরে শুনেছি, তিনি বেঁচে আছেন এবং ঢাকায় আছেন।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে বর্ধমানের আবুল কাসেম সাহেব এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে জোঁকের মতো কামড়ে ধরেছিলেন। এই কামড় ছাড়বার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ফজলুল হক সাহেবের ভিতরেও একটা দোদুল্যমানতা এসে গিয়েছিল। এই স্বভাবটা তাঁর সহজাত ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবুও "নবযুগ" যদি আমাদের (নজরুল ইস্‌লামের ও আমার) ছাড়তেও হয় তা হলে আমরা ফজলুল হক সাহেবকে সবকিছু বলে-কয়ে, রাজনীতিক কারণ দেখিয়ে এক সঙ্গে ছেড়ে দেব এটাই ছিল কথা। কিন্তু নজরুলের নবলব্ধ সাহিত্যিক বন্ধুদের কয়েকজন তাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন। তাঁদের ভিতরে "মোসলেম ভারতের" আফজালুল হক সাহেবও ছিলেন। তাঁরা কেবলই তাকে বলছিলেন যে একজন কবি দৈনিক কাগজে কাজ করবেন এটা কেমন কথা? কিন্তু কবিকেও যে খেতে হয় সেটা তাঁরা ভাবতেন না। "নবযুগে" দু'টি কাজ ছিল। একটি ছিল লেখা, অন্যটি ছিল সব রকম দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার ভার

বহন করা। নজরুলকে শুধু লিখতেই হতো, অন্য কাজটি হতে আমি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেম। আমাকে অবশ্য দু'টি কাজই করতে হতো। কাজেই, স্বাস্থ্য সত্য সত্যই খারাব হয়েছিল আমার। নজরুলের সাহিত্যিক ও গানের আড্ডা ছিল। তাতে তার মনটা কিঞ্চিৎ তাজা হতে পারত। তবুও নজরুল "নবযুগ" ছেড়ে গেল। সে যে চলে যাচ্ছে সে কথা অবশ্য সে আমায় বলেছিল। কিন্তু ফজলুল হক সাহেবকে কোনো কথাই সে জানাল না। তার জন্যে আমি মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেম। সাহিত্যিক বন্ধুদের উৎসাহে এতই সে মেতে গিয়েছিল যে আমার স্বাস্থ্যের কথাটাও সে একবার ভেবে দেখল না। অন্যদের সাথে আমিও তাকে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেম। দেওঘরের টিকেট কিনে সে দেওঘরেই গিয়েছিল। এটা ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা।

নজরুল ইস্‌লাম চলে যাওয়ার পরে আমি কয়েক দিন এঁর-ওঁর সাহায্য নিয়ে কাগজ বা'র করলাম। ফজলুল হক সাহেব কিন্তু তখনও কাগজের সুর বদলানোর কথা কিছু আমায় বলেন নি। তবে, আমি শুনতে পেলাম যে আবুল কাসেম সাহেব আবদুর্‌ রহিম বখ্‌শ্‌ ইলাহীকে কাগজখানার সব ভার দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই ভদ্রলোকের নিকট হতেই আমি জামিন স্বরূপে জমা দেওয়ার জন্যে দু'হাজার টাকা এনেছিলাম। আমি ভাবলাম এবার ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। তাঁকে আমি খোলাখুলি-ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—"নবযুগ নাকি আবদুর রহীম সাহেবের হাতে চলে যাচ্ছে?" তিনি উত্তর দিলেন—"তাতে তোমার কি অসুবিধা হবে?" আমি ফজলুল হক সাহেবকে পরিষ্কার ভাষায় জানালাম যে অসুবিধা আমার নিশ্চয় আছে। আবদুর রহীম সাহেব শুধু শুধু তো আর কাগজ চালাবেন না, তাঁর একটা কিছু রাজনীতি তো নিশ্চয় থাকবে এবং সেটা আমার বিচারে ভালো রাজনীতি হবে না। কাজেই, আমার পক্ষে আর 'নবযুগে' থাকা সম্ভব হবে না। আবদুর রহীম

সাহেবের সম্বন্ধে ফজলুল হক সাহেব কোনো প্রতিবাদ যখন করলেন না তখন তাঁর সঙ্গে একটা কথাবার্তা নিশ্চয় চলছিল। পরে তিনিই টাকা দিয়েছিলেন, না, আবুল কাসেম সাহেব অন্য কোনো ব্যবস্থা করেছিলেন, তা আমি জানিনে। ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে। নজরুল যে চলে গেছে তারপরে তখন একমাসও গত হয় নি।

আমিও 'নবযুগ' ছেড়ে দিলাম। আমার নামের ডিক্লারেশন আমি তুলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ফজলুল হক সাহেবের মনোনীত সাবির মিঞা নামে একজন নিজের নামে ডিক্লারেশন নিলেন। তাঁর নিকট হতে কোনো জামানত চাওয়া হলো না। আমি নিজের নামে দু'হাজার টাকার গবর্নমেণ্ট পেপার কিনে জমানত স্বরূপ কোর্টে জমা রেখেছিলেম, কেননা তখনকার দিনে ক্যাশ টাকা কোর্টে জমা নিত না। এই গবর্নমেণ্ট পেপারও আমি ফজলুল হক সাহেবের মনোনীত ব্যক্তির নামে ট্রান্সফার করে দিলাম। 'নবযুগে'র সঙ্গে আমার সব সম্পর্কে ছেদ পড়ল। যদিও সাবির মিঞা নূতন ডিক্লারেশন নিয়েছিলেন তবুও 'নবযুগ' তখনকার মতো বন্ধ হয়ে গেল। লেখার লোক তো ছিলেনই না, আমার বিশ্বাস যে টাকারও ব্যবস্থা ছিল না।

১৯২০ সালের মে মাসে 'নবযুগ' প্রথম বা'র হয়েছিল। সরকারী রেকর্ড তলাশ ক'রে প্রকৃত তারিখ বা'র করা হয় নি, এতকাল পরে তা পাওয়া যাবে কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই। তবে মে মাসে যে বা'র হয়েছিল এটাই ঠিক বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের হাতের 'নবযুগ' বন্ধ হয়েছিল ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে। সমস্যা হলো আমি এখন কোথায় যাই। ইচ্ছা করলেই ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটের বাড়ীটি আমি রেখে দিতে পারতেম। কিন্তু ফজলুল হক সাহেবের এত নিকটে থাকাটা ঠিক মনে হলো না। বারে বারে তিনি ডেকে পাঠাবেন। এই কারণে, নজরুল ইস্‌লামের বহু বিখ্যাত কবিতার রচনাস্থল ও বহু কবি ও সাহিত্যিকের আগমনে ধন্য ৮/এ, টার্নার

স্ট্রীট আমি ছেড়ে দিলাম। সাহিত্য সমিতির দ্বার আমার জন্যে অবারিত ছিল। কিন্তু সেখানকার দায়িত্ব নূতন ক'রে নেওয়ার ইচ্ছা আর আমার ছিল না। আমার সন্দ্বীপ কার্গিল হাইস্কুলের সহপাঠী ফজলুর রহমান ২৪ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের আফিসে চাকরি করতেন। তিনি তাঁর সঙ্গে ১৪/২ চেতলাহাট রোডে আমায় যেতে বললেন। সেখানেই আমি গেলাম।

দেওঘরে নজরুল ইস্‌লাম

কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে আমার যদি কোনো বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের বাড়ী থাকে, আর সেই বন্ধু বা আত্মীয় আমায় যদি লেখেন যে আমার এখানে এসে ক'দিন থেকে যান তবে আমি সে-জায়গায় গিয়ে কিছু দিন থেকে আসতে পারি। এমনও হতে পারে যে আমি নিজের প্রেরণায় তাঁদের নিকটে আমার যাওয়ার প্রস্তাব করতে পারি এবং তাঁরা খুশী হয়ে আমায় ডেকে নিতে পারেন। এ দুইয়ের কোনোটা না ঘটলে হাওয়া বদলাতে বা বিশ্রাম নিতে দূরের কোনো জায়গায় আমায় যেতে হলে আমি আগে হতে টাকা-কড়ির পুরো ব্যবস্থা করেই তবে যাব। সেই ব্যবস্থা না করে গেলে আমার হাওয়া বদলানো বা বিশ্রাম নেওয়া কোনোটাই হতে পারে না।

দেওঘর নজরুল ইস্‌লামের পূর্ব পরিচিত জায়গা ছিল না। সেখানে তার আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কেউ ছিলেন না। মোটামুটি একটা ব্যবস্থা না ক'রে কোন্ সাহসে সেখানে সে যেতে পারল? তার পল্টন ভাঙার পূর্বক্ষণে সে আমায় বারে বারে লিখল যে কলকাতায় গিয়ে থাকলে (আমি তাকে কলকাতা এসে থাকতে লিখেছিলাম) তার খাওয়া-পরার কি ব্যবস্থা হবে। তারপরে পল্টন হতে সাত দিনের ছুটি যখন সে পেয়েছিল তখন কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বাড়ী-ঘর দেখিয়ে দিয়ে আমি তাকে বলেছিলেম যে

ওখানে এসেই সে থাকবে। তার পল্টন ভাঙার পরে রেলওয়ে স্টেশন হতে সে যেন সোজা ওখানেই চলে আসে। তবুও তার মনের সঙ্কোচ পুরোপুরি কাটেনি। সে প্রথমে এসে উঠেছিল তার বন্ধু শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মেসে। সে কথা অন্য জায়গায় আমি লিখেছি। সেই নজরুল অপরিচিত দেওঘরে হাওয়া খেতে গেল কোনো ব্যবস্থা না করেই, একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। তার দেওঘরে যাওয়ার প্রধান প্রেরণাদাতাদের অন্যতম ছিলেন আফজালুল হক সাহেব। তাঁর সঙ্গে নজরুলের মৌখিক চুক্তি, গোপন চুক্তি নয়, হয়েছিল যে প্রতি মাসে তিনি নজরুলকে একশ' টাকা হিসাবে দিবেন, আর নজরুল অন্য কোনো কাগজে না ছেপে তার লেখা শুধু "মোসলেম ভারতে" ছাপবে। এটা একটা কঠোরতম চুক্তি ছিল, নজরুলের হাত পা বেঁধে দেওয়ার চুক্তি। কিন্তু নজরুল তা মেনে নিয়েছিল। শুধু দেওঘরে যাওয়ার জন্যে এই চুক্তি নয়, তখনকার মতো স্থায়ী চুক্তি। আমি বুঝেছিলাম, হয়তো আরও কেউ কেউ বুঝেছিলেন, যে আফজালুল হক সাহেবের সদিচ্ছা ছিল, কিন্তু "মোসলেম ভারতে"র সম্বল তাঁর সদিচ্ছা পূর্ণ হওয়ার মতো ছিল না। এই ঘটনা সম্পর্কে আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে লিখেছিলেম :—

> "কথা হয়েছিল নজরুল দেওঘর থেকে 'মোসলেম ভারতে'র জন্যে লিখবে এবং আফজালুল হক সাহেব মাসে মাসে খরচের জন্য একশ' টাকা হিসাবে পাঠাবেন। আমি জানতাম হাজার সদিচ্ছা সত্ত্বেও মাসে মাসে একশ' টাকা হিসাবে আফজল সাহেব কিছুতেই জোগাতে পারবেন না।"

খোলাখুলি ভাবে সকলের চোখের সামনে যে-ঘটনা ঘটেছে তারই একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি দিয়েছিলেম। নজরুলের বিরাট জীবন চরিত রচনায় ব্রতী আবদুল আজীজ আল-আমান আফজালুল হক সাহেবের তরফ থেকে লিখেছেন (পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১) "কিন্তু

আমাদের মনে হয় এ মন্তব্য ঠিক নয়। কেন না, জনাব আফজালুল হক জানিয়েছেন যে, সে সময় এ ধরনের কোনো কথা হয়েছিল বলে তাঁর মনে নেই।” এখানে কথা মানে মাসে মাসে একশ’ টাকা দেওয়ার কথা। আমি জানি বলেই তো ঘটনাটা সংক্ষিপ্তভাবে লিখে-ছিলেম। আফজাল সাহেবের মনে নেই ব’লে আমার দেওয়া ঘটনার বিবরণ (মন্তব্য নয়) বেঠিক হয়ে যাবে কেন ? আফজাল সাহেবের যা মনে নেই আমার তা মনে আছে। আফজাল সাহেব যে টাকা দেওয়ার কোনো অঙ্গীকার করেন নি তার প্রমাণ হিসাবে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা নজরুলের একখানা পত্র আজীজ সাহেব তুলে দিয়েছেন। তা থেকে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে “মনে নেই” কথাটা আফজাল সাহেব আমাকে সমীহ করেই বলেছেন। আসলে আমার দেওয়া বিবরণ সত্য নয়। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে আছে :—

> “টাকা ফুরিয়ে গেছে, আফজাল কিম্বা খাঁ যেন শীগ্‌গীর টাকা পাঠায়, খোঁজ নিবি আর বল্‌বি আমার মাঝে মানুষের রক্ত আছে। আজ যদি তারা সাহায্য করে, তা ব্যর্থ হবে না— আমি তা সুদে আসলে পুরে দেব।”

এই পত্র থেকে আমার দেওয়া বিবরণই তো সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। টাকা দেওয়ার কোনো চুক্তি না থাকলে কেউ কি এত জোরের সঙ্গে টাকা চাইতে পারেন ? ‘সাহায্য’ তো নজরুলের বিনয়ের কথা। সুদে আসলে পু’রে দেব মানে অনেক, অনেক লিখে দেব। তা না হলে সাহায্যের টাকার আবার আসল আর সুদ কি করে হয় ? এখানে “খাঁ” মানে বিখ্যাত আলী আকবর খান। তাঁর জন্যেও নজরুল “লিচুচোর” এবং আরও অনেক শিশু কবিতা লিখে দিয়েছিল। নজরুলকে দেওঘরে পাঠানোর উৎসাহদাতাদের মধ্যে আলী আকবর খানও ছিলেন।

আবদুল আজীজ আল-আমানের কৃপায় আমায় অনেক বকতে

হলো। নজরুলের দেওঘর যাওয়ার জোগাড়যন্ত্র আফজাল সাহেবেরা করলেন। যাওয়ার আগে সে একটি বিদায় সঙ্গীত রচনা করেছিল। কবিতা হিসাবে এটা তো চমৎকার বটেই গান হিসাবে এটা কতটা উৎরেছে সে-সম্বন্ধে মত প্রকাশ করার অধিকার আমার নেই। তবে, শুনতে আমার ভালো লেগেছিল খুবই। দূরে চলে যাওয়ার জন্যে তখনকার যে অনুভাব সেটা চমৎকার ফুটেছিল এই বিদায় সঙ্গীতে। গানটি এই রকম :—

বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজনপুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?
আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,
ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে॥
তোমার বাঁশীর উদাস কাঁদন
শিথিল করে সকল বাঁধন,
কাজ হ'ল তাই পথিক সাধন
খুঁজে ফেরা পথ বঁধুরে
ঘুরে' ঘুরে' দূরে দূরে॥
হে মোর প্রিয়! তোমার বুকে একটুকেতেই হিংসা জাগে,
তাই তো পথে হয় না থামা—তোমার ব্যথা বক্ষে লাগে!
বাঁধতে বাসা পথের পাশে
তোমার চোখে কান্না আসে
উত্তরী বায় ভেজা ঘাসে
শ্বাস উঠে আর নয়ন ঝুরে,
বন্ধু তোমার সুরে সুরে॥

নজরুল ইস্‌লামের দেওঘরে যাওয়া উপলক্ষে আফজালুল হক সাহেব একটি চা-পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। এই পার্টিতেই কবি তার এই গানটি প্রথম গেয়েছিল। শুনে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বারে বারে নজরুলের

চিবুক স্পর্শ করছিলেন। বলা বাহুল্য এই চা-পার্টিতে আমিও উপস্থিত ছিলেম। আজ চুয়াল্লিশ বছর পরে আবদুল আজীজ আল-আমানের মারফতে আফজালুল হক সাহেব এই চা-পার্টির খরচের হিসাব দাখিল করেছেন—আটত্রিশ টাকা ছ' আনা। আশ্চর্য এই যে এই আটত্রিশ টাকা ছ' আনার কথা তাঁর পরিষ্কার মনে থাকল, মনে থাকল না শুধু মাসে মাসে একশ' টাকা দেওয়ার যে অঙ্গীকারটি তিনি করেছিলেন সেই অঙ্গীকারটি!

যা'ক, দেওঘরের টিকেট কিনে নজরুল দেওঘরেই গিয়ে পোঁছে-ছিল। অন্য অনেকের সঙ্গে আমিও তাকে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেম। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ওপরে উল্লেখ করা পত্রে নজরুল কেন যে লিখেছিল "শিমুলতলা যাওয়া হয় নি" তা সে-ই জানে।

দেওঘরে নজরুল ইস্‌লামকে মনে রাখবার মতো দু'টি ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ট্রেন দেওঘরে পোঁছানোর আগে হতেই বৈদ্যনাথের পাণ্ডারা তাকে তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ধ'রে বসেছিল। সে যতই পাণ্ডাদের বোঝাচ্ছিল যে সে হিন্দু নয়,—মুসলমান, ততই পাণ্ডারা তাকে বলছিল যে, "মিথ্যা কথা ব'লে কি লাভ হবে বাবু?" অনেক বলেও সে যখন পাণ্ডাদের বোঝাতে পারল না যে সে একজন মুসলমান, তখন সে নিরুপায় হয়ে তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করল। পাণ্ডারা তাকে নিজেদের আস্তানায় নিয়ে গেল। সেখানে পোঁছে নজরুল তার সুটকেশ খুলে ট্রাউজার্স, শার্ট, শিরওয়ানী ও করাচি হতে আনা বিখ্যাত উঁচু টুপিটি বা'র ক'রে সে-সব পরতে লাগল। তখন পাণ্ডারা বুঝল যে সত্যই নজরুল মুসলমান। তারা তার নিকটে ক্ষমা চাইতে লাগল, আর জিজ্ঞাসা করল "বাবু, আপনাকে কোথায় পোঁছিয়ে দেব"? মুসলমানদের কোনো প্রতিষ্ঠান দেওঘরে ছিল না। শেষ পর্যন্ত পাণ্ডারা নিজেদের প্রাইভেট গাড়ীতে বসিয়ে নজরুলকে রাজনারায়ণ বসুর বাড়ীতে পোঁছিয়ে দিল। নজরুল এই বাড়ীর নাম

করেছিল, না, পাণ্ডারা আপনা হতেই তাকে এই বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল তখন তা আমি নজরুলকে জিজ্ঞাসা করিনি। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসু বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মাতামহ ছিলেন। তাঁর ছোট ছেলে মনীন্দ্র বসু তখন বেঁচেছিলেন এবং দেওঘরেই ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নজরুলের সঙ্গে যে-ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল তাতে আশ্চর্য নয় যে সে নিজেই এই বাড়ীর নাম ক'রে থাকতে পারে। যাই হোক, শ্রীমনীন্দ্র বসু সেই রাত্রির জন্যে নজরুলকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সকাল বেলা সে ডাক্তার কার্তিক বসুর স্যানাটরিয়ামে একটি ছোট্ট কটেজ্‌ ভাড়া নিয়ে সেখানে উঠে যায়। স্বাস্থ্যান্বেষীদের জন্যে এই স্যানাটরিয়াম তৈয়ার করা হয়েছিল। যাঁরা বেড়াতে আসতেন তাঁরা এর ছোট-বড় বাড়ী ভাড়া নিতেন। শীতকালে তো কেউ বড় একটা বেড়াতে আসেন না। তাই নজরুল সস্তায় দু' কামরার কটেজটি ভাড়া পায়। এই কটেজের খুবই নিকটে, কিন্তু স্যানাটরিয়ামের সীমানার বাইরে "ব্যবসায়-বাণিজ্যে"র সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্র বসুর বাড়ী ছিল। তাঁর দাদা (নাম ভুলে গেছি) ওখানে থেকে কিছু ব্যবসায় করতেন। তিনি আবার ডাক্তার কার্তিক বসুর স্যানাটরিয়ামের তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। তাঁর নিকট হতেই নজরুলকে কটেজ ভাড়া নিতে হয়েছিল। তিনিই দেওঘর সংলগ্ন হিরনা গ্রামের আবদুল্লাকে নজরুলের রাঁধবার জন্যে নিযুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। ছোট ছেলে। নজরুল তাকে আবদুল ব'লে ডাকত, কিন্তু শ্রীবসু তাকে আবদুল্লা নামেই ডাকতেন। এই পরিবারটির সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যায়। তার আরও বিশেষ কারণ ছিল যে তখন শ্রীশচীন্দ্র বসুর স্ত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ওখানে ছিলেন। তিনি "সঞ্জীবনী" সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের মেয়ে ও রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্রী। নিজে সুলেখিকা এবং দীর্ঘদিন "সুপ্রভাত" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই পরিবারের খুব নাম-ডাক ছিল।

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। নজরুল তখন শিশু। এঁদের সাহচর্যে নজরুলের দিন আনন্দেই কাটছিল। আরও কিছু কিছু পরিবারের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়ে যায়।

এই সময়ে একটি ব্যাপার ঘটে। রাজশাহীর এক যুবক একজন যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে নজরুলের নিকটে এসে বলল যে, "হঠাৎ এসে বিপদে পড়েছি, আজ রাত্রির মতো আপনার খালি ঘরটিতে আমাদের আশ্রয় দিন"। স্বামী-স্ত্রী ভেবে নজরুল সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে যায়। পরের দিনই অবশ্য তারা চলে গেল। এই ঘটনা নিয়ে শহরে কাণাঘুষা হতে লাগল। শোনা গেল যুবকটি মেয়েটিকে ঘরের বা'র করে এনেছিল। ওরা স্বামী-স্ত্রী ছিল না। শ্রীমতী কুমুদিনী বসুরাতো ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি নজরুলকে জানালেন যে তাঁদের নিকটে নৈতিক চরিত্রের মূল্য খুব বেশী। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে জেনে-শুনেই নজরুল সেই যুবক-যুবতীকে থাকতে দিয়েছিল। অন্য সব পরিবারের লোকেরা নজরুলের কথাই বিশ্বাস ক'রে নিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে শ্রীমতী বসুর বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল। দেওঘরে তাঁর সঙ্গে নজরুলের আর কোনো দিন কথা হয় নি। কেউ এই ঘটনা কলকাতায় ডাক্তার কার্তিক বসুর নিকটেও পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তাতে শ্রীমতী বসুর ভাসুরের তত্ত্বাবধায়কের কাজটিও চলে গেল। ইতোমধ্যে শ্রীমতী বসুর কলকাতা ফেরার দিন এসে গিয়েছিল। যাওয়ার দিন তিনি নজরুলের কটেজের পাশে এসে আবদুলকে বললেন,—"তোমার বাবুকে বল যে আমি কলকাতা চলে যাচ্ছি"। নজরুল ঘরের বা'র হলো না।

দেওঘরে নজরুল লিখেছিল তিন-চারটি গান বা কবিতা। তার একটির শুরু এই রকম :—

আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলতো নিতুই
সকাল সাঁজে,
আর এ পথে চলবে না সে সেই ব্যথা
হায় বক্ষে বাজে ॥
আমার ঘরের কাছটিতে তার ফুটতো লালী
গালের টোলে,
টল তো চরণ, চাউনি বিবশ, কাঁপতো নয়ন-পাতার কোণে
কুঁড়ি যেমন প্রথম খোলে গো ।
কেউ কখনো কইনি কথা
কেবল নিবিড় নীরবতা
সুর বাজাতো অনাহতা
গোপন মরম বীণার মাঝে ॥
ইত্যাদি ।

"বেদন হারা" নাম দিয়ে এই গানটি নজরুলের "পূবের হাওয়া"য় ছাপা হয়েছে ।

অনেক পরে শ্রীমতী কুমদিনী বসুর ভুল ভেঙেছিল । ১৯২২ সালে নজরুল যখন "ধূমকেতু" চালাচ্ছিল তখন একদিন শ্রীমতী বসু এসে নিজের মেয়ের জন্মদিবস উপলক্ষে তাকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান । নজরুল এই উপলক্ষে নীচের গানটি লিখেছিল । এই গানটিই ছিল শ্রীমতী বসুর মেয়েকে নজরুলের জন্মদিনের উপহার :

পথিক শিশু

নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে ।
কোন নামের আজ পরলি কাঁকন? বাঁধন-হারার কোন কারা এ ?
আবার মনের মতন করে
কোন নামে বল ডাকবো তোরে ?

পথ-ভোলা তুই এই যে ঘরে
ছিলি ওরে, এলি ওরে বারে বারে নাম হারায়ে॥
ওরে যাদু, ওরে মানিক, আঁধার ঘরের রতন-মণি!
ক্ষুধিত ঘর ভরলি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী। ইত্যাদি

আগেই বলেছি যে ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে আমি ১৪/২, চেতলা হাট রোডে থাকতে গিয়েছিলেম। সেখান থেকে রোজই যাই ৩২, কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসে, ৩, কলেজ স্কোয়ারে আফজালুল হক সাহেবের মোসলেম পাবলিশিং হাউসেও যাই মাঝে মাঝে। আফজালুল হক সাহেব নজরুলের নিকট হতে লেখা পাচ্ছিলেন না, লিখলে তো পাবেন। তিনি নজরুলকে এক হাস্যকর টেলিগ্রাম পাঠালেন যে, "লেখা পাঠান। অমুক (একটি মেয়ের নাম) ভালো আছে।" টেলিগ্রামের প্রতিলিপি তিনি যখন আমায় দেখালেন তখন আমি তো অবাক! বল্লাম, "এই মেয়েটির নাম এখানে কেন?" তিনি বললেন, "তাঁর জন্যে কবির মন খারাব হতে পারে।" একটি মেয়ে কবিতা লিখতেন। নজরুল তাঁকে কবিতা লেখার জন্যেই স্নেহ করত। কোনো দিন তাঁকে সে চোখেও দেখেনি। পর্দানশীন মুস্‌লিম মেয়ে, থাকেন আবার কলকাতা হতে কয়েকশ' মাইল দূরে। সেদিন আফজালুল হক সাহেবের জন্যে সত্যই আমার দুঃখ হয়েছিল। আমার বিশেষ কোনো কাজ তখন ছিল না। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে আমি এমন একজন লোক ছিলেম যার কলকাতার পশ্চিমে যাওয়ার শেষ সীমানা ছিল বর্ধমান। বর্ধমানেও একবার মাত্র গিয়েছিলেম ১৯০৮ সালে। মনে ভাবলাম নজরুলের উপলক্ষে একবার যদি দু'-তিন দিনের জন্যে দেওঘরে যাই তবে অনেকখানি পশ্চিম দেখা হয়ে যায়। কিন্তু একলা যেতে মন চাইছিল না। আমার এক ছাত্র বন্ধু ছিলেন,—ইমদাদুল্লা নাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি আমার সঙ্গে দেওঘরে যেতে রাজী

হয়ে গেলেন। আমরা দু'জন এক সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলাম। দেওঘরের কাছাকাছি ট্রেন পৌঁছুতেই ইমদাদুল্লাকেও পাওয়া ধরেছিল। তিনি ধুতিপরা ছিলেন। আমার পায়জামা ও শিরওয়ানী পরা ছিল বলে আমার নিকটে তারা আসেনি। নজরুলের কটেজে পৌঁছেই টের পেলাম যে তার চাল বাড়ন্ত হতে যাচ্ছে। বাজারের পয়সা আমরাই দিলাম। এটা বুঝতে অসুবিধা হলোনা যে বেচারী নজরুল দেওঘরে আটকা পড়তে যাচ্ছে। এই অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আমরা দেওঘরে যাই নি। এটা বুঝলাম যে নজরুলকে ওখানে রেখে আমাদের কলকাতায় ফেরা চলবে না। ছাত্র বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে তার নিকটে টাকা আছে। আমি নজরুলকে বললাম,

"এবার কলকাতায় ফিরে চলো"।

সে বলল, "তাই চলো"!

আশা করি, আমি খোলাসা করতে পেরেছি যে কেনই বা আমি দেওঘরে গিয়েছিলেম, আর কেনই বা নজরুলকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলেম। তার ইচ্ছায় আবদুল্লাকেও সঙ্গে আনা হলো। আমি আফজালুল হক সাহেবের পক্ষ হতে দেওঘরে যাইনি। কাজেই নজরুলকে আমার আস্তানায় নিয়ে এলাম। পরের দিন আফজালুল হক সাহেব এসে নজরুলের জিনিসপত্র ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে তাকে ৩২, কলেজ স্ট্রীটে নিয়ে গেলেন। আমার পক্ষ থেকে কিছু বলার ছিল না। আজ আফজালুল হক সাহেব স্বীকার না করলেও তখন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে নজরুল মাসিক একশ' টাকার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। সময়টা ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস ছিল। বিশেষভাবে মনে আছে এই জন্যে যে আমরা সরস্বতী পূজার ২।৩ দিন আগে দেওঘর হতে ফিরেছিলেম। চেতলার ছোট ছেলেরা যে সরস্বতী পূজা করেছিল তাতে গান গাওয়ার জন্যে তারা নজরুলকে চেতলায় ধরে এনেছিল। তাদের জন্যে একটি গানও নজরুল রচনা করেছিল।

পল্টন হতে ফেরার পরে এই প্রথম নজরুল ইস্‌লাম আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে থাকতে গেল। বিভিন্ন সময়ে সে আফজাল সাহেবের সঙ্গে মোট দু'মাস কিংবা তার কিছু বেশী সময় থেকে ছিল। বিভিন্ন লেখক এমন ভাবে লেখেন যে তা থেকে মনে হবে যেন অনেক কাল নজরুল ইসলাম আফজাল সাহেবের সঙ্গে থেকেছে। এই সময়কার কথা আফজালুল হক সাহেবের হয়ে আজীজ সাহেব তাঁর "পরিচয়ে" প্রকাশিত উল্লিখিত প্রবন্ধে লিখেছেন :—

(১) 'বড় বড় পান একসঙ্গে নজরুল পাঁচটা-ছটা পর্যন্ত অবলীলাক্রমে মুখে দিয়ে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করতেন।'

(২) 'প্রধানত কবির জন্যই প্রতিদিন দশ থেকে বার আনার পান খরচ হত।'

(৩) 'পুঁটিরামের দোকানের মিষ্টি এবং মালাইয়ের চা—৩২ নম্বরের দ্বিতলের কোণার ঘরটার নিত্য অতিথি ছিল। কেবল নজরুল কেন—অন্য যে-কোন দর্শক বা অতিথি ওখানে এ তিনটির (অর্থাৎ পান, পুঁটিরামের মিষ্টির ও মালাইয়ের চা'র) দর্শন পেতেন। বলা বাহুল্য, আফজাল সাহেব হাসি মুখেই সকল খরচ বহন করতেন।'

যদিও আফজালুল হক সাহেব পাওনাদারের টাকা শোধ দিতে পারতেন না তবুও তিনি বন্ধু বৎসল লোক ছিলেন একথা আমি মানি। কিন্তু বানিয়ে গল্প ব'লে কি লাভ, বিশেষ ক'রে এমন মানুষের সম্বন্ধে যে-মানুষ কোনো দিনই আর প্রতিবাদ করতে পারবে না? যে আসুরিক পান খাওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেই রকম পান খাওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পান এমন জিনিস যে 'পাঁচ-ছটা' বড় খিলি মুহূর্তে কেউ গিলেও ফেলতে পারে না। নজরুল পান খেত বটে, কিন্তু ১৯২১ সালে খুব বেশী পান খেত না। শুনেছি ১৯২৯ সালে সম্পূর্ণরূপে গানের রাজ্যে প্রবেশ করার পরে নজরুল খুব বেশী পান খাওয়া ধরেছিল। মালাই-চা শুধু মুসলমানের

দোকানে পাওয়া যায়। সকলে জানেন ৩২, কলেজ স্ট্রীটের ত্রিসীমায়ও মুসলমানের চায়ের দোকান ছিল না, আজও আছে কিনা সন্দেহ। তখন এই রেওয়াজও চালু হয়নি যে নিকটের দোকানের 'বয়' বাড়ীতে কিংবা আফিসে চা পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, পুঁটিরামের দোকানের মিষ্টি অবশ্যই আসতে পারত। হয়তো এসেছেও মাঝে মাঝে। আফজালুল হক সাহেবের ওখানে কোনো দিন মিষ্টি খাইনি, একথা বললে আমি মিথ্যা বলব। কিন্তু এই 'নিত্য অতিথি'র মিষ্টির ভাগ আমি পাইনি। চায়ের ভাগ অবশ্যই পেয়েছি। চা সেখানে স্টোভে তৈয়ার হতো। রান্নার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল দোকানে।

এখন আমি আবদুল আজীজ আমান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করছি যে এই সব প্রায় বানানো কাহিনী নজরুল জীবনীর অন্তর্ভুক্ত করার কি একান্তই প্রয়োজন আছে? না করলে জীবনী কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে?

আমার ছেড়ে দেওয়ার পরে 'নবযুগ' যে সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে কথা আমি আগে বলেছি। ইতোমধ্যে বর্ধমানের আবুল কাসেম সাহেবের পরিচালনায় 'নবযুগ' আবার বা'র হয়েছিল। প্রধান লেখক হিসাবে আনা হয়েছিল ফজলুল হক সাহেবের সেই বরিশালের বন্ধু শ্রীপ্রিয়নাথ গুহকে। তাঁর কথা আমি আগে বলেছি। সম্ভবত স্টেট্‌স্‌ম্যানের কাজ করেও তিনি এই কাজটি করতেন। বাঙলা তিনি লিখতে পারতেন। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে তিনি 'নায়কের' সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু বাজারে 'নবযুগ' বিক্রয় হচ্ছিল না। মনে হয় কাসেম সাহেব ভেবেছিলেন যে নজরুল ইস্‌লামকে ডেকে কিছু কিছু লিখিয়ে নিলে কাগজের বিক্রয় বাড়বে। কি করে তিনি ভাবতে পারলেন যে নজরুল শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ভাড়াটে লেখক, আর কি করেই বা নজরুল কাসেম সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হতে পারল

আজও ভাবতে আমার কেমন লাগছে। আমাকে সে এ সম্বন্ধে কিছুই বলেনি। রোজই তার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছিল। আফজালুল হক সাহেবই আমায় প্রথমে জানালেন যে নজরুল "নবযুগে" লিখতে যাচ্ছে। শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আমি নিজে একদিন গিয়ে দেখেও এলাম যে নজরুল সেখানে বসে সত্যই লিখছে। যে-কাগজ প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ বেছে নিয়েছিল সেই কাগজে নজরুলের মতো লোকের লিখতে যাওয়া আমার মতে সত্যই অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছিল।

কিন্তু কেন নজরুল আবার 'নবযুগে' লিখতে গেল? তার কারণ, সে আফজালুল হক সাহেবের ওখানে অস্বস্তি বোধ করছিল। সে বুঝেছিল যে তাঁর আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তা সত্ত্বেও আফজাল সাহেবের ওপরে নির্ভর করলেই তার পক্ষে অনেক ভালো হতো।

যে-কাগজ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায় তাকে টেনে তোলা সহজ কথা নয়। নজরুলের লেখা সত্ত্বেও 'নবযুগের' প্রচার বাড়েনি। কয়েকদিন পরে সে 'নবযুগ' ছেড়ে দিয়েছিল। তার পরেই একদিন সে আলী আকবর খানের সঙ্গে ত্রিপুরা জিলায় চলে গেল। 'নবযুগে'র মুদ্রাকর ও প্রকাশক সাবির মিঞার সঙ্গে আমার একদিন রাস্তায় দেখা হতে তিনি আমায় বললেন—"কাজী সাহেবকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাদের বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। আমরা গবর্নমেণ্টের নিকট হতে তাঁর লেখার জন্যে পরে পরে তিনটি ওয়ার্নিং পেয়েছি।" তাঁদের জামানত তো দিতে হয়নি যে তা বাজয়াফ্‌ৎ হয়ে যাবে। গবর্নমেণ্ট হয়তো এই ওয়ার্নিং-এর মারফতে তাঁদের বলে দিচ্ছিল যে নজরুল ইস্‌লামকে ছাড়িয়ে দাও। যাই হোক্ না কেন, নজরুলের লেখার জন্যে সরকারের পরে পরে দেওয়া তিনটি ওয়ার্নিং তার ইজ্জৎ বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

আফজালুল হক সাহেব, সম্ভবত আলী আকবর খানও,

ভেবেছিলেন যে দেওঘরের অবিরাম অলসতার ভিতরে নজরুল ইস্‌লাম ঝুরি ঝুরি লিখে ফেলবে। আরও অনেকে হয় তো এই রকম ভেবে থাকবেন। কিন্তু সে তাদের নিরাশ করেছিল। দেওঘরের অলসতায় সে মাত্র তিন চারটি গান বা কবিতা লিখতে পেরেছিল। তার মধ্যে একটির কথা আগে বলেছি। নজরুল অলস কবিও ছিল না, অলসতার উপাসকও সে নয়। কর্ম-চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়ে, অনেক উত্তাপ সৃষ্টি হলে তবে তার কলম হতে ভালো ভালো লেখা বা'র হতো। যাঁরা খাটেন, কাজ করেন, তাঁদের জন্যে সে লিখেছে। দৈনিক নবযুগের কাজের চাপের ভিতর দিয়েই সে ভালো ভালো কবিতা লিখেছে। আফজালুল হক সাহেবরা এসব কোনো দিন লক্ষ্য করেন নি।

একটি করুণ অধ্যায়

কাজী নজরুল ইস্‌লামের জীবনে এমন একটি করুণ ও বিষাদময় অধ্যায় আছে যে-অধ্যায়ের কথা সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে গেলে এবং সেই সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না হ'লে আমি সব চেয়ে বেশী খুশী হতাম। সম্বিৎ থাকা অবস্থায় নজরুল নিজে এই বিষয়ে কোনো চর্চা করে নি। সে সম্বিৎ হারাবারও বহু বৎসর পরে এই অধ্যায়টি আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। এই অধ্যায়টি রচনার মূলে যিনি রয়েছেন (আশা করি তিনি এখনও বেঁচে আছেন) প্রথমে আমি সেই আলী আকবর খানের সম্বন্ধে কিছু বলব। তাঁকে না বুঝলে কবির জীবনের এই অধ্যায়টি কেউ বুঝতে পারবেন না। আমি সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করব যে তাঁরা ধৈর্য সহকারে এই অধ্যায়টি বোঝার চেষ্টা করবেন।

আলী আকবর খানের সঙ্গে আমার পরিচয়

১৯১৩ সালে আমি নোয়াখালী জিলা স্কুল হতে ঢাকা কেন্দ্রে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেম। তখনকার দিনে সমস্ত নোয়াখালী জিলার কোনো জায়গায় মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার কোনো কেন্দ্র ছিল না, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় ছিল। নোয়াখালী শহরের দু'টি হাইস্কুলের মধ্যে রাজকুমার জুবিলী হাইস্কুলের ছাত্ররা কুমিল্লায় পরীক্ষা দিতে যেত, আর জিলা স্কুলের (গবর্নমেণ্ট স্কুলের) ছাত্ররা

পরীক্ষা দিতে যেত ঢাকায়। পরীক্ষা দিতে গিয়ে ঢাকায় কলেজে পড়ুয়া অনেক ছাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। আলী আকবর খানের সঙ্গেও তখন আমার পরিচয় হয়। যতটা মনে পড়ে তিনি তখন ঢাকা কলেজের ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে পড়তেন। আমার বিশ্বাস তিনি আমার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। কারণ, আমি বেশী বয়সে ইংরেজি স্কুলে পড়তে গিয়েছিলেম। পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে-পরিচয় ঢাকার কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে আমার হয়েছিল তা ছিল প্রায় ট্রেনের কামরায় যাত্রী আর যাত্রীতে পরিচয়ের মতো। গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর পরেই অধিকাংশ যাত্রীরা একে অন্যকে ভুলে যান। আমার কিন্তু আলী আকবর খানের নামটি মনে ছিল। কারণ, তাঁর স্বভাবে বড় বেশী কৃত্রিমতা ও নাটকীয় ভাব ছিল। তার ওপরে, তিনি এংলো-ইণ্ডিয়ান পোশাক পরতেন এবং ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলতেন না। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যে তাঁর নাম আমার মনে থেকে গিয়েছিল বটে, কিন্তু কোনো যোগাযোগ তাঁর সঙ্গে আমার আর থাকে নি।

এর প্রায় ছয় বছর পরে ১৯১৯ সালে আলী আকবর খানের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় কলকাতার ওয়েলিংটন স্ট্রীটের (এখন নাম নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট) টেলর হোস্টেলে বদীউর রহমান সাহেবের ঘরে। বদীউর রহমান সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন। যুক্ত বঙ্গে তিনি শিক্ষা বিভাগের এসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর ছিলেন, দেশ ভাগ হওয়ার পরে পাকিস্তানে চলে যান। তাঁর সঙ্গে আলী আকবর খানের পরিচয় হয়েছিল ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে এই অস্থায়ী সৈন্যদলটি গঠিত হয়েছিল। সকলকে মোটামুটি একটা ট্রেনিং দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হতো, দরকার পড়লে ডেকে নেওয়া হবে। সংক্ষেপে এই সৈন্যদলকে আই. ডি. এফ. বলা হতো। মিস্টার এ. কে. ফজলুল হক ঠাট্টা করে বলতেন এর মানে হচ্ছে I do not fight (আমি

যুদ্ধ করি না)। ছ'বছর পরে দেখা হওয়ায় প্রথমে আলী আকবর খানকে আমি চিনতে পারি নি, তবে তাঁকে আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। তিনি খোলস বদলে ফেলেছিলেন। এবারে তিনি ধুতি ও খাকি শার্ট পরেছিলেন, কথাও বলছিলেন বাঙলায়। আমি তখন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সহকারী সম্পাদক ও সব-সময়ের কর্মী ছিলেম। নূতন পরিচয়ের পরে আমাকে উপলক্ষ করে তিনি ৩২, কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসে যাতায়াত শুরু করলেন। কি করেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন যে তিনি যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রকাশন-ভবনের ম্যানেজার। আলীগড় কলেজের গণিতের অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম তখন কে না শুনেছেন? আর তাঁর পাটীগণিতের বই হতে আঁক কষেননি লেখা-পড়া জানা লোকেদের মধ্যে এমন লোক তখনকার দিনে কেউ ছিলেন· বলে আমার বিশ্বাস নেই। দু'দিন পরেই আলী আকবর খানের মিথ্যা ভাষণ ধরা পড়ে যাবে এটা বুঝেও তিনি যে ওই ফার্মের ম্যানেজার এই কথাটি ক্রমাগত সকলকে বলেই যাচ্ছিলেন। আসল ব্যাপারটি ছিল এই যে তাঁর কুমিল্লার পাঠ্যজীবনের বন্ধু শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রকাশন-ভবনে চাকরি করতেন। হয় তো তিনি সেখানে ম্যানেজারও ছিলেন। তাঁর উপলক্ষে আলী আকবর খান ওই ফার্মে যাতায়াত করতেন। পরে শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে আমারও পরিচয় হয়ে যায়। সাহিত্য সমিতির আফিসেও তিনি এসেছেন। আশ্চর্য এই, তখনও মনে হ'তনা যে খান সাহেব এতটুকুও লজ্জিত। ক্রমাগত যাতায়াতের ফলে সাহিত্য সমিতির প্রায় সকলের সঙ্গে আলী আকবর খানের পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্য সমিতিতে একখানা ছোট্ট খালি ঘর ছিল। একখানা তখ্‌ৎপোশও সে ঘরে পাতা ছিল। এক দিন দেখা গেল যে কাউকে কিছু না জানিয়ে আলী আকবর খান ওই ছোট্ট ঘরটিতে তাঁর বিছানা পেতে ফেলেছেন। সকলেই স্তম্ভিত হলেন, কিন্তু চক্ষুলজ্জার

খাতিরে বললেন না কেউ কিছু। আমাকে উপলক্ষ করে এই মিথ্যাভাষী লোকটি সাহিত্য সমিতির আফিসে যে যাতায়াত করতেন এটা অনেকেই ভালো চোখে দেখতেন না, তার ওপরে তিনি আবার ক'রে বসলেন এই জবর দখল। মুখ ফুটে কেউ আমার কোনো সমালোচনা করলেন না বটে, কিন্তু আমাকেই যে সকলে নিমিত্তের ভাগী করলেন সেটা আমি বুঝলাম। এই ভাবে কয়েক মাস ওখানে কাটাবার পর দেখা গেল যে তিনি একটি খারাব ব্যাধিতেও ভুগছেন। কয়েক দিন তো তাঁকে বিছানায় শুয়েই থাকতে হলো। আমি কিছু বলতে পারছিলেম না বটে, তবে আমার মন একটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। ঠিক এমন সময়ে নজরুল ইস্‌লাম ওই বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে থাকতে এলো। অন্য সকলের সঙ্গে তার যেমন পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো ঠিক তেমনই তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো আলী আকবর খানের সঙ্গেও। ঠিক পাশের ঘরেই তো তিনি থাকতেন। নজরুল তাঁকে এটা-ওটা এগিয়ে দিতে লাগল। দোকান হতে তাঁকে খাবারও এনে দিতে লাগল। অবশ্য, ক'দিনের ভিতরেই তিনি চলাফেরা করার উপযুক্ত হয়ে গেলেন। এই ভাবেই হয়েছিল আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুল ইস্‌লামের পরিচয়ের সূত্রপাত। এই পরিচয়ই যে একদিন নজরুলের জীবনে অত্যন্ত বিষাদময় হয়ে উঠবে সেটা সে দিন কে বুঝেছিলেন?

আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ের সূত্রপাত

আলী আকবর খান কি করতেন সে-কথাই আমি এখন বলার চেষ্টা করব। আমরা দেখতাম যে সম্রাট বাবরের জীবন নিয়ে তিনি একখানা নাটক লিখছেন। অর্থাৎ, তাঁর নিজের স্বভাবেই শুধু নাটকীয়তা ছিলনা, তিনি একখানা নাটক রচনাও করছিলেন। তাঁর লেখা তিনি আমায় পড়েও শোনাতেন। ধৈর্য ধারণ ক'রে আমায় তা শুনতে হতো। লেখায় আন্দিজানের কথা আসলেই তিনি তাঁর গলার স্বরে খানিকটা দেশপ্রেমের ভাব ফুটিয়ে তুলতেন। আন্দিজান

বাবরের মাতৃভূমি ছিল, উজ্‌বেকিস্তানের একটি জায়গা। তার পরে দেখতাম তিনি বিভিন্ন জিলার ছোট ছোট ভৌগলিক বিবরণ লিখে ছাপাচ্ছেন। এই বইগুলি পাঠ্য তালিকাভুক্ত হতো না বটে, তবে শিক্ষকেরা ছেলেদের দিয়ে সে-সব বই কেনাতেন এই জন্যে যে আপন আপন জিলা সম্বন্ধে তারা ওয়াকিফহাল হতে পারবে। আলী আকবর খানের বড় ভাই (জ্যেষ্ঠাগ্রজ) আলতাফ আলী খান বইগুলি ক্যান্‌ভাস করে বিক্রয় করতেন। তিনি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আলী আকবর খানের তৃতীয় কাজ (সেটাই বোধ হয় তাঁর আসল কাজ) ছিল যে তিনি প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য পুস্তক রচনার মশ্‌ক করতেন। তাঁর কথাবার্তা হতে বুঝতাম যে প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য পুস্তক লিখে বা প্রকাশ ক'রে তিনি একদিন বিত্তশালী হবেন। এই পুস্তকগুলির জন্যে তিনি কবিতা নিজেই লিখতেন। সে যে কি অপূর্ব চীজ হতো তা প্রকাশ করা কঠিন। আমি ঠাট্টা ক'রে তাঁকে বলতাম কেন আপনি বাচ্চাগুলির ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে যাচ্ছেন? তার চেয়ে বরঞ্চ আমাকে কবিতা পিছু পাঁচটি করে টাকা দিন, আমার কবিতা আপনার কবিতার চেয়ে ভালো হবে। তিনি হাসতেন। কেননা, আমি লিখলেও তা যে কবিতা হবে না তা তিনি জানতেন।

"লিচু-চোর শীর্ষক কবিতার জন্ম কথা

আলী আকবর খানের কবিতা দেখে তো নজরুলের চক্ষুস্থির! সে তখন তখনই তাঁকে তার বিখ্যাত "লিচু-চোর" লিখে দিল। এই কবিতা পেয়ে খান সাহেব আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠলেন। পরে এই "লিচু-চোর"ই নজরুলের অনেক দুঃখের কারণ হয়েছিল।

আমি সঠিক তথ্য জেনে রাখিনি। আমার মনে হয়েছিল আলী আকবর খান প্রথম যে প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক ছেপেছিলেন তা টেক্সট্‌বুক কমিটিতে দাখিল না ক'রে শিক্ষকদের মত জানার জন্যে তাঁদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। তার পরে সব কিছু তিনি

ঢাকা হতে করেছিলেন। সেখানে তিনি কি করেছিলেন, আর কি হয়েছিলেন, তার কোনো খবর আমি রাখিনি। লোকমুখে শুনেছিলেম তিনি বিত্তশালী হয়েছিলেন।

দেওঘর হতে ফেরার পরে নজরুল ইস্লাম ৩২, কলেজ স্ট্রীটে আফ্জালুল হক সাহেবের সঙ্গে যে থাকছিল সে-কথা আমি আগে বলেছি। এই সময়ে একদিন আলী আকবর খান তাকে ধ'রে বসলেন—"চলুন কাজী সাহেব, আমার সঙ্গে আমাদের দেশে। আমাদের বাড়ীতে দিন কতক থেকে আসবেন।" এই প্রস্তাব খোলাখুলিই করা হয়েছিল, গোপনে নয়। নজরুল তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে এই সম্বন্ধে কি পরামর্শ করেছিল তা আমি জানিনে, তবে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আলী আকবর খান তাঁদের বাড়ী যাওয়ার জন্যে তাকে অনুরোধ করছেন, আমার কি মত? আমি তাকে বলেছিলেম,—

> "দেখ ভাই, আমার পরামর্শ যদি শুনতে চাও তবে তুমি কিছুতেই আলী আকবর খানের সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে যেও না। তিনি অকারণে অনর্গল মিথ্যা কথা বলে যান, যেন অভিনয় করছেন এই রকম একটা ভাব তাঁর কথাবার্তার ভিতর দিয়ে সর্বদা প্রকাশ পায়। কি মতলবে তিনি তোমায় তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান তা কেউ জানেন না। তিনি তোমাকে একটা বিপদেও ফেলতে পারেন।"

কিন্তু নজরুল আমার কথায় কোনো কান না দিয়ে শেষ পর্যন্ত আলী আকবর খানের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। কোন্ দিন কোন্ ট্রেনে সে যাবে একথা হয়তো তার বন্ধুরা সকলে জানতেন না, আমিও জানতেম না, কোন্ দিন কোন্ ট্রেনে সে যাবে। সে সময়ে আমি অন্য জায়গায় থাকতেম, তবে প্রায় রোজই আসতাম ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে তার এই যাওয়া নিয়েও কাহিনী রচনা হয়েছে। নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

১৯৫১ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যক "কবিতা"য় যা লিখেছেন সেটাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। তিনি লিখেছেন :—

"নজরুল ইস্‌লাম এই সময়ে থাকতেন মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে······মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব ছিলেন তাঁর সহকক্ষবাসীদের অন্যতম।

নজরুলের প্রাত্যহিক গতিবিধি ও কার্যসূচীর সন্ধান আগে থেকেই আমার জানা থাকতো। একদিন সারা বিকেলটা নজরুলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঠিক তার পরের দিন সকাল বেলায় গিয়ে দেখি, নজরুল ঘরে নেই। তাঁর একজন সহকক্ষবাসী বন্ধু হাসতে হাসতে বললেন : 'সে তো কাল রাত্তিরে কুমিল্লায় চলে গেছে।' আমি বললাম 'কই, কাল তো কিছুই বললে না।' 'বলবে কি ক'রে? কাল সন্ধ্যার পরে একজন ভদ্রলোক এসে কী সব কথাবার্তা ক'য়ে কুমিল্লা যাবার প্রস্তাব করলেন; প্রস্তাব অনুমোদন, সমর্থন, সব মুহূর্তের মধ্যে—সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রা।'

নজরুলের এই সহকক্ষবাসী বন্ধুটি 'মোসলেম ভারত'-এর কর্ণধার আফ্‌জাল-উল্ হক্।"······

("নজরুল রচনা-সম্ভার" হতে উদ্ধৃত)

নজরুলের বন্ধুরা কথা ভুলে যান। কিন্তু স্বীকার করেন না যে কথাটা তাঁদের মনে পড়ছে না। যে কথাটা মনে পড়ছে না সেটা নিজেদের কল্পনা হতে বানিয়ে খালি জায়গা তাঁরা ভর্তি ক'রে দেন। নলিনী বাবু নজরুলের গতিবিধির ও কার্যসূচীর খবর নিশ্চয় রাখতেন, কিন্তু সবই ভুলে বসে আছেন। এই ব্যাপারে তিনি কোন্ কোন্ কথা ভুলেছেন তা আমি বলছি :

(১) নজরুলের প্রথম কুমিল্লা যাওয়ার সময়ে সে আমার সঙ্গে থাকত না।

(২) তার কুমিল্লা যাওয়ার প্রস্তাব খোলাখুলি ভাবে হয়েছিল।

সকলে তা জানতেন, শ্রীনলিনীকান্ত সরকারও জানতেন। আলী আকবর খান কুমিল্লা যাওয়ার প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল শিয়ালদা চলে গেল একথাটা সত্য নয়। এই প্রস্তাবটি বেশ কয়েকদিন ধরে নজরুলের বন্ধু মহলে আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল। কখন কোন্ ট্রেনে রওয়ানা হবে সে-খবর অনেকেই জানতেন না, সেটা আলী আকবর খানের হাতে ছিল।

(৩) নজরুলের রাত্রের ট্রেনে যাওয়ার কথাও ভুল। সে গিয়েছিল সকাল বেলাকার চট্টগ্রাম মেইলে। কুমিল্লা ও আসামের লোকেরা চট্টগ্রাম মেইলে গিয়ে চাঁদপুরে আসামের মেইল ধরতেন। কুমিল্লা সেই মেইলের একটি স্টেশন।

নলিনী বাবু যে সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন সেই সকল কথা নিজের কল্পনা হতে বানিয়ে ব'লে দিয়েছেন।

সকাল বেলা ৩২, নম্বর কলেজ স্ট্রীটে এসে আমি আফ্‌জালুল হক সাহেবের মুখে শুনলাম যে নজরুল ভোর বেলাকার চট্টগ্রাম মেইলে কুমিল্লা চলে গেছে। সময়টা ছিল ১৩২৭ সালের চৈত্র মাস। খ্রীস্টীয় হিসাবে ১৯২১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস। সে যে আলী আকবর খানের ফাঁদে পড়বে এ কথা আমি বুঝেছিলেম। তবুও তার ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কথা ভেবে আমার মন খারাব হয়ে গেল। সে ছিল তখন বাইশ বছরের যুবক। তাকে তো আর জোর ক'রে ধ'রে রাখা যায় না। যত সব অদ্ভুত ধরনের লোকের দ্বারাই নজরুল সহজে আকর্ষিত হতো। সে জানত আলী আকবর খান দাম্ভিক, মিথ্যাভাষী ও শঠ। এসব জেনেও সে তাঁর আকর্ষণ এড়াতে পারল না। সে কিছুই গভীরভাবে বুঝতে চাইল না। কিন্তু আলী আকবর খানের সব কিছু ছিল সুপরিকল্পিত। লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ে দেখে তিনি কাজে এগুচ্ছিলেন। "লিচু-চোর" কবিতাটি

নজরুলের কাল হয়েছিল। এই থেকেই খান সাহেব বুঝে নিয়েছিলেন যে সে তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যাবে। "লিচু-চোর" তাঁকে বুঝিয়ে দিল যে কবি ছোটদের মন বোঝে। অতএব, শিশু কবিতার রাজ্যে জয়-জয়কার হবে ভাবী প্রকাশক আলী আকবর খানের। যে শিশুদের জন্যে কবিতা লিখতে পারে সে গদ্যে তাদের জন্যে বইও লিখতে পারবে। যেমন করেই হোক কবিকে নিজের মুঠোর ভিতরে নিয়ে আসাই ছিল আলী আকবর খানের পরিকল্পনা।

নজরুলের কুমিল্লা যাত্রা

নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রথমে কুমিল্লা শহরের কান্দির পাড়ে শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ীতে পৌঁছুলেন। তিনি ছিলেন ত্রিপুরা জিলার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের একজন ইন্‌স্পেক্টর। আলী আকবর খান কুমিল্লা জিলাস্কুলে তাঁর একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের সহপাঠী ছিলেন। এই সূত্রে তিনি বীরেন্দ্রকুমার সেনের সঙ্গে তাঁদের বাসায় যাতায়াত করার ভিতর দিয়ে বীরেন্দ্রকুমারের মাতা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠেন। বীরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে সঙ্গে আলী আকবরও তাঁকে মা ডাকতে থাকেন। আগে যে উমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম করেছি তিনিও এককালে কুমিল্লা জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন, তিনিও বিরজাসুন্দরী দেবীকে মা ডাকতেন। স্কুল জীবনের পরেও আলী আকবর খান এই বাসায় যাতায়াত বন্ধ করেন নি। তিনি এখানে আসতেন ও থাকতেন, কাজেই খেতেনও। ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ আত্মীয়তার রূপ নিয়েছিল। আলী আকবর খানের জ্যেষ্ঠাগ্রজ আলতাফ আলী খানেরও এই বাসায় যাতায়াত ছিল। বীরেন সেনের বোনেরা আলী আকবর খানকে "আলী-দা" ডাকত। পরিবারটি তেমন সচ্ছল অবস্থার ছিল না। কিন্তু তাতে সাহিত্য ও সঙ্গীতের আবহাওয়া বিরাজ করত। রাজনীতিক

শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায়

আবহাওয়াও এই পরিবারে ছিল। বীরেন্দ্রকুমার সেনের জ্যেঠতুত বোন প্রমীলা ও আপন বোন কমলা অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ফয়জুন্নিসা গার্লস্ হাইস্কুল (গবর্নমেণ্ট স্কুল) ছেড়েছিল।

শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারে নজরুল ইস্‌লাম আপন জনের মতো অভ্যর্থিত হলো। ইতোমধ্যে কবিরূপে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাকে নিজেদের ভিতরে পেয়ে এই পরিবারের লোকেরা সত্যই বড় আনন্দিত হলেন। নজরুল ইস্‌লাম শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় এসেছেন জানতে পেয়ে শহরের যুবকেরা ভিড় করে সেই বাসায় আসতে লাগলেন। কবিতার আবৃত্তিতে ও গানে পরিবারটি মুখর হয়ে উঠল। কবি নিজে এই পরিবারের আব-হাওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে গিয়েছিল। বিরজাসুন্দরী দেবীর ও বীরেন্দ্রকুমার সেনের বিধবা জ্যেঠী-মা গিরিবালা দেবীর যত্নাদরে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল; সেও বিরজাসুন্দরী দেবীকে মা ডাকতে লাগল। অবশ্য দৌলৎপুর গ্রামে আলী আকবর খানদের বাড়ীতে যাওয়ার পথেই নজরুল শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় উঠেছিল। এই সময়ে সে চার-পাঁচ দিন এই বাসায় ছিল। তারপরে সে চলে গেল দৌলৎপুর গ্রামে। সে কি ভাবে গিয়েছিল, কোনো যান ব্যবহার করেছিল কিনা একথা আমি কাউকে কোনো দিন জিজ্ঞাসা করি নি। তবে, চৈত্রমাসের পথে তখনও কাদা হয় নি।

কলকাতায় আমরা লোক মুখে শুনতে পেলাম যে কুমিল্লায় নজরুল ইস্‌লামের খুব আদর-আপ্যায়ন হয়েছিল। সে সময়ে সে কুমিল্লায় কোনো সভা বা মিছিলে যোগ দিয়েছিল কিনা এই কথাটা আমি ঠিক বলতে পারছিনে। তবে, তখন দেশে প্রবল আন্দোলন চলেছিল। নজরুলের নিকট হতে আমি কোনো পত্র পেলাম না। অন্যরাও যে কোনো পত্র পেয়েছিলেন সে কথাও শুনিনি। সমস্ত বৈশাখ মাস কেটে গেল, কোনো খবরই নেই। জ্যৈষ্ঠ মাসে হঠাৎ একদিন আমি নজরুল ইস্‌লাম ও আলী আকবর

খানের নিকট হতে পত্র পেলাম যে খান সাহেবের এক ভাগিনেয়ীর সঙ্গে নজরুলের বিবাহ স্থির। তাঁরা আমার সম্মতি না শুভাশিস্ চেয়েছিলেন তা আমার মনে নেই। আমি নজরুলের চেয়ে দশ বছরের বড়। শুভাশিস্ও তাঁরা চাইতে পারেন। একই সময়ে আরও অনেকে পত্র পেয়েছিলেন। আমি সত্যই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেম। এমন সংবাদ পাওয়ার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। পুরো ত্ব'টি মাসও নজরুল আলী আকবর খানের বাড়ীতে থাকে নি। এর মধ্যে একটি গ্রাম্য মেয়ের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হলো, পরিচয় হলো, ভালোবাসা হলো এবং তারপরে একেবারে বিবাহ স্থির! মেয়েটির কোনো রূপ-গুণের কথা আমাকে লেখা পত্রে ছিল না। নজরুলের বন্ধু মহলে একজনও এমন বিয়ের সমর্থন করলেন না, সকলে হায়! হায়! করতে লাগলেন। আলী আকবর খান সাহিত্য সমিতির আফিসে ছিলেন। তাঁরা তাঁকে অল্প-বিস্তর চিনেছিলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, "সত্যকার প্রেম জন্মালেও তো লোকে অপেক্ষা করে, পরস্পারের মন বোঝার চেষ্টা করে, এমন কি মেয়েটি বাগ্‌দত্তা হওয়ার পরেও তো কেউ কেউ বছরের পর বছর অপেক্ষা করেন—এমন হুট্ করে বিয়ে করতে তো কাউকে কোনো দিন দেখিনি।" আমি এই বিয়েতে অসম্মতি জানিয়ে খুব তীব্র ভাষায় একখানা পত্র লিখেছিলেম। এই পত্রের ভাষা মনে রাখি নি। আমি যে অত্যন্ত চটেছিলেম তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। নজরুল কোনো উত্তর দিল না, উত্তর দিলেন আলী আকবর খান। লিখেছেন আমার পত্র মাথায় তুলে নিয়ে নজরুল আর তিনি নাকি নেচেছেন। আমার পত্র যদি মাথায় তুলেই তাঁরা নিলেন তবে তো বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া উচিত ছিল। তা না করে বিয়ের নিয়ন্ত্রণ পত্র তাঁরা নানান জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতায় অন্যরা বিয়ের আগে নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলেন, আমি পেয়েছিলেম বিয়ের পরে। ওরা

আষাঢ় বিয়ের তারিখ ছিল খ্রীস্টীয় হিসাবে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। আমি ভাবলাম নজরুল যখন বিয়ে করেই ফেলেছে তখন আর কি করা যাবে? আমার মন ধীরে ধীরে নরম হয়ে এলো।

আবার কোনো চিঠি-পত্র নেই। আমি ভাবলেম নজরুল বুঝি বিয়ের আনন্দে মেতে আছে নাই বা দিল চিঠি। হঠাৎ যেন একদিন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হলো। জুন মাসের শেষ সপ্তাহেরও শেষাশেষিতে আমি নজরুলের লেখা একখানা পোস্ট কার্ড পেলাম। তার ভাষা মনে থাকার কথা নয়। তবে, মোদ্দা কথা যা মনে আছে তা হচ্ছে এই যে সে আলী আকবর খানের দ্বারা প্রতারিত ও অপমানিত হয়েছে। তার ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পত্রের ওপরের দিকে যে ঠিকানা দেওয়া আছে সেই ঠিকানায় যেন আমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই। কুমিল্লার কান্দিরপাড় স্থিত শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসা হতে পত্রখানা এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই আমি সাহিত্য সমিতির আফিসে, তার মানে 'মোসলেম ভারতে'ও খবরটা পৌঁছিয়ে দিলাম। সেখান থেকে খবরটা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমার হাতে টাকা ছিলনা। আমি টাকা সংগ্রহে বা'র হলাম। একজন বন্ধু রাইটার্স বিল্ডিং-এ শিক্ষা বিভাগে চাকরি করতেন। তাঁর কাছ থেকে বিশটি টাকা ধার ক'রে নজরুলকে পাঠিয়ে দিলাম।

এদিকে নজরুলের বন্ধুরা ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে জড়ো হলেন। সকলেই আবার হায় আফসোস্ করতে লাগলেন। পত্রে দেওয়া ঠিকানা দেখেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলল বাসাটা তার চেনা, ও বাসার সব লোককে সে চেনে। কী ব্যাপার ঘটেছে তা জানতে চেয়ে সে সঙ্গে সঙ্গেই বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তকে একখানা পত্র লিখে ডাকে ফেলে দিল। সকলে আলোচনা করে স্থির করলেন যে একজনের কুমিল্লা গিয়ে নজরুলকে কলকাতায় নিয়ে আসা উচিত। যাওয়ার ভারটা পড়ল আমার ওপরে। আমি দু'টি অসুবিধার কথা তাঁদের জানালাম। প্রথম আপত্তি হলো গোয়ালন্দ হতে শুরু ক'রে

স্টীমার সার্বিসে এবং সমস্ত আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে তখন ধর্মঘট চলেছে। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে সশস্ত্র পুলিসের পাহারায় একখানা স্টীমার ও একখানা ট্রেন মাত্র চলে। এই ধর্মঘট অমান্য করে আমি কি ক'রে কুমিল্লা যাব? আমার জন্যে দ্বিতীয় অসুবিধা ছিল যে আমার হাতে টাকা ছিলনা। তবুও আমি বিশ টাকা ধার ক'রে নজরুলকে পাঠিয়ে দিয়েছি, একথা তাঁদের জানালাম। সকলে আমায় বললেন, ধর্মঘট অমান্য করা ঠিক নয় এটা তাঁরা বোঝেন। কিন্তু প্রশ্নটি হচ্ছে নজরুলের মতো একজন লোকের জীবনের। তাকে কলকাতায় যেমন করেই হো'ক নিয়ে আসাই উচিত। তার অসুখ বেশী হলে এখানেই তো তার চিকিৎসা হবে। শেষ পর্যন্ত আমি যেতে রাজী হলাম। কিন্তু টাকা? টাকা কেউ বা'র করতে পারলেন না, আফ্‌জালুল হক সাহেবও না। তবে, আফজালুল হক্ সাহেব আমার সঙ্গে টাকার জন্যে দু'চার জায়গায় ঘুরলেন। টাকা কেউ দিলেন না। সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীফকির দাস বন্দ্যোপাধ্যায় শুনতে পেয়েই ত্রিশটি টাকা এনে আমার হাতে দিলেন।

অধ্যাপক শ্রীফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগে আমি কোথাও উল্লেখ করি নি। তিনি নজরুলের নিকটে আসতেন, আমাদের সেই ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটের বাড়ীতেও যেতেন। তবে, হইচই ভালোবাসতেন না এবং কবিতার আবৃত্তি ইত্যাদিতেও থাকতেন না। নজরুলের জন্যে তাঁর কি রকম একটা আত্মীয়-সুলভ ভাব ছিল। কারণ, তাঁর বাড়ী বীরভূম জিলায় হলেও নজরুলদের বাড়ীর ওই অঞ্চলে কোথাও ছিল। তিনি নজরুলকে একদিন বলেছিলেন, তাঁর মা-বাবার বিশ্বাস ছিল যে তিনি একজন ফকিরের আশীর্বাদে জন্মেছেন। এই জন্যে তাঁর নাম রাখা হয়েছে ফকির দাস। নজরুলও তখন তাঁকে বলেছিল, তারও একটা ডাক নাম তারাখেপা। তার মায়ের অনেক বছর সন্তান হয়নি ব'লে তিনি তারাপীঠ হতে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সেই আশীর্বাদেই নজরুল তাঁর কোলে এসেছিল। সেই জন্যে নজরুলকে তারাখেপাও ডাকা হতো। অবশ্য, নানান রকম আলোচনার ভিতর দিয়ে ফকির বাবু আর নজরুল এই কথাগুলিও বলে ফেলেছিলেন। আমাদের এই দেশে কত রকম কুসংস্কার যে লোকে বিশ্বাস করেন তার কোনো শেষ নেই।

আজ অনেকেই আশ্চর্য হবেন যে ত্রিশ টাকা নিয়ে কোন্ ভরোসায় আমি নজরুলকে আনার জন্যে কুমিল্লা গিয়েছিলেম।

১৯২১ সালে রেলওয়ে ও স্টিমারের ভাড়া অত্যন্ত কম ছিল। তা ছাড়া, আমরা থার্ড ক্লাসের হিসাব করেছিলেম। কলকাতা হতে আমি রাত্রের ঢাকা মেইলে, রওয়ানা হয়েছিলেম। কারণ সকালের চাটগাঁ মেইলে গেলে চালু স্টীমারখানা পাওয়া যেতনা। ট্রেন ছাড়ার কিছু আগে আফ্‌জালুল হক্ সাহেব ছুটতে ছুটতে এলেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের নিকট হতে তার পত্রোত্তর পেয়েছিল। এই পত্র পড়ে ঘটনা সম্পর্কে খানিকটা ওয়াকিফহাল হয়েই আমি যাত্রা করেছিলেম। পথে আমাকে দু'রাত কাটাতে হয়েছিল। চাঁদপুরে কিছুতেই থার্ড ক্লাসে চড়তে পারলেম না, ইন্‌টার ক্লাসেও না, বাধ্য হয়ে কুমিল্লা পর্যন্ত ফার্স্ট ক্লাসে যেতে হলো। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে সেকেণ্ড ক্লাস ছিল না। কুমিল্লা পৌঁছেছিলাম সকাল বেলা। সে দিনটি ছিল ১৯২১ সালের (১৩২৮ সালের) রথ যাত্রার আগেকার দিন। তখনকার দিনে কুমিল্লায় খুব জাঁকালো রথযাত্রা হতো। রথযাত্রার দিন নজরুল আর আমি রথযাত্রা দেখার জন্যে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে রাস্তায় বা'র হয়েছিলেম। আমাদের সঙ্গে ওই গাড়ীতে ছিল বীরেন সেনের তের বছরের জ্যেঠতুত বোন প্রমীলা, তাঁর বারো বছরের আপন বোন কমলা, তাঁর ছ'বছর বয়সের শিশু বোন অঞ্জলি। তা ছাড়া, বীরেন সেনের চার বছরের শিশু পুত্র রাখালও ছিল। এই মেয়েদের ডাক

নাম ছিল যথাক্রমে ফুলি, বাচ্চি ও জটু। রাখাল ডাক নাম, তার আসল নাম প্রবীরকুমার। ফুলিকে আদর ক'রে দোলন ও দুলুও বলা হতো। কলকাতার গুপ্ত প্রেসে একশ' বছরেরও বেশী সময়ের পঞ্জিকা আছে। তাঁরা দয়া ক'রে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা হতে সেই বছরের রথযাত্রার তারিখটি আমায় বা'র ক'রে দিয়েছেন। তারিখটি ছিল ২৩শে আষাঢ়, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, (খ্রীস্টীয় হিসাবে ৭ই জুলাই, ১৯২১), বৃহস্পতিবার। তার মানে, আমি কুমিল্লা-কান্দিরপাড়ে শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় পৌঁছেছিলেম ১৯২১ সালের ৬ই জুলাই সকাল বেলা। আমার ওখানে পৌঁছানোর খবর পেয়ে স্থানীয় দারোগা বাড়ী (একটি বিশিষ্ট মুস্‌লিম পরিবার) হতে মুতাহ্‌হার চৌধুরী ও আলী নূর সাহেব আমায় নিয়ে যেতে আসেন, কিন্তু বাসার লোকেরা আপত্তি জানানোতে আমি ওই বাসাতেই থেকে যাই। দু' রাত্রি আমি শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় কাটিয়েছিলেম, তৃতীয় দিন বিকাল বেলা, অর্থাৎ ৮ই জুলাই তারিখে আমি নজরুল ইস্‌লামকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করি। কুমিল্লা হতে আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে ফিরেছিলেম। প্রমীলা ও কমলা বাড়ীটিকে সঙ্গীতমুখর করে রেখেছিল। ছোট্ট অঞ্জলি, সেও দেখলাম কম যায় না।

৬ই জুলাই (১৯২১) সকাল বেলা শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় পৌঁছে দেখলাম নজরুল ইস্‌লাম আঘাতের ধাক্কা সামলে নিয়েছে। ওই বাড়ীর লোকেদের যত্নে তো বটেই, বিশেষ করে বিরজাসুন্দরী দেবীর ঐকান্তিক যত্নের ভিতর দিয়ে নজরুল আবার নিজেকে ফিরিয়ে পেয়েছিল। এই ব্যাপারে কুমিল্লা শহরের যুবকদের অবদানও কম ছিল না। তাঁরা নজরুলকে এত বেশী ঘিরে রেখেছিলেন যে সে গুমরানোর কোনো অবকাশই পাচ্ছিল না। তার ওপরে সে সভা ও মিছিলে যোগ দিয়েছিল। তার জন্যে গান লিখেছিল ও গান গেয়েছিল।

আকবর খানদের বাড়ী হতে চেষ্টা হতে লাগল যে এই বিয়ে উপলক্ষে কুমিল্লার শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসার লোকদের নিমন্ত্রণ করে দৌলৎপুরে নিয়ে আসা হো'ক। এই ব্যাপারে একা আলী আকবর খান উদ্যোগী ছিলেন না। যতটা বোঝা গিয়েছে এতে তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ আলতাফ আলী খানেরও উদ্যোগ ছিল। স্কুল জীবন হতেই তো আলী আকবর খান ওই বাসায় যাচ্ছিলেন, খাচ্ছিলেন ও থাকছিলেন। ছোট ভাইয়ের কারণে আলতাফ আলী খানেরও এই পরিবারের সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়, অন্তরঙ্গতাও বেড়েছিল।

বিয়ের কথা হতেই নজরুলও বিরজাসুন্দরী দেবীকে লিখল যে "মা তুমি না এলে আমার পক্ষে তো কেউ থাকছেনা। তোমাকে আসতেই হবে।"

স্থির হলো যে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসা হতে সকলেই আসবেন।

নজরুল ইস্‌লামের মুখে যা শুনেছিলেম সেই কথাই বলছি। বিয়ের কথা স্থির হতেই আলী আকবর খান ভাগিনেয়ীকে নিয়ে পড়লেন। তাকে তো এর মধ্যেই গড়েপিটে দিতে হবে। তা না হলে এত বড় একজন কবির যোগ্যা স্ত্রী সে কি ক'রে হবে? অল্প ক'টি দিনের ভিতরে বেশী লেখাপড়া তাকে শেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বেটা ছেলে হয়ে শহরের মেয়েদের মতো শাড়ী পরানোও তিনি তাকে শেখাতে পারতেন না। কুমিল্লা হতে নিমন্ত্রিতারা এলে সে কাজ তাঁরাই করতে পারবেন। নার্গিসের মন যাতে পরিণত হয় সেই চেষ্টাই খান সাহেব একান্ত ভাবে করতে লাগলেন। তিনি তাকে শরৎচন্দ্রের লেখা হতে ও অন্যান্য লেখকের লেখা হতে নারী চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ অংশসমূহ প'ড়ে শোনাতে ও বোঝাতে লাগলেন। গড়ন পিটনটা অতি মাত্রায় হয়ে যাচ্ছিল। নজরুলের মোটেই তা মনঃপূত ছিলনা। কিন্তু তার বাগ্‌দত্তা ও আলী আকবর খান সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। আমার মনে হচ্ছে এ বিষয়ে

নজরুল আলী আকবর খানকে লিখেও তার মনের কথা জানিয়ে ছিল। অবশ্য, আমায় তা সে বলেনি। খান সাহেবের বাড়ীর কর্ত্রী তাঁর যে দিদি তাঁর এসব বাড়াবাড়ি দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গ্রেজুয়েট ভাইয়ের ওপরে কথা বলবে কে? নজরুল ইস্‌লামের মন ভেঙে গেল, সে সম্পূর্ণরূপে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল এই বিয়ের ওপরে। এই ব্যাপারটি ছিল আলী আকবর খান ও তাঁর ভাগিনেয়ীর তরফ হতে নজরুলের উপরে চরম আঘাত ও অপমান। ওদিকে নিমন্ত্রণ-পত্র চলে গিয়েছিল। অতিথি অভ্যাগতরা এসে পড়লেন ব'লে।

কুমিল্লায় শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসার লোকেরা এসব ব্যাপারের কিছু ঘুণাক্ষরেও জানতে পাননি। জানতে পেলে তাঁরা হয় তো দৌলৎপুরে যেতেন না। শিশুদের নিয়ে সেই বাসায় মোট নয় জন লোক ছিলেন। তাঁরা তো গেলেনই, তাঁদের সঙ্গে পরিবারের একটি স্নেহাস্পদ কিশোরও গেল। যারা গিয়েছিলেন :—

(১) শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
(২) শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী (শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের স্ত্রী)
(৩) তাঁদের একমাত্র পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
(৪) শ্রীমতী (মিসেস্) বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
(৫) তাঁদের শিশুপুত্র প্রবীরকুমার সেনগুপ্ত ওর্ফে রাখাল
(৬) শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী (বীরেন সেনের বিধবা জ্যেঠী-মা)
(৭) কুমারী প্রমীলা সেনগুপ্তা
(গিরিবালা দেবীর ১৩ বছরের কন্যা)
(৮) কুমারী কমলা সেনগুপ্তা
(শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের ১২ বছরের মেয়ে)
(৯) অঞ্জলি সেনগুপ্তা ওর্ফে জটু
(শ্রীইন্দ্রকুমারের ৬ বছরের শিশু কন্যা
(১০) শ্রীসন্তোষকুমার সেন (পরিবারের একটি স্নেহাস্পদ কিশোর)

তাঁরা সকলে নৌকা পথে গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণের কথা শ্রীযুক্তা বিরজা সুন্দরী দেবী "নৌকা পথে" নাম দিয়ে লিখেছিলেন। তাঁর লেখাটি নজরুল ইস্‌লামের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যক "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছাপা হয়েছিল। এই লেখা হতে আমরা জানতে পারি যে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২রা আষাঢ় তারিখে তাঁরা দৌলৎপুরে পৌঁছেছিলেন। এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত "আ" হচ্ছেন আলী আকবর খান। তিনি বিরজা সুন্দরী দেবীদের আনার জন্যে কুমিল্লা গিয়েছিলেন। বিয়ের তারিখ স্থির হয়েছিল ৩রা আষাঢ়।

এখানে আমি মুস্‌লিম বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। তা না হলে ব্যাপারটি অ-মুসলমানদের পক্ষে বোঝা সহজ হবে না। অনেক মুসলমানও ব্যাপারটি ভালো বোঝেন না।

মুস্‌লিম বিবাহ

প্রথমেই পরিষ্কার হওয়া দরকার যে মুস্‌লিম বিবাহ আধ্যাত্মিক বিবাহ নয়। এটা নিতান্তই নারী-পুরুষের মধ্যে একটা চুক্তি বা কন্‌ট্রাক্টের ব্যাপার। ইংরেজিতে যে আমরা 'সিবিল ম্যারিজ' বলি এটা ঠিক তাই। এই কন্‌ট্রাক্টকে আরবী ভাষায় 'আক্‌দ্' বা 'নিকাহ্' বলে। কন্‌ট্রাক্টের একটা পরিবর্ত (আরবী কথা ইবজ বা এওজ) থাকা আবশ্যক। এই পরিবর্ত হচ্ছে নারী-পুরুষের সহবাস, আনন্দলাভ এবং সন্তানোৎপাদনও। কিন্তু সন্তান না জন্মালে বিয়ে বাতিল হয়ে যায় না। বিয়ের কন্‌ট্রাক্ট একটি মজলিসে বসে সাক্ষীদের সামনে করতে হয়। মুস্‌লিম বিবাহে একটা 'মাহর' বা স্ত্রীধন ধার্য হওয়া অপরিহার্য। এটা স্বামীর নিকট হতে স্ত্রী পেয়ে থাকেন। এর অর্ধেক স্ত্রীর পক্ষ হতে দাবী করা মাত্রই দিতে হবে। বাকী অর্ধেক বিবাহ বর্তমান থাকা অবস্থায় শোধ দিতে হবে। কিন্তু বিবাহের কন্‌ট্রাক্ট হওয়ার পরে নারী-পুরুষের সহবাসের ভিতর দিয়ে তার পরিপূর্ণতা লাভ (consummation) না হলে স্ত্রীর স্ত্রীধন প্রাপ্য

হয় না। বিয়েটা যখন কন্‌ট্রাক্টের মারফতে হয় তখন বিবাহ বিচ্ছেদও আছে। কিন্তু এখানে পুরুষরাই প্রবল পক্ষ। তাঁরা যখন খুশী মুখের কথায় বিয়ে বাতিল করে দিতে পারেন। কয়েকটি ব্যাপারে স্ত্রীরা বিয়ে বাতিল করতে পারলেও তার জন্যে তাঁদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। জবরদস্তীর (coercion) ভিতর দিয়ে, তা সে জবরদস্তী পুরুষ কিংবা নারী যার ওপরেই হো'কনা কেন, কোনো বিয়ে হলে সেই বিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই অসিদ্ধ হয়ে যায়।

বিয়ে সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হওয়ার পরে নজরুল ইস্‌লাম আলী আকবর খানদের বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারলে বাঁচত। কিন্তু তার কোনও উপায় ছিল না। সে তখন ওই বাড়ীতে একজন বন্দীর মতো ছিল। কি ঘটছিল তা বাড়ীর মেয়েরা নিশ্চয় টের পাচ্ছিলেন। আলী আকবর খানের কর্ত্রী দিদি তাঁর অসহায়তার কথা নজরুলকে বলেওছিলেন। আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে আলতাফ আলী খান এই ব্যাপারে কি করছিলেন ? বাড়ীর মেয়েদের মতো তিনিও সব কিছু নিশ্চয় বুঝেছিলেন। তিনি কেন চুপ করে থাকলেন ? তাঁরও মনে কি গ্রেজুয়েট ভাইয়ের ভীতি ছিল ? নজরুলের মনের অবস্থা ছিল যে কি করে সে ওই বন্দীদশা হতে বা'র হয়ে পড়বে। শোনা যায় বিয়ের মজ্‌লিসে কাবিনের শর্ত নিয়ে নাকি নানান রকম বিতর্ক হয়েছিল। এমন কথাও নাকি উঠেছিল যে নজরুল তার বৌকে নিয়ে যেতে পারবে না, সে এসে ও-বাড়ীতে থাকতে পারবে। এ কথা যদি সত্য হয় তবে বুঝতে হবে যে নজরুলের মতো ও বাড়ীর লোকদেরও বিয়ে হতে মন উঠে গিয়েছিল। কিন্তু কথাটা আমি নজরুলের মুখে শুনিনি এবং তা সত্য কিনা যাচাই করেও দেখতে পারিনি। বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মারা গেছেন। শ্রীমান সন্তোষকুমার সেন শুনেছি টালিগঞ্জে কোথাও বাড়ী ক'রে আছে। তাকে আমি খুঁজে বার ক'রতে পারিনি। আর কল্যাণীয়া কমলা তো নিশ্চয় বিয়ের মজলিসে বসে নি। মোটের ওপরে, এ কথা সত্য যে

এই সব ব্যাপারে নজরুল সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিল। উদাসীন থাকলে কোনো কনট্রাক্ট হতে পারে না। 'আক্‌দ' হয়েছিল কিনা সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে যে ওই অবস্থায় 'আক্‌দ' হওয়া সিদ্ধ নয়। শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী তাঁর প্রবন্ধে

'আক্‌দ' সম্বন্ধে বিরজাসুন্দরী দেবীর মন্তব্য

লিখেছেন (প্রবন্ধটি নজরুলের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল) যে "বিয়ে তো ত্রিশঙ্কুর মতন ঝুলতে লাগলো মধ্য পথেই এখন আমাদের বিদায়ের পালা।" ৩রা আষাঢ়ের দিবাগত রাত্রে নজরুল বিরজাসুন্দরী দেবীর নিকটে বিদায় নিতে এলো, বলল, "মা, আমি এখনই চলে যাচ্ছি।" ওই অবস্থায় তাকে ফেরানোর কোনো কথাই ওঠে না। নজরুলের মেজাজ সেই রকমের নয়। তিনি বললেন. "তুমি বাইরের লোক, পথঘাট চেন না, এই রাত্রে একলা যাবে কি করে? যাবেই যদি তবে বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে যাও। সে তবু কুমিল্লায় জন্মেছে আর কুমিল্লায় মানুষ হয়েছে, এ দেশের লোকজনকে চেনে। আমাদের সঙ্গে তো উনি থাকলেন।" তাঁর স্বামীর কথা বললেন তিনি। শুধু আষাঢ় মাস তো ছিল না, পূর্ববঙ্গের অতি বৃষ্টির আষাঢ় মাস। পথঘাট গলে গিয়ে কাদাময় হয়ে যায়। সেই কাদা-বিছানো পথে দশ এগারো মাইল পায়ে হেঁটে নজরুল আর বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কুমিল্লায় এসে পৌঁছুলেন ৪ঠা আষাঢ়ের সকাল বেলা। শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী লিখেছেন দৌলৎপুরে তাঁরা তিন দিন ছিলেন। তার মানে, ২রা, ৩রা ও ৪ঠা আষাঢ় এই তিন দিন। ৪ঠা আষাঢ় দিবাগত রাত্রির গভীরে তাঁরা নৌকাপথেই আলী আকবর খানদের বাড়ী ছেড়েছিলেন। বিয়ের বর উঠে চলে গেছেন। এই জন্যে গ্রামের লোকেরা তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে পারেন ভেবে তাঁদের দিনের বেলা রওয়ানা হতে দেওয়া হয়নি। ভোর হওয়া পর্যন্ত আলী আকবর খানের একজন অগ্রজ, (আলতাফ আলী খান নয়) নৌকায় ছিলেন।

নজরুল পায়ে হেঁটে গিয়েছিল ব'লে নিজের জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। সেগুলি বিরজাসুন্দরী দেবীর সঙ্গেই নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সঙ্গে সে সব নিয়েও ছিলেন তিনি। তবে তার ভিতর হতে আলী আকবর খান চিঠি-পত্রগুলি ও অন্যান্য কাগজপত্র বা'র ক'রে নিয়েছিলেন।

নজরুল ইস্‌লামকে সঙ্গে নিয়ে আমি ৮ই জুলাই (১৯২১) তারিখে কুমিল্লা ছেড়েছিলেম। ইতোমধ্যেই নজরুল কুমিল্লায় জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। রেলওয়ে স্টেশনে অনেকেই তাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন। অনুশীলন পার্টির নেতা শ্রীঅতীন্দ্র রায়-চৌধুরীও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। কুমিল্লা স্টেশনেও থার্ড কিংবা ইন্‌টার ক্লাসে চড়া কিছুতেই সম্ভব হলো না। চাঁদপুর পর্যন্ত আমাদের ফাস্ট ক্লাসে যেতে হলো। চাঁদপুর পৌঁছে দেখলাম ষ্টীমার চলে গেছে। হিসাব করে দেখলাম আমাদের টাকাও কম পড়ে যাবে। সেই রাত্রে আমরা চাঁদপুর ডাক বাংলোয় চলে গেলাম। সেই রাত্রেই না, পরের দিন ভোরে সে কথা ঠিক মনে নেই,—আমি কলকাতায় আফ্‌জালুল হক সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম যে টাকা কম পড়ে গেছে। আফ্‌জালুল হক সাহেব যেন চাঁদপুরের ডাক বাংলোর ঠিকানায় কমপক্ষে বারোটি টাকা টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে পাঠিয়ে দেন। ভাগ্য ভালো যে তখন কুমিল্লার আশ্‌রাফ উদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগকে টেলিগ্রাম করলেন যে ডাক বাংলোয় নজরুল ইস্‌লাম ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ রয়েছেন। তাঁদের দয়া ক'রে বারোটি টাকা পৌঁছিয়ে দিন। নাগ মশায়ের তরফ হতে শ্রীকুলচন্দ্র সিংহ রায় এসে আমাদের বারোটি টাকা দিয়ে গেলেন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে রাজবন্দী হয়েছিলেন। পরেও তিনি রাজবন্দী হয়েছেন শুনেছি। তখনকার মতো আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমরা কলকাতা এসে পৌঁছালাম।

এই পত্র কার?

"নজরুল রচনা-সম্ভারের" ২৩৪ পৃষ্ঠায় একখানা পত্র ছাপা হয়েছে। বলা হয়েছে তা নজরুল ইস্‌লামের লেখা। ১৯২১ সালের ২৩শে জুলাই হচ্ছে পত্রখানা লেখার তারিখ। "বাবা শ্বশুর" সম্বোধনের দ্বারা পত্রখানার শুরু, আর

"চির-সত্য স্নেহ-সিক্ত—
নুরু"

স্বাক্ষরের দ্বারা তার শেষ। আমি দেখাব যে নজরুল ইস্‌লামের পক্ষে এই পত্র লেখা সম্ভব ছিল না। তবে, এই পত্র কার?

যাঁরা ঢাকা হতে "নজরুল রচনা-সম্ভার" প্রকাশ করেছেন তাঁরা নজরুল ইস্‌লামের হাতের লেখা চেনেন। নিঃসন্দেহে এই পত্রের লেখাকে নজরুলের হাতের লেখা মনে ক'রেই তাঁরা পুস্তকে তার স্থান দিয়েছেন। তাঁরা তলিয়ে দেখেন নি এই পত্র নজরুল ইস্‌লামের হতে পারে কিনা। প্রথমে আমি পুরো পত্রখানা নীচে তুলে দেব, তারপরে তার যথার্থতা সম্বন্ধে বিচার করব।

কান্দিরপাড়, কুমিল্লা
23 July, 1921
(বিকেল বেলা)

"বাবা শ্বশুর!

আপনাদের এই অসুর জামাই পশুর মতন ব্যবহার ক'রে এসে' যা কিছু কসুর করেছে, তা ক্ষমা করো সকলে, অবশ্য যদি আমার ক্ষমা চাওয়ার অধিকার থাকে। এইটুকু মনে রাখবেন, আমার অন্তর-দেবতা নেহায়েৎ অসহ্য না হয়ে পড়লে আমি কখনো কাউকে ব্যথা দিইনা। যদিও ঘা খেয়ে খেয়ে আমার হৃদয়টাতে ঘাঁটা বুজে' গেছে, তবু সেটার অন্তরতম প্রদেশটা এখনো শিরীষ ফুলের পরাগের মতই কোমল আছে। সেখানে খোঁচা লাগলে আর আমি থাকতে পারিনে। তা ছাড়া, আমিও

আপনাদেরই পাঁচজনের মতন মানুষ, আমার গণ্ডারের চামড়া নয়, কেবল সহ্যগুণটা কিছু বেশী। আমার মান-অপমান সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না বা "কেয়ার" করিনি ব'লে, আমি কখনো এত বড় অপমান সহ্য করিনি, যাতে আমার 'ম্যানলিনেসে' বা পৌরুষে গিয়ে বাজে—যাতে আমাকে কেউ কাপুরুষ হীন ভাবতে পারে। আমি সাধ ক'রে পথের ভিখারী সেজেছি বলে' লোকের পদাঘাত সইবার মতন 'ক্ষুদ্র-আত্মা' অমানুষ হয়ে যাই নি। আপন জনের কাছ হতে পাওয়া অপ্রত্যাশিত এত হীন ঘৃণা, অবহেলা আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। বাবা! আমি মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। দোওয়া করবেন, আমার এ ভুল যেন দু'দিনেই ভেঙে যায়—এ অভিমান যেন চোখের জলে ভেসে যায়।

"বাকী উৎসবের জন্য যত শীগ্‌গীর পারি বন্দোবস্ত করবো। বাড়ীর সকলকে দস্তুরমতো সালাম-দোয়া জানাবেন। অন্যান্য যাদের কথা রাখতে পারিনি, তাদের ক্ষমা করতে বলবেন। তাকেও ক্ষমা করতে বলবেন, যদি এ ক্ষমা চাওয়া ধৃষ্টতা না হয়। আরজ—ইতি।

চির-সত্য স্নেহ-সিক্ত

নুরু"

১৯২১ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে নজরুল ইস্‌লাম যে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে ছিল না, ৮ই জুলাই তারিখের বিকাল বেলা সে যে কলকাতার উদ্দেশে কুমিল্লা ছেড়েছিল একথা "নজরুল রচনা-সম্ভারের" প্রকাশকদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। জানা থাকলে পত্রখানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মনে একটা খটকা বাধত। এই পত্রখানা যাঁর কাছ থেকে তাঁরা পেয়েছিলেন সেই আজীজুল হাকীম সাহেব তাঁদের একই পেশার লোক অর্থাৎ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন

ব'লে তাঁর জন্যে তাঁদের একটা টান থাকা স্বাভাবিক। তাঁকে তাঁরা তো বাধিত করতে চাইবেনই, তার ওপরে একটা অপ্রকাশিত দলীলের প্রথম প্রকাশের তৃপ্তিও তো আছে। আশ্চর্য এই যে পত্রখানা একবার বিশ্লেষণও তাঁরা করলেন না! ১৯২১ সালে যে-যুবতী নজরুল ইস্‌লামের স্ত্রী হতে যাচ্ছিলেন তাঁর প্রায় মধ্য বয়সে কবি আজীজুল হাকীম সাহেবকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। "নজরুল রচনা-সম্ভারে" আমরা দেখতে পাই যে এক সময়ে নজরুল তাঁকে সুধী সমাজের সামনে কিঞ্চিৎ তুলেও ধরেছিল। আজীজুল হাকীম সাহেব ১৯২১ সালের ঘটনার কথা কতটা কি জানতেন তা জানিনে, তিনি কিন্তু খুঁচিয়ে তুললেন এমন সব কথা যা দেশের লোকেরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। তিনি হয়তো ভেবে থাকবেন যে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া পত্রগুলি ছাপিয়ে দিলে তাঁর স্ত্রী দেশের কাছে নির্দোষ ও নিষ্পাপ বিবেচিত হবেন, আর সব দোষ বর্তাবে হতভাগ্য নজরুল ইস্‌লামের ওপরে, তাও আবার এমন এক সময়ে যখন সে সম্বিৎহারা ও রুদ্ধবাক্। কিন্তু দেশের লোকেরা দেখার ও বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন নি! তাঁরা এমন কোনো ফয়সলা শুনিয়ে দেন নি যে নার্গিস বেগম নির্দোষ, আর সব দোষ ছিল নজরুল ইস্‌লামের। কাজেই হাকীম সাহেব খানিকটা জল ঘোলা করেছেন মাত্র। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো দিন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। আরও মর্মান্তিক দুঃখের কথা এই যে তিনি আজ বেঁচেও নেই।

কবি আজীজুল হাকীম ও নার্গিস বেগম

এখন আমি "বাবা শ্বশুর" সম্বোধিত পত্রখানা সম্বন্ধে কিছু বলি। "নজরুল রচনা সম্ভার" নামক পুস্তকে এই পত্র প'ড়ে প্রথম দৃষ্টিতে আমার মনে হয়েছিল যে নজরুলের ভিতরকার অনেক স্ববিরোধিতার এটাও বুঝি একটা নমুনা। তার হাতের লেখা পুস্তকখানার প্রকাশকদের চেনা না থাকলে কিছুতেই আমার মনে

এমন কথা আসত না। কলকাতার "নন্দন" নামক মাসিক পত্রে একটি প্রবন্ধ লেখার সময়ে এই স্ববিরোধিতার কথা বলেও পত্রখানা নজরুলের লেখা হওয়া সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আমি প্রকাশ করেছিলেম। কারণ, ২৩শে জুলাই তারিখে সে কুমিল্লার কান্দির-পাড়ে ছিল না, ছিল কলকাতায়। পরে আমি পত্রখানা খুঁটিয়ে পড়েছি। তখন তারিখের কথা বাদ দিয়েও আমার নিকটে এটা খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পত্রখানা নজরুল ইস্‌লামের লেখাই নয়। সে যে বিয়ের মস্‌লিস হতে উঠে কুমিল্লা চলে গেল তাতে গ্রামবাসীদের ও আত্মীয় কুটুম্বদের নিকটে আলী আকবর খানের অবস্থা খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল। তিনিই নজরুলকে কলকাতা হ'তে সঙ্গে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলেন, তিনিই প্রচার করেছিলেন তার নানান গুণের কথা, তিনিই স্থির করেছিলেন তাঁর ভাগিনেয়ীর সঙ্গে তার বিয়ে। কিন্তু এখন? এখন কেন বিয়ের ক'নে ফেলে বর উঠে চলে গেল? আলী আকবর খানকে একা

নজরুলের নামে পত্র জাল

যুঝতে হচ্ছিল সকলের সঙ্গে। তিনি তো আর সকলের নিকটে বলতে পারেন না যে তাঁর কারণে এবং তাঁর ভাগিনেয়ীর কারণে বর উঠে চলে গেছে। তাই তিনি নানান কৈফিয়ৎ দিচ্ছিলেন। নজরুলের পক্ষেও তাঁকে কথা বলতে হচ্ছিল। যার এত গুণ গেয়েছেন তার বিরুদ্ধে সব কথা কি ক'রে বলা যায়? ভাগ্নীর ও তাঁর নিজের বিচ্যুতির কথা না বলে, নজরুলের সঙ্গে অন্যদের ব্যবহারের ছোট-খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলে সকলের সামনে তিনি তুলে ধরছিলেন। এইভাবে আর কতদিন বিনা হাতিয়ারে লড়া যায়? তাই, দরকার হয়ে পড়ল একটা হাতিয়ারের, তার মানে নজরুলের একখানা পত্রের। জাল না করলে এমন একখানা পত্র পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। তাই, আলী আকবর খান জাল করলেন "বাবা শ্বশুর" মার্কা পত্রখানা।

আমি আগেই বলেছি, ১৯২১ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে

নজরুল ইস্‌লাম কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে ছিল না। ৮ই জুলাই (১৯২১) তারিখে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে কুমিল্লা ছেড়েছিলেম। ২৩শে জুলাই (১৯২১) তারিখে সে ছিল কলকাতায়। ইরানের কবি সাআদী খুব দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। তাই তিনি দেশে দেশে ঘুরে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। তা থেকেই তিনি বলেছেন যে "মিথ্যাবাদীরা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়"। তাঁর এই কথাটি মিথ্যাবাদী আলী আকবর খানের বেলায় সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়ে গেছে। নজরুল ইস্‌লাম যে ২৩শে জুলাই (১৯২১) তারিখে কুমিল্লাতেই ছিল না, পত্র জাল করার সময়ে আলী আকবর খান সেই কথাটিই বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

পত্রখানার ভাষার ওপরে যদি আমরা নজর দিই তা হলে আমরা দেখতে পাই যে পত্রের ভাষা গুরুচণ্ডালী ও অসংলগ্ন। একই সঙ্গে তাতে 'আপনি' আর 'তুমি' ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন— "আপনাদের এই অসুর জামাই পশুর মতন ব্যবহার ক'রে এসে' যা কিছু কসুর করেছে, তা ক্ষমা করো সকলে,……।" এর পরে আছে "আমার অন্তর-দেবতা নেহায়েৎ অসহ্য না হয়ে পড়লে আমি কখনো কাউকে ব্যথা দিই না।" এখানে আমরা কি মানে বুঝব? নজরুলের অন্তর দেবতাই কি তার নিকটে অসহ্য হয়ে পড়েছিল? "ঘা খেয়ে খেয়ে আমার হৃদয়টাতে ঘাঁটা বুজে' গেছে", এটা কি রকম ভাষা? আমাদের কি বুঝতে হবে যে নজরুলের হৃদয়ে আগে হতেই ঘাঁটা পড়েছিল? এখন ঘা খেয়ে খেয়ে তা বুজে গেছে। কোনো মানেই তো বা'র হচ্ছে না এই কথা থেকে। একখানা ছোট্ট পত্রে একই অর্থে 'মত', 'মতন' ও 'মতো' বানান লেখা হয়েছে। একসঙ্গে 'মত' ও 'মতন' লেখা চলতে পারে, কিংবা চলতে পারে 'মতো' ও 'মতন' লেখা। এই তিন রকম বানান পাশাপাশি কেউ লেখেন, এমন কথা তো শুনিনি। 'দোওয়া' শব্দটির

'দোওয়া ও 'দোয়া' এই দু'রকম বানান লেখা হয়েছে। নজরুল ইস্‌লামের ভাষাজ্ঞান কি এতই কম ছিল যে একখানা ছোট্ট চিঠিও সে শুদ্ধ ক'রে লিখতে পারল না?

এর পরে সকলে বিষয়ের অসংলগ্নতার দিকেও একবার নজর দিন। প্রথমে পশুর মতো ব্যবহার করে যে কসুর করেছে তার জন্যে সে ক্ষমা চেয়েছে। তারপরে আছে "আমি কখনো এত বড় অপমান সহ্য করিনি, যাতে আমার 'ম্যানলিনেস' বা পৌরুষে গিয়ে বাজে—যাতে আমাকে কেউ কাপুরুষ হীন ভাবতে পারে।" পদাঘাত সইবার মতন 'ক্ষুদ্র-আত্মা' অমানুষ হয়ে যাইনি।" "আপনজনের কাছ হতে পাওয়া অপ্রত্যাশিত এত হীন ঘৃণা, অবহেলা আমার বুক ভেঙে দিয়েছে।" "আমি মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।" এতসব অভিযোগ করার পরে হঠাৎ সে বলে বসল যে এতক্ষণ সে যা যা বলেছে তার সব কিছুই ভুল।... "দোওয়া করবেন... আমার এ ভুল যেন দু'দিনেই ভেঙে যায়—এ অভিমান যেন চোখের জলে ভেসে যায়।" এই পত্রে অশুদ্ধ ভাষাতো আছেই, এক জায়গার কথার সঙ্গে অন্য জায়গার কথাও খাপ খাচ্ছে না। এত অসংলগ্ন ভাষা কিছুতেই নজরুল ইস্‌লামের হতে পারে না।

যার দরকার হয় সে হাতের লেখা নিজে জাল করে কিংবা কোনো জালিয়াতকে দিয়ে জাল করিয়ে নেয়। জাল দলীলের ভিত্তিতে লোকে আদালতে মোকদ্দমাও ডিক্রী পায়, এটা আমরা দেখেছি। নজরুলের হাতের লেখা বড় বড়। কিন্তু এক অক্ষরের গায়ে অন্য অক্ষর এত ঘন ঘন করে সে বসিয়ে যেত যে তাতে তার অক্ষর বড় হওয়া সত্ত্বেও কম জায়গায় বেশী লেখা ধরত। এই রকম হাতের লেখা জাল করার পক্ষে ভালো। আলী আকবর খান অনেক চেষ্টায় নজরুলের হাতের লেখা জাল করেছেন বটে, তবে তার ভাষা জাল করতে গিয়ে তিনি ধরা পড়ে গেছেন। তার ওপরে আবার তারিখের ভুল তো করেছেনই।

আলী আকবর খানের প্রতি একটা অপরিসীম ঘৃণা বুকে নিয়ে নজরুল ইস্‌লাম দৌলৎপুর গ্রাম ছেড়েছিল। তাঁদের বাড়ীতে যা যা ঘটেছিল তা জানতে পেলে নজরুলের কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীই মত দিতে পারতেন না যে এই মেয়েকে নিয়ে সে সংসার পাতুক। কুমিল্লা হতে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের ২রা আষাঢ় (১৩২৮) তারিখে পৌঁছানোর পরে অতি অল্প সময় হাতে ছিল। এর মধ্যে নজরুল বিরজাসুন্দরী দেবীকে সব কথা খুলে বলতে পারে নি, বলা যায়ওনা। সে বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তকে অবশ্য সব কথা বলতে পেরেছিল। কিন্তু বিরজাসুন্দরী দেবী ওখানে পৌঁছে যা শুনেছিলেন ও বুঝেছিলেন তাতে তাঁর মন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাবতেই পারছিলেন না যে এমন বিয়ে কি করে নজরুলের পক্ষে মঙ্গলময় হতে পারে। শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তাতে তো তাঁর মতে "বিয়ে তো ত্রিশঙ্কুর মতন ঝুলতে লাগলো।" তবুও তিনি দৌলৎপুর হতে কুমিল্লায় ফিরে এসে (নজরুল আর বীরেন সেনের দু'দিন পরে তাঁরা ফিরেছিলেন নৌকায়) নজরুলকে তার মনের সঙ্গে আর একবার বোঝাপড়া করে দেখতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, সব ঘটনা ভুলে গিয়ে নজরুল কি আর একবার তার মন ওই মেয়েটির দিকে ফেরাতে পারে না? উত্তরে নজরুল দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল যে তার মন আর ও-মুখো হওয়ার নয়। দৌলৎপুরে নজরুল আলী আকবর খান ও তাঁর ভাগিনেয়ীর দ্বারা যেরূপ অপমানিত ও প্রতারিত হয়েছিল সেরূপ অপমান ও প্রতারণার প্রতিশোধে অনেকে খুন পর্যন্ত করে। নজরুল তা করতে যায়নি, তবে বিশেষ করে আলী আকবর খানের প্রতি মনে একটা তীব্র ঘৃণা নিয়ে সে দৌলৎপুর ছেড়েছিল। ৬ই জুলাই (১৯২১) তারিখে কুমিল্লা পৌঁছে তার সেই ঘৃণার গভীরতা আমি উপলব্ধি করেছি। কলকাতা ফেরার পরে তার অন্য বন্ধুরাও তা বুঝেছেন। এই অবস্থায় ওই রকম একখানা পত্র আলী আকবর খানকে লেখা নজরুলের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। ২৩শে

জুলাই (১৯২১) তারিখে নজরুল যে কুমিল্লা ছিল না সেই কথাটা বাদ দিয়েই আমি বলছি। "নজরুল রচনা-সম্ভারের" প্রকাশকদের কেউ কেউ তো দৌলতপুরে ঘটিত সব ঘটনার কথা শুনেছেন। তার পরে পত্রখানার ওই অসংলগ্ন ও স্ববিরোধী ভাষা! তা সত্ত্বেও তাঁরা হুট্‌ করে বইতে পত্রখানা ছেপে দিলেন! তাঁরা পূর্ববঙ্গে থাকেন,—ঢাকায় থাকেন। খোঁজ নিলেই অনেক কিছু তাঁরা জানতে পারতেন। নজরুলকে নিয়ে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে সেই যে আমি কলকাতা ফিরেছি তারপরে কোনো দিন আমি তার নিকটে নার্গিস ও আলী আকবর খানের নামও নিইনি। পুরনো ক্ষত আমি খোঁচাতে চাই নি। ১৯২১ সালের পরে ঘটিত এমন কিছু কিছু ঘটনার কথা আমি জানি যে-সব কথা নজরুলকে আমি কোনো দিন বলিনি। সে-সব কথা নজরুলও হয়তো জেনে চুপ করে ছিল। কিন্তু আমি যা জানি তা নিয়ে কাগজের ওপরে কালির আঁচড় কাটা যায় না।

নজরুল ইস্‌লামের চরিত্রে অনেক বিচ্যুতি ছিল। সে সব বিচ্যুতির আলোচনা-সমালোচনা সকলে করুন। আলী আকবর খান সম্বন্ধে বন্ধুদের সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর অনেক কিছু সে নিজে জানা সত্ত্বেও সে যে তাঁর জালে জড়িয়ে পড়ল তার সেই ভুলের জন্যেও তাকে সকলে সমালোচনা করুন। কিন্তু যারা তাকে পেছন হতে ছুরি মেরেছিল, যারা হেনেছিল তার ওপরে অপমান, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম আঘাত, তাদের পক্ষ নেওয়া কেন? এটা সম্বিৎহারা কবির ওপরে অবিচার নয় কি?

আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ীর সঙ্গে নজরুলের বিয়ে হবে ঠিক হওয়ার পরে শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করে নজরুলকে লিখেছিল:

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আশঙ্কা

"যখন আজ তোর চিঠিতে জানলুম যে, তুই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তাকে বরণ করে নিয়েছিস, তখন অবশ্য আমার কোনো দুঃখ নেই। তবে একটা কথা, তোর

বয়েস আমাদের চাইতে ঢের কম, অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ, feeling-এর দিকটা অসম্ভব রকম বেশী। কাজেই ভয় হয় যে, হয়ত বা দু'টা জীবনই ব্যর্থ হয়।"

(নজরুল রচনা-সম্ভার, ২৩১ পৃষ্ঠা)

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের এই আশঙ্কা বিশ্রী রকম বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। নজরুল পবিত্রকে লিখেছিল যে "এক অচেনা পল্লী-বালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হয়ে পড়েছি, যা কোন নারীর কাছে কখনও হইনি।" (ঐ, ২৩১ পৃষ্ঠা)। সত্যই, নজরুল অনুভূতির বন্যায় এমনভাবে ভেসে গিয়েছিল যে সে বুঝতেই পারল না, নার্গিস তাকে সত্যই ভালোবাসছিলেন, না, ভালোবাসার অভিনয় করছিলেন। আসলে মামা ও ভাগিনেয়ী দু'জনাই ছিলেন যথাক্রমে অভিনেতা ও অভিনেত্রী। নজরুল মনে করেছিল, অর্থাৎ আমাদের বলেছিল যে তাকে সঙ্গে নিয়ে দৌলৎপুরে যাওয়ার পরেই আলী আকবর খানের প্রথম নজর তাঁর দরিদ্র যুবতী ভাগিনেয়ীর ওপরে পড়েছিল। নজরুলের এই ধারণা ছিল ভুল। সব কিছু বিবেচনা ক'রে আমার এই ধারণা হয়েছে যে আগে হতেই ভাগিনেয়ীর ওপরে খান সাহেবের নজর ছিল এবং তা ছিল বলেই তিনি নজরুল ইস্‌লামকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রকাশন ভবন স্থাপনের যে পরিকল্পনা আগে হতেই তাঁর মনে ছিল সেই পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা উদ্যোগ হিসাবেই তিনি নজরুলকে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভাগিনেয়ী যে নজরুলের প্রেমে পড়লেন এবং নব নামকরণে নার্গিস হলেন, এ সবই খান সাহেবের পরিকল্পনা মাফিক হয়েছিল। নজরুল প্রায় পুরোপুরি খান সাহেবের হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছিল। বিয়ের পরে খান সাহেবের প্ল্যান অনুসারে নজরুলকে সংসার পাততে হত কলকাতা হতে দূরে, অর্থাৎ ঢাকায়। নজরুলের তো হাতে পয়সা ছিল না। তাকে পুরোপুরিই আলী আকবর খানের ওপরে নির্ভর

করতে হত। তাঁর প্ল্যান দ্রুত সফল হতে যাচ্ছিল, কিন্তু ধৈর্য ও সংযম হারিয়ে তিনি নিজেই তা ভণ্ডুল ক'রে দিলেন। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েও আমার মতে অনেক কম খেসারৎ দিয়েই নজরুল নিষ্কৃতি পেয়ে গেল।

নার্গিসকে নজরুল তার ভালোবাসা উজাড় ক'রে দিয়েছিল, আর মামার শিক্ষামতো নার্গিস করছিলেন ভালোবাসার অভিনয়।

আরও পত্রের কথা

নার্গিস বেগমকে লেখা নজরুল ইস্‌লামের একখানা পত্রও "নজরুল রচনা-সম্ভারে" ছাপা হয়েছে। এই পত্রখানা নজরুল লিখেছিল দৌলৎপুরের ঘটনার পনের বছর পরে এবং নার্গিসের একখানা পত্রের উত্তরে। তাতে নজরুল নার্গিসকে জানিয়েছে "তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক।" এই পত্রখানা যিনি বা যাঁরা কাগজে ছাপাতে দিয়েছিলেন তিনি বা তাঁরা নার্গিস বেগমের পত্রও সেই সঙ্গে ছাপতে দিলেন না কেন? তার প্রতিলিপিও নিশ্চয় তাঁদের সংগ্রহশালায় ছিল।

নার্গিসকে লেখা নজরুলের প্রথম ও শেষ পত্র

১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই তারিখে ১০৬, আপার চিৎপুর রোড, গ্রামোফোন রিহার্সাল রুম, কলকাতা, হতে নজরুল এই পত্র নার্গিস বেগমকে লিখেছিল এবং লিখেছিল নার্গিস বেগমের একখানা পত্রের উত্তরে। মনে হচ্ছে নার্গিস লিখেছিলেন যে তাঁর নিকটে নজরুল একজন 'দূত' প্রেরণ করেছিল। সেই অছিলাতেই নার্গিস পত্র লিখেছিলেন। পনের বছর পরে হঠাৎ একখানা পত্র লেখার উপলক্ষের প্রয়োজন ছিল। নার্গিস বেগম নজরুলের 'দূত' পাঠানোর একটা বানানো কথাকেই নজরুলকে তাঁর পত্র লেখার অছিলা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। উত্তরে নজরুল লিখেছে—

"আমি কখনো কোনো 'দূত' প্রেরণ করিনি তোমার কাছে। আমাদের মাঝে যে অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, তার 'সেতু' কোন লোক ত নয়ই—স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেন কিনা সন্দেহ।..তোমার উপর আমার কোন অশ্রদ্ধাও নেই, কোন অধিকারও নেই আবার বলছি।........ ....তুমি রূপবতী, বিত্তশালিনী, গুণবতী, কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে—তুমি যদি স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমি কোন্ অধিকারে তোমায় বারণ করব—বা অদেশ দিব? নিষ্ঠুরা নিয়তি সমস্ত অধিকার থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন।"

তার পরে নজরুল লিখেছে :

"আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবীমূর্তির মত আমার হৃদয়-বেদীতে অনন্ত প্রেম অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ-দেবীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদী-পীঠ।"

এখানেই নজরুল আসল কথা বলেছে। সে কবি মানুষ। কবিত্বময় ভাষায় কথাটা বলেছে। আমরা, যারা কবি নয়, আমাদের নিকটে ব্যাপারটা যে ভাবে ফুটে উঠেছে তা আমি আগেই বলেছি। অর্থাৎ নজরুল ইস্‌লাম নার্গিসকে একান্তভাবে ভালোবেসেছিল। কোনো খাদ ছিল না সেই ভালোবাসায়। আর, নার্গিস প্রথমে ভালোবাসার অভিনয় করেছিলেন। পরে সেই অভিনয়ের পর্দাও তুলে দিয়ে নিজের যে মূর্তি তিনি দেখিয়েছিলেন আশাহত নজরুল তার সামনে আর তিষ্ঠতে পারেনি। ১৯২১ সালের ৬ই জুলাই তারিখের রাত্রে এই কথাই নজরুল আমায় বলেছিল। পনের বছর পরে যে পত্র নার্গিসকে সে লিখেছিল তারও মানে এই-ই দাঁড়ায়। নার্গিস নজরুলকে বিদায় করেছিলেন,

যদিও তাঁর মামার পরিকল্পনার দিক হতে সেটা তাঁরা চাইছিলেন না। তাঁরা ভাবতেই পারেননি নজরুল এভাবে চলে যেতে পারে। বোধ হয় তাঁরা নজরুলকে বড় অসহায় প্রাণী ভাবতেন। কিন্তু সে দিন নজরুল যদি চলে না যেত তবে তার পৌরুষ প্রচণ্ড ঘা খেত। নার্গিস সংক্রান্ত কথা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কাউকে সে বলেনি। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সেদিন নজরুলের বড় বন্ধু ছিলেন। আমার স্মৃতি ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্যে আমি কিছুদিন আগে শ্রীশৈলজানন্দকে জিজ্ঞাসা করেও জেনেছি যে তাঁর নিকটেও নজরুল এই একই কথা বলেছিল।

আলোচ্য পত্রখানা যে-ভাবে "নববর্ষার নবঘন-সিক্ত প্রভাত", "আষাঢ়ে বারিধারার প্লাবন", "বিরহী যক্ষের বাণী", "কালিদাসের যুগ", "রেবা নদীর তীর" ও "মালবিকার দেশ" প্রভৃতি দিয়ে আরম্ভ হয়েছে তাতে আশ্চর্য নয় যে পুরো পত্রখানা কেউ কেউ আর পড়বেন না। ওইটুকু পড়েই তাঁরা হয়তো বিরহী নজরুলকেই কল্পনা করতে থাকবেন। কিন্তু পুরো পত্রখানা গভীর মনোযোগ সহকারে সকলের পড়া উচিত।

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ও অন্যান্য পত্র

এখন বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র সম্বন্ধে এবং বিবাহ উপলক্ষে লেখা আরও পত্রের সম্বন্ধে আমায় কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হবে। "নজরুল রচনা-সম্ভারে" আমার লেখা তিনখানা পত্রের উল্লেখ আছে। দু'খানা পত্র নজরুলকে লেখা, আর একখানা পত্র আলী আকবর খানকে লেখা। এর মধ্যে ১৫ই জুন (১৯২১) তারিখে নজরুলকে লেখা পত্রখানা তার হাতে পৌঁছালেও পৌঁছাতে পারত, তবে আমার মনে হয় পৌঁছায়নি। ১৮ই বা ১৯শে জুন তারিখে সে দৌলৎপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আলী আকবর খানকে পত্রখানা ২১শে জুন তারিখে লেখা হয়েছিল। নজরুল তখন কুমিল্লায়। আলী আকবর খান তা পেয়েছিলেন, নজরুল তা দেখেনি। একখানা গোপনীয় পত্র একান্তভাবে

নজরুলেরই জন্যে আমি লিখেছিলেম ২৬শে জুন (১৯২১) তারিখে। দৌলৎপুরের বিয়ে বাড়ীতে যা ঘটে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেম বলেই আমি গোপনীয় পত্রখানা লিখেছিলেম। এই পত্র আলী আকবর খানের হাতে পড়েছিল। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে আমি অভিভাবকসুলভ ভাষায় পত্রখানা লিখেছিলেম। কিন্তু লিখে যে অন্যায় করেছি সে কথা অবশ্য কেউ বলেন নি, অন্তত আমার নজরে তা পড়েনি। তবে, আমি নজরুলের অভিভাবক ছিলাম না। আমি ছিলাম তার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি একান্তভাবে কামনা করতাম যে সাহিত্য জগতে সে প্রতিষ্ঠিত হোক। তা ছাড়া, তার সঙ্গে আমার ছিল রাজনীতিক সংস্রব। নজরুলের অভিভাবক কারা ছিলেন তা জানিনে। কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার তার অভিভাবক হতে চেয়েছিলেন। ফল ভালো হয় নি। আলী আকবর খানও তার অভিভাবক হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। একটি বিষাদময় পরিণতিতে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

আলী আকবর খানের নিমন্ত্রণ পত্র যে নজরুল মুসাবিদা ক'রে দিয়েছিল তা পত্রের ভাষা হতে বোঝা গিয়েছিল। সেই পত্রে নজরুলকে "মুস্‌লিম রবীন্দ্রনাথ" বলাতে ও তার পিতা কাজী ফকীর আহ্‌মদকে চুরুলিয়ার আয়মাদার বলাতে আমি আপত্তি করে-ছিলেম। আমার মনে হয় "মুস্‌লিম রবীন্দ্রনাথ" কথাটা পত্রখানা ছাপানোর সময়ে আলী আকবর খানই ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। দৌলৎপুরে তো প্রেস ছিল না। পত্রখানা নজরুলের অগোচরে কুমিল্লাতেই ছাপা হয়েছিল, হয়তো কুমিল্লাতেই তা ডাকে দেওয়াও হয়েছিল। নজরুল ইস্‌লাম রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ছিল, কিন্তু অনুকারী ছিল না। আমি দেখেছি শুধু মুস্‌লিম কবি হিসাবে পরিচিত হওয়া সে পসন্দও করত না। তাই, কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না যে আলী আকবর খানের পত্র হলেও মুসাবিদা করার সময়ে সে নিজের হাতে নিজেকে "মুস্‌লিম রবীন্দ্রনাথ" লিখেছিল।

ছাপা হওয়ার পরে সে আপত্তি করেছিল কিনা জানিনে। আপত্তি করলেও তখন হয়তো কিছু করা যেত না। আমার পত্র কখনও নজরুলের হাতে পৌঁছয়নি। সে কোনো দিন জানেনি যে ওই রকম একখানা পত্র আমি তাকে লিখেছিলেম। তার বাবা কাজী ফকীর আহ্‌মদ সাহেবকে চুরুলিয়ার আয়মাদার ব'লে সে নিজেই লিখেছিল ব'লে আমার বিশ্বাস। এই কথাটার প্রকৃত অর্থ নজরুল ধরতে পারেনি। চুরুলিয়ার কাজীরা আয়মা সম্পত্তির মালিক ছিলেন। নজরুলের বাবারও কিছু আয়মা সম্পত্তি ছিল। সে সব তিনি খুইয়েছিলেন। মরবার সময় আয়মাদার তিনি ছিলেন না। আমরা কথায় কথায় বলি অমুক ব্যক্তি অমুক গ্রামের জমীদার। কিন্তু এই জমীদারী নীলাম হয়ে গেলে কিংবা হাতছাড়া হয়ে গেলে আমরা সেই ব্যক্তিকে সেই গ্রামের জমীদার আর বলিনা, বলাও যায় না। তবে, জমীদারী হতে যে পদবী তিনি পেয়েছেন, যেমন চৌধুরী, রায় ও মজুমদার প্রভৃতি তিনি তা ব্যবহার করতে থাকেন। আয়মা সম্পত্তির ব্যাপারেও তাই। যাঁর আয়মা সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেছে তিনি আর আয়মাদার নন। পদবীটা থেকে যায়। ফকীর আহ্‌মদ সাহেবের কাজী পদবী তো ছিলই, তাঁর পুত্র, পৌত্রাদিরও সেই পদবীই রয়েছে।

বিবাহ বিচ্ছেদ?

আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে"তে (২৮ পৃষ্ঠা) লিখেছিলেম :—

> "১৯২১ সালের কথা। নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে একটি মুস্‌লিম মেয়ের অক্‌দ্ (বিয়ের চুক্তি) হয়েছিল এবং পরক্ষণেই সে-বিয়ে ভেঙেও গিয়েছিল।"

আমার লেখার আগে জনাব আজ্‌হার উদ্দীন খান লিখিত

"বাংলা সাহিত্যে নজরুল" নামক পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ)। বইখানা বা'র হওয়ার পরে তিনি তা বা'র হওয়ার খবর দিয়ে আমায় একখানা পত্র লিখেছিলেন এবং উপহার স্বরূপ একখানা বইও আমায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপরে একদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন। এই অল্পক্ষণের ভিতরে তাঁর লিখিত কয়েকটি ঘটনার প্রতি আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নজরুলের প্রথম বিয়ে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :—

> "দৌলৎপুরে থাকাকালে নজরুল আলি আকবর খাঁ নামক জনৈক সাহিত্যিকের ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের এই বিবাহিত জীবন কোন অজ্ঞাত কারণে সুখের হয়নি—উভয় পক্ষের হয়ত এমন কোন ত্রুটি ছিল যাতে বাধ্য হয়ে উভয়ে উভয়কেই মাসখানেকের মধ্যে ত্যাগ করেন।"

এই বিয়ে ঘটিত সব ব্যাপার তো খোলাখুলি বলা যায় না। তবুও আমি খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটি তাঁকে বুঝিয়েছিলেম এবং বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে তা বাতিল হয়ে গিয়েছিল সেই কথাই আমি তাঁকে বলেছিলেম। আমি মনে করেছিলেম, আর কেউ না বুঝুন, মুসলমানের ছেলে আজহার উদ্দীন খান তা বুঝবেন। আরও তাঁকে আমি খবর দিয়েছিলেম যে আক্‌দ আলী আকবর খানের ভাগ্নীর সঙ্গে হয়েছিল, ভগ্নীর সঙ্গে নয়। তিনি আমায় জানিয়েছিলেন যে তিনি "ভাগ্নী"ই লিখেছিলেন। যাঁরা প্রুফ পড়েছেন তাঁরা "ভগ্নী" করে দিয়েছেন। অল্পক্ষণের ভিতরে খুব কম ঘটনার প্রতি আমি আজ্‌হার উদ্দীন খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেম। পুস্তকের তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণেও (২৬ পৃষ্ঠা) আমি দেখতে পাচ্ছি যে দৌলৎপুরে নজরুলের বিয়ের ব্যাপারে আজ্‌হার উদ্দীন সাহেব তাঁর পুস্তকের প্রথম সংস্করণের কথাগুলিই অবিকল রেখে দিয়েছেন,

নজরুলের প্রথম বিয়ে সম্বন্ধে আজ্‌হার উদ্দীন খান্

কেবল 'ভগ্নী'র জায়গায় ভাগ্নী করেছেন। অথচ, নজরুলদের দৌলৎপুরের বিবাহিত জীবন একেবারেই শূন্যস্থানে ছিল। মাস-খানেক যে নজরুলদের বিবাহিত জীবন টিকেছিল একথা তিনি কোথায় পেলেন ?

নজরুল ইস্‌লামের জীবন নিয়ে লেখা পুস্তকগুলির মধ্যে আমি ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত লিখিত "নজরুল চরিত মানস"কেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে থাকি। কিন্তু ডক্টর গুপ্তও দু'খানা পত্র খুঁটিয়ে না পড়ে ভুল মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তার পরে তিনি নজরুলের বিবাহ-বিচ্ছেদের কথারও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন :—

> "তিনি [নজরুল] যখন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে ৩/৪-সি নম্বর তালতলা লেনের বাড়িতে ছিলেন সেই সময় তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।" (নজরুল চরিত মানস, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ভারতী সংস্করণ ; ৮৩ পৃষ্ঠা)।

আমি জানিনা, ডক্টর গুপ্ত এই খবর কোথায় পেয়েছেন। প্রথমেই আমি বলে রাখতে চাই যে নজরুলদের কোনো বিবাহ-বিচ্ছেদ আমাদের ৩/৪-সি, তালতলা লেনের বাড়ীতে হয়নি। এই কথাটার ভিতরে কোনো সত্য নেই। ৩রা আষাঢ় (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) তারিখে দৌলৎপুর গ্রামে আলী-আকবর খানের ভাগিনেয়ী নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের যে আক্‌দ হয়েছিল মুস্‌লিম আইন অনুসারে তা সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল্‌ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই, বিবাহ-বিচ্ছেদের কোনো কথাই ওঠে না। এই সম্বন্ধে আমি এই অধ্যায়েই বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বিয়ে সম্বন্ধে মুস্‌লিম আইনের বক্তব্যও খানিকটা বলার চেষ্টা আমি করেছি। বলা বাহুল্য যে নজরুলদের বিয়েটা মুস্‌লিম মতে হয়েছিল। নজরুলের লেখা ব'লে কথিত "বাবা শ্বশুর" সম্বোধিত পত্রখানার ও নার্গিসকে লেখা তার পত্রোত্তরের উপরে ডক্টর গুপ্ত অকারণে বেশী জোর দিয়েছেন। "বাবা শ্বশুর" সম্বোধিত পত্রখানা লেখার তারিখের কথা না জেনেও তিনি যদি পত্রখানা

খুঁটিয়ে পড়তেন তবে বুঝতে পারতেন যে ওখানা জালকরা পত্র।

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের ভুল ধারণা

আর, নজরুল যে দৌলৎপুরের বিয়ের পনের বছর পরে নার্গিসকে পত্র লিখেছিল সে কি তার নিজের প্রেরণায় লিখেছিল সেই পত্র? এই পত্র যে নার্গিসের পত্রের উত্তর সেই কথার উল্লেখ ডক্টর গুপ্তের পুস্তকে নেই। কেউ যদি আর কোনো কিছু না পড়ে শুধু "নজরুল চরিত মানস" পড়েন তবে তিনি বুঝবেন যে নজরুলই আপন প্রেরণায় সেই পত্র-খানা নার্গিস বেগমকে লিখেছিল। তিনি পুরো পত্রখানাও তাঁর পুস্তকে উদ্ধৃত করেননি, করেছেন শুধু তার কবিত্বময় অংশটি। যদি আমাদের তালতলার বাড়ীতে বিবাহ-বিচ্ছেদই ঘটে থাকবে তবে নার্গিস বেগম তার পনের বছর পরে আবার বিয়ে করার অনুমতি চাইতে যাবেন কেন? তা ছাড়া পত্রে যে নজরুল লিখল—"তুমি রূপবতী, বিত্তশালিনী, গুণবতী, কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে—তুমি যদি স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।" এই অংশটি ডক্টর গুপ্তের নজর এড়ালো কেন? খুব কি সম্মানের ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে?

৩/৪-সি, তালতলা লেনের বাড়ীতে যা ঘটেছিল তা অন্য ব্যাপার। ৮ই জুলাই (১৯২১) নজরুল ইস্‌লামকে সঙ্গে নিয়ে আমি কুমিল্লা ছেড়েছিলাম। যতটা মনে পড়ে আমরা কলকাতা পৌঁছেছিলাম

আলী আকবর খানের সমঝোতার চেষ্টা—৩।৪-সি, তালতলা লেনে আগমন

১০ই জুলাই সন্ধ্যার পরে। তার কয়েকদিন পরে নজরুল আর আমি তালতলা লেনের বাড়ীতে থাকতে যাই। আগস্ট মাসে, না, সেপ্টেম্বর মাসে ঠিক মনে নেই—খুব সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসেই হবে, একদিন সন্ধ্যার পরে আলী আকবর খান আমাদের ওই বাড়ীতে আসেন। নজরুল আর আমি বাড়ীতেই ছিলেম। আরও দু' একজন কে কে উপস্থিত ছিলেন সেখানে। নজরুলের স্বভাব ছিল যে নূতন কেউ এলে চেঁচিয়ে আনন্দ প্রকাশ

ক'রে সে তাঁকে গ্রহণ করত। পাশের ঘরের লোকও বুঝতে পারতেন যে নজরুলের নিকটে বুঝি কেউ এলেন। সে দিন আলী আকবর খানের আসাতে নজরুল কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ তো করলই না, একবার বসতেও বলল না তাঁকে। শক্ত হ'য়ে চুপ ক'রে বসে থাকল সে। আজ এত কাল পরে "বাবা শ্বশুর" মার্কা পত্রখানা প'ড়ে আমার মনে হচ্ছে যে আলী আকবর খান যাঁদের সেই পত্র দেখিয়েছিলেন তাঁদের একজন কেউ যদি সেই সন্ধ্যায় আমাদের তালতলা লেনের বাসায় উপস্থিত থাকতেন তবে বুঝতে পারতেন কী চীজ এই আলী আকবর খান! যা'ক, খান সাহেব নিজেই নজরুলের পাশে তখ্‌ৎপোশের ওপরে বসলেন। তাঁর হাতে বেশ পুরু একতাড়া দশ টাকার নোট ছিল। খুব নীচু আওয়াজে কথা বলছিলেন তিনি, আর নোটের তাড়াটি নাড়ছিলেন-চাড়ছিলেন। অকারণে নাড়াচাড়ার মতো দেখালেও আসলে ভাবখানা ছিল এই যে এই নোটের তাড়াটি তোমারই জন্যে।

সেই সন্ধ্যায় আলী আকবর খান এসেছিলেন একটা সমঝতার জন্যে। তিনি বলতে এসেছিলেন, যা ঘটে গেছে তার সবকিছু ভুলে যা'ক নজরুল। আবার সে ফিরে চলুক এবং গ্রহণ করুক তার ভাগিনেয়ীকে। তখন নজরুল যদি প্রস্তাব করত যে দৌলৎপুর গ্রামে সে আর ফিরে যাবে না, নার্গিসকে কলকাতায় নিয়ে এসে সব কিছু ব্যবস্থা করা হো'ক, তাইতেই খান সাহেব খুশী হয়ে রাজী হতেন এবং টাকাও খরচ করতেন। তিনি লোক সমাজে মুখ দেখাতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে নজরুলকে পেছন হতে ছুরি মেরেছিলেন এবং তাঁর ভাগিনেয়ীও তাতে সহায়িকা ছিলেন। নজরুলের মন ভেঙে এমনভাবে দু' টুক্‌রো হয়ে গিয়েছিল যে তাতে জোড়া লাগানোর কোনো সম্ভাবনা আর ছিল না। আলী আকবর খানের "বাবা শ্বশুর" মার্কা জাল পত্রখানা পড়ে অনেকের মনেই ভুল-ধারণা জন্মেছে যে নজরুলের

"মনে অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক ঘটনাটির জন্যে এক বিশেষ বেদনাবোধ এবং সেই সঙ্গে একটা মিটমাট করে নেওয়ার মনোভাব ছিল।" (নজরুল চরিত মানস, ২য় সংস্করণ, ৮৩ পৃষ্ঠা)। আসলে কিন্তু মিটমাট করার প্রচেষ্টা আলী আকবর খানই করেছিলেন। তাঁর ভাগিনেয়ী যে বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন তা ডক্টর গুপ্ত কি করে বুঝতে পারলেন? তিনি তাঁকে যা বুঝেছেন তা ঠিক তিনি ছিলেন না। তাঁর মামার ইচ্ছাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। নজরুলকে চোখের জলে বিদায় ক'রে দিয়ে আবার তাঁরা ফেরাতে এসেছিলেন, কিন্তু সুবিধাজনক কোনো ছল খুঁজে পাননি।

আলী আকবর খান কিছুতেই নজরুলের মন টলাতে পারেন নি। তাই খুব নিরাশ হয়েই সেদিন তিনি ফিরে গেলেন। যাওয়ার সময়ে আমাকে তিনি বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়ে দিয়ে গেলেন। তার মোদ্দা কথা ছিল এই যে আমার মেয়ে আছে, ভাইপো-ভাইঝিরা আছে,—তাদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দেওয়াই আমার কর্তব্য। নজরুলের পেছনে শক্তিক্ষয় করা উচিত নয় আমার। যেন নজরুলের কোনো শক্তিই ছিল না! দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি নিজেকে তুলে ধরে দেখালেন যে নজরুল তাকে কি রকম ঠকিয়েছে। কি হয়েছে-না হয়েছে তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে আমি রাস্তার আবহাওয়া দূষিত করতে চাইনি। কোনো জওয়াব না দিয়ে সব কথা আমি শুধু শুনেই গেলাম। তারপরে আলী আকবর খান চলে গেলেন। ১৯১৩ সালে ঢাকায় রমনার মাঠে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, আর শেষ দেখা হয়েছিল ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার তালতলা লেনে।

আলী আকবর খানের বাড়ীর নিষ্পাপ শিশুরা যে নজরুলকে 'ভাইজান' ডাকত সে কথা আমি আগে বলেছি। ঠিকানা জোগাড় ক'রে তারা কিন্তু বড় বড় হরফে ও আঁকাবাঁকা হরফে নজরুলকে পত্র লিখেই যাচ্ছিল। তাদের পত্র পেলে নজরুল কিঞ্চিৎ বিচলিত

হয়ে পড়ত, বলত এদের প্রত্যেকটি শিশুর ভিতরে কবি ও সাহিত্যিক লুকিয়ে আছে।

১৯২১ সালের জুন মাসে নজরুলের মনে আলী আকবর খানের প্রতি যে-ঘৃণা জমাট বেঁধেছিল সেই ঘৃণা আর কোনো দিন তার মন হতে সরে যায়নি। তিনি যেদিন নজরুলকে নোটের তাড়া দেখিয়ে গেলেন তার পরের দিনই নজরুল শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীকে পত্র লিখে জানাল যে—“মা, আলী আকবর খান আমাকে নোটের তাড়া দেখিয়ে গেল।” আলী আকবর খানকে নজরুল যেমন ঘৃণা করত তেমন ঘৃণা হয় তো সে নার্গিসকে করত না। তাঁকে সে যে সত্যই ভালোবেসেছিল এটা বোঝা যায়। কিন্তু এটাও বুঝতে হবে যে নার্গিসকে নিয়েই ত আলী আকবর খানের ওপরে নজরুলের এই ঘৃণা। কোনো অবস্থাতেই নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের মিলন আর সম্ভব ছিল না।

এখন আমি এই অধ্যায়টি শেষ করি।

আঘাতের পরে

আমি আগেই বলেছি ১৯২০ সালে ফৌজ হতে ফিরে আসার পরে নজরুল ইস্‌লামের কলমের মুখ হতে কবিতার বান ডেকেছিল। দৌলৎপুর গ্রামে সে আলী আকবর খান আর তাঁর ভাগিনেয়ী নার্গিসের হাত হতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে কুমিল্লায় ফেরার পরে আবার তার কবিতার বান ডাকল। দৈনিক 'নবযুগ' ছেড়ে দিয়ে সে দেওঘরে গিয়েছিল। তখন তার কলম হতে উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো কবিতা বা'র হয়নি। তারপরে কলকাতায় ফিরে এসেও সে কবিতা লিখতে পারে নি। আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলৎপুর গ্রামে গিয়ে সে নার্গিসের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও সেখানে বসে সে কবিতা লেখেনি। আমি শুনেছি, প্রেমে পড়লে নাকি কবিরা অজস্র কবিতা লেখেন। নজরুলের বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ এই ভেবে চিন্তিতও হয়ে পড়েছিলেন যে তার কবিতা থেমে গেল নাকি? কিন্তু মামা ও ভাগিনেয়ীর দ্বারা আহত, প্রতারিত ও অপমানিত হয়ে কুমিল্লায় ফিরে এসে ছয় মাস প্রায় না লেখার পরে তার কলম হতে আবার কবিতা বইতে লাগল ঠিক যেন পাগলা-ঝোরার সোঁতের মতো। কিন্তু হতাশ প্রেমিকের কবিতা নয়,—নূতন জীবনের গান, শিরদাঁড়া সোজা ক'রে উঠে দাঁড়ানোর গান। আমার মনে হয় গীতি কবিতার লেখাও নজরুল সেই প্রথম শুরু করল।

৬ই জুলাই (১৯২১) তারিখে কুমিল্লা পৌঁছানোর পরে নজরুল আমার হাতে ছোট-বড় সাইজের কাগজে লেখা অনেকগুলি কবিতা

দিল। শ্রীবারেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত আমায় বললেন মনোযোগ দিয়ে কবিতাগুলি পড়ুন। প'ড়ে আমি বুঝলাম আবার নজরুলের কবিতার বান ডাকল। আমি তো তেমন কোনো কাব্য-রসিক লোক নয় যে সব কবিতার নাম আমার মনে থাকবে, তবুও যেগুলির নাম মনে আছে সেগুলির কথাই আমি এখানে বলব। বৃদ্ধ হয়েছি। হয়তো স্মৃতি আমার সঙ্গে প্রতারণাও করতে পারে।

সেই গান ও কবিতাগুলির মধ্যে ছিল :—

এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।
অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলোরে করতে ছেদন ?
শিকল দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি শঙ্খ কে বাজায়॥
মরা মায়ের লাশ কাঁধে ঐ অভিমানী ভা'য়ে ভা'য়ে
বুক-ভরা আজ কাঁদন কেঁদে আন্‌ল মরণ-পারের মায়ে।
পণ করেছে এবার সবাই
পর-দ্বারে আর যাব না ভাই !
মুক্তি সে ত নিজের প্রাণে, নাই ভিখারীর প্রার্থনায়॥

* * *

ইস্‌রাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকের ঈশান-বিষাণ সাথে,
প্রলয়-রাগে নয়রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে !
পথের বাধা স্নেহের মায়ায়
পায় দ'লে আয় পায় দ'লে আয় !
রোদন কিসের ?—আজ যে বোধন !
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয়রে আয়॥

(বিষের বাঁশী)

১৯২১ সালের বিরাট অসহযোগ আন্দোলন তখন চলেছিল। তারই জন্যে এই গানটি লেখার অনুরোধ নজরুলকে করা হয়েছিল।

সে শুধু গানটি যে লিখেছিল তা নয়, মিছিলে ও মিটিং-এ গানটি সে গেয়েওছিল। আমি যতটা মনে করতে পারছি, গান্ধীজীকে লক্ষ্য ক'রে এটাই ছিল নজরুলের লেখা প্রথম গান। খানিকটা গান্ধীবাদও এই গানের ভিতরে আছে। যেমন, "মুক্তি সে ত নিজের প্রাণে, নাই ভিখারীর প্রার্থনায়"। কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশও বলেছিলেন যে স্বরাজ? সে তো প্রাণে প্রাণে অনুভব করার ব্যাপার। সংজ্ঞা দিয়ে তা কি কখনও বোঝানো যায়? এই গানটির সুর কিন্তু লোকের প্রাণে পৌঁছেছিল। ৭ই জুলাই (১৯২১) তারিখে রথযাত্রার সময়ে নজরুল আর আমি যখন শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে রথ দেখতে রাস্তায় বা'র হয়েছিলেম তখন নজরুলকে দেখিয়ে একটি ছোট ছেলে আর একটি ছোট ছেলেকে বলছিল, "দেখ্, ওই পাগল পথিক যাচ্ছে।"

নজরুল ইস্‌লামের সেই কবিতাগুলির ভিতরে তার বিখ্যাত "মরণ-বরণ" গানটিও ছিল। এইভাবে গানটির শুরু :—

এস এস এস ওগো মরণ!
এই মরণ-ভীতু মানুষ মেষের ভয় করগো হরণ॥

না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাদের বুকের' পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভরা চরণ॥

দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশী,
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি'!
কাঁধে পিঠে কাঁদে যথা শিকল জুতোর ছাপ
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ!

সে দেশের বুকে শ্মশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক্ নব নামকরণ ॥

* * *

জ্ঞান বুড়ো ঐ বলছে জীবন মায়া,
নাশ কর ঐ ভীরুর কায়া ছায়া !
মুক্তিদাতা মরণ ! এসে কাল বোশেখীর বেশে,
মরার আগেই মরলো যারা নাও তাদেরে এসে,
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা মরার দেশে
তাই শিকল বিকল মাগছে তোমার মরণ-হরণ-শরণ ॥

(বিষের বাঁশী)

আমার যতটা মনে পড়ছে সেই সময়ে কুমিল্লাতেই নজরুল ইস্‌লাম 'বন্দী-বন্দনা'ও রচনা করেছিল। তার শুরু এই রকম :—

আজি রক্ত-নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দি-শৃঙ্খলে,
কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া তলে ॥

ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে গুরু শিলা, হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর সত্য জ্যোতি শিখা,
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোল,
সে ধ্বনি উঠে রণি' ত্রিংশ কোটি ঐ
মানব-কল্লোলে ॥

ওরা দুপায়ে দ'লে গেল মরণ-শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কারে,

বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা মাঝে পশেছে রে
উতল কলরোলে ॥

* * *

কোরাস :—

জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয়-হর ! মুক্তি-কামী জয় !
স্বাধীন-চিত জয় ! জয় হে !
জয় হে ! জয় হে ! জয় হে !
(বিষের বাঁশী)

দৌলৎপুর গ্রাম হতে এত বড় একটা প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার পরে যে নজরুল ইস্‌লাম কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে এসেছিল তার এতটুকুও রেশ এসকল গানে ও কবিতায় নেই। এইভাবে তার কবিতার স্রোত বয়ে চলেছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। ডিসেম্বর মাসে সে তার সুবিখ্যাত "বিদ্রোহী" কবিতাটি রচনা করেছিল। এই কবিতাটি সম্বন্ধে মোহিতলাল ও নজরুল ইস্‌লামকে নিয়ে যে অধ্যায়টি আমি লিখব তাতে বিশেষভাবে আলোচনা করব। নার্গিস বেগমকে লেখা পত্রে নজরুল লিখেছে যে—"তুমি এই আগুনের পরশ-মাণিক না দিলে আমি অগ্নি-বীণা বাজাতে পারতাম না—আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।" এই বিবৃতিতে কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি আছে। "অগ্নি-বীণা"র অনেক কবিতা ১৯২০ সালে লেখা। কোনো কিছুকে অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নেওয়াও ঠিক নয়। আসল কথা হচ্ছে এই যে প্রায় ছয় মাস নজরুলের বীণা থেমে ছিল। দৌলৎপুর গ্রামে পাওয়া আঘাতের পরে সেই বীণা আবার বেজে উঠেছিল। বীণা বাজাবার শক্তি তো নজরুলের ভিতরে ছিলই।

সেবারে নজরুল কুমিল্লাতে শুধু দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানই লেখেনি, লিখেছিল বেশ কয়েকটি গীতি কবিতাও। তার কিছু নমুনা আমি এখানে দিচ্ছি :—

দুপুর অভিসার

যাস কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে ?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?
সাঁজ ভেবে তুই ভর-দুপুরেই দুকুল নাচায়ে
পুকুর পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাসনে একা হাবা ছুঁড়ি
অফুট জবা চাঁপা কুঁড়ি তুই !
ওলো রঙ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগ-বধূ ফাগ থাবা থাবা ছুঁড়ি
পিকবধূ সব টিটকিরি দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি
আহা বউল-ব্যাকুল মহুল তরুর সরস ঐ শাখে ॥

* * *

(পূবের হাওয়া)

এই কবিতা কাগজে পড়ে কবি শ্রীকালিদাস রায় নাকি মন্তব্য করেছিলেন যে "নজরুল দেখছি আমাদের আর কবিতা লিখতে দেবে না। সে 'অলস বৈশাখে'র সঙ্গে 'কলস কই কাঁখে'র মিল জুড়েছে।" অবশ্য একথা আমি তাঁর মুখ হতে শুনিনি। কথাটা শুনে এসে একজন যে বলেছিলেন তাই শুনেছিলেম মাত্র। কবি শ্রীকালিদাস রায়কে আমি দেখেছি। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না।

রেশমী ডোর

তোরা কোথা হতে কেমনে এসে মণি-মালার মত আমার কণ্ঠে জড়ালি ?
আমার পথিক জীবন এমন ক'রে ঘরের মায়ায় মুগ্ধ করে
বাঁধন পরালি ॥

আমায় বাঁধতে যারা এসেছিল গরব করে, হেসে,
তারা হার মেনে হায় বিদায় নিল কেঁদে
তোরা কেমন করে ছোট্ট বুকের একটু ভালোবেসে
ক্ষীণ কচি বাহুর রেশমী ডোরে ফেললি আমায় বেঁধে।
আহা চলতে গেলে পায়ে জড়াস
না না বলে ঘাড়টি নাড়াস,
কেন ঘর-ছাড়াকে এমন করে ঘরের ক্ষুধা স্নেহের সুধা
মনে পড়ালি ? ॥

* * *

(পূবের হাওয়া)

এই কবিতাটি শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ীর ছোটদের নিয়ে লেখা।

পুলক

ওই সরষে ফুলে লুটালো কার হলুদরাঙা উত্তরী।
ঐ উত্তরী বায় গো আকাশ গাঙে পাল তুলে যায়
নীল সে পরীর দূর তরী ॥

তার অবুঝ বীণের সবুজ-সুরে
মাঠের নাটে পুলক পুরে,
ঐ গহন বনের পথটি ঘুরে বাজিয়ে বাঁশী আসছে দূরে
কচিপাতা দূত ওরি ॥

* * *

(পূবের হাওয়া)

নজরুলের দৌলৎপুর হতে ফিরে আসার পরে এবং আমার কুমিল্লা পৌঁছানোর (৬ই জুলাই, ১৯২১) আগে সে আরও অনেকগুলি কবিতা লিখেছিল। তার মধ্যে দু'টি কবিতার কথা আমি এখানে বলব। এই কবিতা দু'টির সমস্ত কথা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর, নজরুল শুধু সেই কথাগুলি ছন্দে গেঁথেছে। তার একটি কবিতার নাম 'অভিমানিনী'। শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরীর একটি মেয়ে ছিল খুব অভিমানিনী। অসুখে সে মারা যায়। মরবার কিছুক্ষণ আগেও সে অভিমান করে কথা বন্ধ করেছিল। সেই অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে।

অভিমানিনী

ওরে অভিমানিনী !
এমন করে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনি।
পথ ভুলে তুই আমার ঘরে দু'দিন এসেছিলি,
সকল-সহা ! সকল সয়ে কেবল হেসেছিলি !
হেলায় বিদায় দিনু যারে
ভেবেছিনু ভুলবো তারে হায় !
আহা ভোলা কি তা যায় ?
ওরে হারা-মণি ! এখন কাঁদি দিবস-যামিনী ॥

* * *

(পূবের হাওয়া)

স্নেহাতুর

[নজরুলকে নিয়েই বিরজাসুন্দরী দেবীর কথাগুলি। সে যে তাঁকে মা ডেকেছিল সে-কথা আগেই আমি বলেছি।]

এমন করে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালী।
কেরে ও তুই কেরে, আহা ব্যথার সুরেরে, এমন
চেনা স্বরেরে,—

আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের পরেরে,—
কোন পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ভাঙালি !!

* * *

(পূবের হাওয়া)

নজরুল দৌলৎপুর গ্রাম হতে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় পৌঁছেছিল ৪ঠা আষাঢ় (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) সকাল বেলা। খ্রীস্টীয় মাসের হিসাবে সেটা ছিল সম্ভবত ১৮ই জুন (১৯২১)। আমি কুমিল্লা পৌঁছেছিলেম ৬ই জুলাই (১৯২১) সকাল বেলা। সে দিন সে কোনো কবিতা লেখেনি। মধ্যখানে সতের দিন সময় মাত্র সে পেয়েছিল। এই সতের দিনে সে এত বেশী সংখ্যায় গান ও কবিতা লিখেছিল যে ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আমি শুধু অল্প ক'টির কথাই এখানে উল্লেখ করেছি। 'পূবের হাওয়া'য় ও আরও কোনো কোনো পুস্তকে মুদ্রিত অনেক গান ও কবিতা নজরুল সে সময়ে কুমিল্লাতেই রচনা করেছিল। তা-ছাড়া সে মিটিং-এ ও মিছিলেও যোগ দিয়েছে।

ভাঙার গান

নজরুল ইস্‌লাম তার "ভাঙার গান" কবিতাটি লিখেছিল ১৯২১ সালের জুলাই মাসে, যে সে কুমিল্লা হতে ফিরে এসেছিল তার কিছুদিন পরে। সে ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীতে বসে কবিতাটি রচনা করেছিল, না, ৩/৪-সি, তালতলা লেনের বাড়ীতে বসে, তা আমি এখন মনে করতে পারছিনে। আমার সামনেই দাশ পরিবারের শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ "বাঙ্গলার কথা"র জন্যে একটি কবিতা চাইতে এসেছিলেন। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁকে কবিতার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন জেলে। শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশের সঙ্গে নজরুলের এবং আমাদেরও

পরিচয় হয়েছিল যতটা মনে পড়ে "উপাসনা" আফিসের মারফতে। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট্ পেয়েছিলেন। নজরুলের কাছে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। এই পরিচয় আছে বলেই শ্রীসুকুমাররঞ্জনকে বাসন্তী দেবী কবিতার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজেও নজরুলকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন নজরুল যদি তাঁর ওখানে একদিন খেতে যায় তো খুবই ভালো হয়। সুকুমাররঞ্জন নাকি বাসন্তী দেবীকে বলেছিলেন যে—"কাজী বড় লোকের বাড়ীতে খেতে আসবে কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখব।" মোটের ওপরে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নজরুল তখনই কবিতা লেখা শুরু করে দিল। সুকুমাররঞ্জন আর আমি আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে নজরুল আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার সেই মুহূর্তে রচিত কবিতাটি আমাদের পড়ে শোনাতে লাগল :—

[গান]

(১)

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট
রক্তজমাট
শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'!

(২)

গাজনের বাজনা বাজা !
কে মালিক ? কে সে রাজা ?
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে ?
হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পরবে ফাঁসি ?
সর্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে ?

(৩)

ওরে ও পাগলা ভোলা
দে রে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলা
জোরছে ধ'রে হেঁচকা টানে !
মার হাঁক হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক্ ওরে ডাক্
মৃত্যুকে ডাক্ জীবন পানে !

(৪)

নাচে ঐ কাল-বোশেখী,
কাটাবি কাল ব'সে কি ?
দে'রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি' !
লাথি মার্, ভাঙ্‌রে তালা !
যত সব বন্দী-শালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি !

এই কবিতা "বাঙ্গালার কথা"য় ছাপা হয়েছিল। আমি যদি ভু'লে না গিয়ে থাকি, তবে এরই জন্যে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর ছয় মাসের সাজা হয়েছিল। নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের এটা সময় ছিল। শরীরের বল প্রয়োগের দিক হতে শুধু নিরুপদ্রব হলে চলবে না, নিরুপদ্রব হতে হবে কথাতে ও চিন্তাতেও। আর লেখাতেও যে হতে হবে সেটা তো বলাই বাহুল্য। এই যুগে লেখা নজরুলের সংগ্রামশীল কবিতাগুলিকে তো কোনো প্রকারেই নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের কবিতা বলা যায় না,—"ভাঙার গান"কে তো নয়ই। অথচ, এই আন্দোলনের বন্দীদের ছবি মনে করেই নজরুল "ভাঙার গান" লিখেছিল। নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের মহান নেতা দেশবন্ধু শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের কাগজে কবিতাটি ছাপা হলো, আর তার জন্যে তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী জেলে গেলেন।

নজরুল বাসন্তী দেবীর ওখানে খেতে অবশ্য গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি তাকে স্নেহ করতে লাগলেন। দেশবন্ধু দাশ জেল হতে বা'র হয়ে আসার পরে তাঁরও গভীর স্নেহ নজরুল লাভ করেছিল। এই জন্যেই তাঁর মৃত্যুর পরে সে এত সব গান ও কবিতা লিখেছিল।

কুমিল্লায় যে-সব কবিতা ও গান নজরুল আমায় পড়তে দিয়েছিল তার সবগুলিই প্রথমে বিভিন্ন কাগজে ছাপা হয়েছিল, তার পরে ছাপা হয়েছে একের বেশী পুস্তকে। স্মৃতি থেকে বলা বড় কঠিন কাজ। কুমিল্লায় লেখা যে-সকল কবিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহও আমার মনে জেগেছে সে-সবের কথা আমি এখানে বলি নি।

জুলাই (১৯২১) মাসে কুমিল্লা হতে ফেরার পরে এবং ডিসেম্বর (১৯২১) এর আগে নজরুল ইস্‌লাম তার বহু বিখ্যাত কবিতা রচনা করেছে। কিন্তু আমি শুধু "ভাঙার গানে"র কথাই এখানে উল্লেখ করেছি।

"কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট"

দিয়ে "ভাঙার গান" কবিতাটি শুরু করার কারণেই বোধ হয় কেউ কেউ লিখেছেন যে এই কবিতাটি হুগলী জেলে লেখা হয়েছিল। কেননা, হুগলী জেলেই নজরুল জেলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। ওপরে আমি যা লিখেছি তা থেকে সকলেই বুঝতে পারবেন যে আসল ঘটনা তা নয়। কবিতাটি নজরুল লিখেছিল ১৯২১ সালে, আর হুগলী জেলে সে অনশন ধর্মঘট করেছিল ১৯২৩ সালে।

ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ আর বেঁচে নেই।

কবিতা রচনার বিশেষ উপলক্ষ

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে নজরুল ইস্‌লাম কিছু কিছু কবিতা লিখেছে। এই রকম কোনো কোনো কবিতা রচনার উপলক্ষ এখনও আমার মনে আছে। সেই কবিতাগুলির কথাই আমি এখানে লিখব। সকলেই জানেন একটি গানের দ্বারা নজরুল ইস্‌লাম তার "অগ্নি-বীণা" "ভাঙা বাঙলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর" শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'শ্রীচরণারবিন্দে' উৎসর্গ করেছে। প্রথমে আমি সেই গানটি এখানে তুলে দেব। তার পরে গানটির রচনার বিষয়ে কয়েকটি কথা বলব।

অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।
তাই ত তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে॥
দহন বনের গহন-চারী—
হায় ঋষি-কোন বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আনলে বারি
অগ্নি-মরুর মাঝে।
সর্বনাশা কোন্ বাঁশী সে বুঝতে পারিনা যে॥

দুর্বাসা হে! রুদ্র তড়িত হান্‌ছিলে বৈশাখে
হঠাৎ সে কার শুন্‌লে বেণু কদম্বের ঐ শাখে।

বজ্রে তোমার বাজল বাঁশী,
বহ্নি হ'ল কান্না-হাসি,
সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী
মন সরেনা কাজে
তোমার নয়ন-ঝুরা অগ্নি-সুরেও রক্ত-শিখা রাজে।

"অগ্নি-বীণা"র প্রকাশ কাল ১৯২২ সালের অক্টোবর মাস। ওই মাসের ২৫শে তারিখে তা সরকারী দফ্‌তরে রেজিস্ট্রী হওয়ার জন্যে পৌঁছেছিল। পুস্তক ছাপা হওয়ার পরে তা সরকারী দফ্‌তরে পাঠানো তখন বাধ্যতামূলক ছিল। সাধারণত কোনো পুস্তক যদি কবিতাতে উৎসর্গ করা হয় তবে সেই কবিতা পুস্তক প্রকাশের সময়ে রচিত হয়। কিন্তু 'অগ্নি-বীণা'র উৎসর্গের গানটি রচিত হয়েছিল ১৯২০ সালে। এর পেছনে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে।

তখন আমরা 'নবযুগ' কাগজ বা'র করছি, আর থাকছি ৮।এ, টার্নার স্ট্রীটে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষেরা থাকতেন শ্যামবাজারের মোহনলাল স্ট্রীটে। তাঁদের সাপ্তাহিক 'বিজলী'ও প্রকাশিত হত ওই ঠিকানা হ'তেই। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের (তখনও দেশবন্ধু হন নি) মাসিক কাগজ "নারায়ণে"র পরিচালনার ভারও ছিল শ্রীবারীন ঘোষেদের হাতে। নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে তাঁদের তখনও ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি। কিন্তু তাঁরা নজরুলের "বাঁধন-হারা" হতে (তখন মোস্‌লেম ভারতে" ছাপা হচ্ছিল) ছোট ছোট অংশ "নারায়ণে" তুলে দিয়ে তার ওপরে ভালো মন্তব্য লিখতেন। "আদি পুরোহিত' ও "সাগ্নিক বীর"রূপে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের ওপরে নজরুলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তার ওপরে, তাঁরা তার লেখা সম্বন্ধে ভালো কথা বলছিলেন। এই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে নজরুলের আগ্রহ খুব বেড়ে যায়। সে তখন ছন্দে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে একখানা ছোট্ট পত্র লেখে। ১৯২০ সালের এই

ছন্দোবদ্ধ পত্রখানাই হচ্ছে ১৯২২ সালে মুদ্রিত "অগ্নি-বীণা"র উৎসর্গের গান।

আন্দামানে থাকার সময়ে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ বৈষ্ণব কবিতা লিখতেন। সেই কবিতাগুলিই তাঁর মুক্তি পাওয়ার পরে "দ্বীপান্তরের বাঁশী" নামে প্রকাশিত হয়। তারই কথা নজরুল ইস্‌লাম তার গানে উল্লেখ করেছে। বারীন ঘোষের মতো একজন বিপ্লবী বৈষ্ণব কবিতা রচনা করবেন এটা তার ভালো লাগে নি। তবুও সে তাঁর ওপরে শ্রদ্ধা হারায় নি। মুক্তি পাওয়ার পরে সামনা-সামনি বসে শ্রীবারীন ঘোষ লোকেদের সঙ্গে চমৎকার কথা বলতেন বটে, কিন্তু কোনো রকম সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি আর ছিলেন না। আসলে রাজনীতি তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন। তাঁর দাদা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের আধ্যাত্মিক পন্থা তিনি অবলম্বন করেছিলেন।

বারীন্দ্রকুমারকে লেখা নজরুলের ছন্দোবদ্ধ পত্রখানা তাঁর নিকটে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। বারীন্দ্রকুমার

শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নজরুল ইস্‌লামের মুখোমুখী পরিচয়

এই পত্র পড়ে নাকি বলেছিলেন—"নজরুল আমায় গাল দিল নাকি?" এই পত্র পাঠানোর পরেই নজরুল ভাবল যে এবারে সোজাসুজি বারীন ঘোষেদের বাড়ীতে চলে যাওয়া যায়। তাঁদের সঙ্গে, বিশেষ করে বারীন ঘোষের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহে নজরুল অধীর হয়ে পড়েছিল। তাই, একদিন সন্ধ্যার পরে সে মোহনলাল স্ট্রীটে গেল। কাকে সঙ্গে নিয়েছিল সে কথা আমার এখন মনে নেই। নজরুল ফিরে এসে আমাকে যা বলেছিল সেই কথাই আমি বলছি। নজরুলরা যখন বারীন ঘোষেদের বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছাল, তখন দেখা গেল যে তাঁদের নীচের ঘরে আলো জ্বলছে, সেখানে যে কথাবার্তা হচ্ছে তারও আওয়াজ নজরুলরা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু যেই বাড়ীর লোকেরা

টের পেলেন যে বাইরের লোক আসছেন অমনি আলো বুজে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ভিতর হতে দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। অনেক লোক অসময়ে এসে অকারণে সময় নষ্ট করতেন বলে বারীন ঘোষেরা এই কায়দা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই ব্যবস্থা নজরুলের ওপরে কাজ করবে কেন? সে এমন হৈ-হল্লা ও চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে তৎক্ষণাৎ ঘরে আলো জ্বলে উঠল এবং দরজাও খুলে গেল। মোহনলাল স্ট্রীটের লোকেরা টের পেলেন যে "বিজলী" আফিসে সে-রাত্রে কেউ এসেছেন বটে। নজরুল যে জায়গাতেই যেত সে-জায়গাকেই সে হাসিতে গানে ও চেঁচিয়ে মাতিয়ে তুলত। মনে হত যেন সে জায়গার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বারীন বাবুদের সঙ্গে নজরুলের এই যে পরিচয় হলো সেই পরিচয় হৃদ্যতায় পরিণত হলো। এই হৃদ্যতা বরাবর বজায় ছিল।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে নজরুলের দেখা

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার "বিজলী অফিসে কাজ করতেন। তাঁর সঙ্গে সেই রাত্রেই নজরুলের প্রথম পরিচয় হলো। নজরুল গান তো গাইলই, শ্রীনলিনীকান্ত সরকারও গান গাইলেন। তাঁদের এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হলো,—সাময়িক বন্ধুত্বে নয়, স্থায়ী বন্ধুত্বে।

খুকী ও কাঠবেরালি

"খুকী ও কাঠবেরালি" নজরুলের একটি শিশু কবিতা। তার "ঝিঙেফুল" নামক পুস্তকে কবিতাটি ছাপা হয়েছে। এর রচনার জায়গা কুমিল্লা। তবে, দৌলতপুর হতে কুমিল্লায় ফিরে এসে সে কবিতাটি লিখেছিল, কিংবা তার পরের বারে লিখেছিল তা আমার মনে নেই। এর রচনার পেছনে যে ঘটনা ঘটেছিল নজরুল তা আমাদের বলেছিল। সে একদিন দেখতে পেল যে শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের শিশু কন্যা জটু (ভালো নাম শ্রীমতী অঞ্জলি সেন) একা

একা কাঠবেরালির সঙ্গে কথা বলছে। তা দেখেই সে কবিতাটি লিখে ফেলে। এই কবিতার 'রাঙা দা' হচ্ছেন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, বৌদি তাঁর স্ত্রী, আর ছোড়দি বীরেন সেনের বোন কমলা দাশগুপ্তা। 'রাঙা দিদি' মানে প্রমীলা সেনগুপ্ত, পরে নজরুল ইস্‌লামের স্ত্রী। 'কাঠবেরালি'র খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি :—

কাঠবেরালি! কাঠবেরালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবিলেবু? লাউ?
বেরাল বাচ্ছা? কুকুর-ছানা? তাও?—

ডাইনী তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি-লেবু সকলগুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস পাটুস চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!

* * *

ইস্ খেয়োনা মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও।
কাঠবেরালি! তুমি আমার ছোড়দি হবে? বৌদি হবে? হুঁ
রাঙাদিদি? তবে একটা পেয়ারা দাওনা! উঃ!

* * *

কথ্য ভাষায় কাঠবেরালি বলা হয়, কাঠবিড়ালী নয়। নজরুলের মূলেও কাঠবেরালি ছিল।

খবর নিয়ে জেনেছি জটু এখন সুবিখ্যাত অধ্যাপকের স্ত্রী এবং কৃতী পুত্রের জননী।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চোখের অতি সরু নাড়ীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছিল। এই জন্যে চোখে তিনি ঝাপসা দেখছিলেন। সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যে তিনি একেবারেই অন্ধ হয়ে যাবেন। এই সময়ে তিনি মনোদুঃখে তাঁর "খাঁচার পাখী" কবিতাটি লেখেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যক (আগস্ট, ১৯২১) "মোস্‌লেম ভারতে" এই কবিতা প্রথম ছাপা হয়েছিল। পুরো কবিতাটি আমি এখানে তুলে দিচ্ছি।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল

খাঁচার পাখী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আজ কি আবার ফুল ধ'রেছে
ডালিম গাছের ডালটীতে ?
উতল হাওয়ায় পালট লাগে
ভরা বুকের পালটীতে !
তোতা সে আজ আতা গাছের
পাতায় পাতায় ফিরছে কি ?
সবুজ শিখার দীপান্বিতা
সকল শাখা ঘিরছে কি ?
ঘেরা-টোপের অন্ধকারে
বন্দী আছি সঙ্গী নেই,
ব্যথার ডালি ব্যর্থ জীবন
ডুবিয়ে দিয়ে সঙ্গীতেই।
অসাড় ডানা ঝাপসা দু'চোখ,
খাচার জীবন একটানা ;
তার মাঝে আজ উঠলো কি ঢেউ ?
দখিন হাওয়া দেয় হানা ?

ঘেরা-টোপের পর্দা কাঁপে,
কাঁপছে আমার সকল গা,
ঝলক দিয়ে ক্ষীর সায়রে
ছুটছে পুলক অ-বল্‌গা!
হঠাৎ কেমন হ'চ্ছে মনে
ফুল ধরেছে সব গাছে,
সবুজ পাতা সার দিয়েছে
এই খাঁচারি খুব কাছে।
ভোরের আলো আজ সকালে
কাদের গালে রং বুলায়?
ফুলের সঙ্গে ফল ধরে কি
ডালিম গাছের ডালগুলায়?
বাতাস যেন ব'দলে গেছে
ব'দলে গেছে মন্তরে,
ঘেরা-টোপের নোঙরা নালে
ডালিম ফুলের রং ধরে।
চোখে আমি ঝাপসা দেখি
আফ্‌সে মরি আফ্‌সোসে,
বল্‌গো তোর বসন্ত কি
জাগল ধরার হৃদ কোষে?
কান্না-কোলে কাঁপছে গলা
কণ্ঠে কেঁপে যাচ্ছে তান,
বল্‌গো তোরা বকুল চাঁপায়
বসন্ত কি মূর্তিমান?

("মোস্‌লেম ভারত", ভাদ্র, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ)

কাজী নজরুল ইস্‌লাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে শ্রদ্ধা করত, ভালোও সে বাসত তাঁকে। "খাঁচার পাখী" কবিতাটি পড়ে তার

মন খুবই ব্যথিত হয়ে উঠল। সে লিখল “দিল দরদী” নাম দিয়ে একটি কবিতা। পরের, অর্থাৎ আশ্বিন মাসের “মোস্‌লেম ভারতে” তার কবিতাটিও ছাপা হলো। এটা বেশ বড় কবিতা। আমি অংশ বিশেষ নীচে তুলে দিচ্ছি।

দিল দরদী

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

কে ভাই তুমি সজল গলায় গাইলে গজল আফ্‌সোসের ?
ফাগুন বনের নিব্‌ল আগুন লাগ্‌ল সেথা ছাপ পোষের।
দর্‌দ্‌-আলুদা কান্না-কাতর ছিন্ন তোমার স্বর শুনে
ইরান মুলুক বিরান হ'ল এমন বাহার মরসুমে।
সিস্তানের ঐ গুল্‌ বাগিচা গুলিস্তান আর বোস্তানে
সোস্ত হয়ে দখিন হাওয়া কাঁদল সে আফ্‌সোস তানে।
এ কোন্‌ যিগর-পস্তানী সুর ? মস্তানী সব ফুল-বালা
ঝুর্‌লো, তাদের লাজুক বুকে বাজলো ব্যথার শূল-জ্বালা।
আবছা মনে পড়ছে, যেদিন শীরাজ-বাগের গুল্‌ ভুলি'
শ্যামল মেয়ের সোহাগ-শ্যামার শ্যাম হলে ভাই বুলবুলি ;
কালো মেয়ের কাজল-চোখের পাগল চাওয়ার ইঙ্গিতে
মস্ত হয়ে কাঁকন চুড়ির কিঙ্কিনী রিণ্‌ঝিম গীতে,
নাচলে দেদার দাদরাতালে, কার্‌ফাতে, সরফর্দাতে,—
হঠাৎ তোমার কাঁপল গলা ‘খাঁচার পাখী’ ‘গর্বা’তে !

*   *   *

মুক্ত আমি পথিক পাখী আনন্দ-গান গাই পথের,
কান্না-হাসির বহ্নি-ঘাতের বক্ষে আমার চিহ্ন ঢের ;
বীণ ছাড়া মোর একলা পথের প্রাণের দোসর অধিক নাই,
কান্না শুনে হাসি আমি, আঘাত আমার পথিক ভাই।

বেদ্‌না ব্যথা নিত্য সাথী তবু ভাই ঐ সিক্ত সুর,
দু'চোখ পু'রে অশ্রু আনে উদাস করে চিত্ত পুর।
ঝাপসা তোমার দু'চোখ শুনে' সুরাখ হ'ল কলজেতে,
নীল পাথারের সাঁতার পানি লাল চোখে ভাই গ'লছে যে!

* * *

বাদশা-কবি! সালাম জানায় বুনো তোমার ছোট্ট ভাই!—
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর যায় ডুবে হায় সব কথাই।
("মোস্‌লেম ভারত," আশ্বিন, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, খ্রীস্টাব্দ, ১৯২১)

এই কবিতাটির উদ্ধৃত অংশ যে "মোসলেম ভারত" হতে নেওয়া তার উল্লেখ করেছি। কিন্তু, "ফণি-মনসা" পুস্তকে শেষ দুই পংক্তি নিম্নলিখিতরূপ আছে :—

বাদশা কবি! সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবি!

'ফণি-মনসা' প্রথম ছাপানোর সময়ে সম্ভবত নজরুল ইস্‌লাম নিজেই এই পরিবর্তন করেছিল। "ফণি-মনসা"র যে-সংস্করণ আমার সামনে আছে তাতে 'দর্‌দ্‌ আলুদা'র জায়গায় 'দর্‌দ্‌-ভেজা' আছে। এই পরিবর্তন কে করেছেন তা জানিনে। তবে, অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় নি। পুস্তকে 'সোস্ত'র স্থলে যে 'দোস্ত' করা হয়েছে সেটা ভুল।

যে সকল কবি ও সাহিত্যিক আমাদের বাসায় কিংবা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে আসতেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের একজন ছিলেন না। নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে তাঁর দেখা হতো অন্য সাহিত্যিক আড্ডায়। কিন্তু "দিল দরদী" সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। নজরুলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি একদিন

আমাদের ৩/৪ সি, তালতলা লেনের বাসায় এলেন। বড় দুর্ভাগ্য যে সেই সময়ে নজরুল বাসায় ছিল না, আমিও ছিলাম না।

১৯২২ সালের জুন মাসের ২৪শে তারিখে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মরেছিলেন। নজরুল ইস্‌লামের "দিল দরদী" রচনার পরে তিনি পুরো এক বছরও বাঁচেন নি। যে-রাত্রে তিনি মারা যান তার পরের ভোরের দৈনিক "সেবক" নামক কাগজে নজরুল একটি ভাবপ্রবণ সম্পাদকীয় লিখেছিল। "সেবক" মাওলানা মুহম্মদ আক্‌রম খানের কাগজ ছিল। কেউ কেউ "দৈনিক মোহাম্মদী"র কথা বলেছেন। একেবারে ভুল তথ্য। "মোহাম্মদী" কখনও দৈনিক কাগজ ছিল না। যা'ক, সেদিন সকালের "সেবকে" সম্পাদকীয় লিখেই নজরুল তৃপ্ত হতে পারল না। সে দিনই সে একটি গানও রচনা করল। কলেজ স্কোয়ারের বৌদ্ধ বিহার হলে কিংবা স্টুডেণ্ট্‌স্ হলে, (এখন ঠিক মনে করতে পারছিনে), সেই সন্ধ্যাতেই একটি শোক-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই সভাতেই নজরুল ইস্‌লাম তার সেদিনের রচিত গানটি গেয়েছিল। এই গানটির কিছু অংশ আমি নীচে তুলে দিলাম :—

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥
চপল চারণ বেণু-বীণে তার
সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,
শেষ গান গাওয়া হ'লনাক আর,
উঠিল চিত্ত দু'লে,
তারি ডাক-নাম ধরে ডাকিল কে যেন অস্ত-তোরণ মূলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

* * *

তার ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির বন্ধন-হারা,
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্তধার

ওসে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি',
অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি'
শেষে শান্তি মাগিল ব্যথা বিদ্রোহী
চিতার অগ্নি-শূলে !

পুনঃ নব-বীণা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে।
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্র চল্লিশ বছরের আয়ু পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে নজরুল ইস্‌লাম 'সত্য কবি' শিরোনাম দিয়ে আরও একটি কবিতা লিখেছিল। 'সত্য-কবি'র আরম্ভ এইরূপ:

অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য সে গেল চ'লে
বীরের মতন মরণ-কারারে চরণের তলে দ'লে।

কিন্তু এই কবিতাটি লেখার সহিত আমার স্মৃতি বিজড়িত নয়। আমি শুধু জানি নজরুলের

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে

রচনার কথা। এটাই প্রথম রচনা। "সত্য-কবি" পরে কোনো সময়ে রচিত হয়েছিল।

পউষ

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে নজরুল তার "পউষ" কবিতাটি রচনা করেছিল। তখন সে কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে বিচারাধীন বন্দী। তখনকার দিনে কিছু সংখ্যক বিচারাধীন বন্দীকে জেলের সামনে সিবিল প্রিজনারদের ছোট্ট জেলে রাখা হতো।

নজরুলকেও সেখানে রাখা হয়েছিল। একদিন অবনী চৌধুরী ও আমি এক সঙ্গে প্রেসিডেন্সী জেলের গেটে গিয়ে কবির সঙ্গে মুলাকাত করার ইচ্ছা জানালাম। তখন তাকে সিবিল প্রিজনার্স জেল হতে জেলের আফিসে আনা হলো। মুলাকাত হলো জানালার জালের এপার-ওপার থেকে। আমরা বাইরে দাঁড়িয়েছিলেম। কথা বলার সময়ে কবি একখানা ছোট্ট কাগজ পাকিয়ে জানালার জালের বড় ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অবনী চৌধুরীর হাতে দেয়। ফিরে আসার সময়ে পথে অবনী চৌধুরী কাগজখানা আমার হাতে দিয়ে বলল—"কবির বড় শীত লেগেছে"। দেখলাম "পউষ" কবিতাটি তাতে লেখা রয়েছে। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফতে "পউষ" "প্রবাসী"তে ছাপা হয়েছিল। কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে আগেই নজরুলের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই, নজরুলের তখন "কার তোয়াক্কা রাখি আর" ভাব। মোহিতলাল তাকে "প্রবাসী"তে লেখা ছাপতে দিতেন না। কবিতাটির শুরু ছিল এই রকম :—

> পউষ এলো গো!
> পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।
> ঐ যে এলো গো—
> কুজ্‌ঝটিকার ঘোমটা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে॥

দারিদ্র্য

নজরুল ইস্‌লাম তখন কৃষ্ণনগরে থাকত, আমি আরও ক'জনের সঙ্গে থাকতাম ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্‌ পার্টির আফিসে—কলকাতার ৩৭, হ্যারিসন রোডে (এখন নাম মহাত্মা গান্ধী রোড)। আমাদের অফিস হতে পটুয়াটোলা লেনে "কল্লোলের" আফিস নিকটে ছিল। একদিন কি কারণে নজরুল কলকাতায় এসে আবার কৃষ্ণনগরে ফিরে

যাচ্ছিল। তার আগে সে একবার আমাদের আফিসে এলো। কলকাতায় আসলে আমাদের আফিসে সে আসতই। যাওয়ার আগে আমার হাতে সে "দারিদ্র্যের" পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে বল্‌ল, "এটা ভাই তুমি 'কল্লোল' অফিসে পৌঁছিয়ে দিও। আমি এবার আর সেখানে যাব না। দিনেশরঞ্জন দাশ মনিঅর্ডারযোগে দশটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। একটি কবিতাও চেয়েছিলেন সেই সঙ্গে। এই কবিতাটি বড় দুঃখে লিখেছি।" বলা বাহুল্য, আমি কবিতাটি "কল্লোল" আফিসে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেম এবং তা ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের (খ্রীস্টীয় হিসাবে ১৯২৬ সালের নবেম্বর মাসের) "কল্লোলে" ছাপাও হয়েছিল। কল্লোলে ছাপা হওয়ার কয়েকদিন আগেই কবিতাটি রচিত হয়েছিল। নজরুলের বহুল প্রশংসিত কবিতাগুলির মধ্যে দারিদ্র্যও একটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কবিতাটিকে বি, এ, ক্লাসের পাঠ্যে স্থান দিয়েছিল।

কবিতাটির প্রথম কয়েক ছত্র এখানে তুলে দিচ্ছি :—

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার।

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ।
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি' কর পান। শূন্য মরুভূমি

হেরি মম কল্প লোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ।

*　　*　　*

অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত

নজরুল ইস্‌লাম ইন্‌টার ন্যাশনাল সঙ্গীতের নাম দিয়েছে অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত। হয়তো সকলে জানেন না যে ইন্‌টার ন্যাশনাল সঙ্গীতের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই গানটির ভিতর দিয়েই মজুরশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা বিশেষ ভাবে ফুটে উঠে। সারা দুনিয়ার মজুরশ্রেণীর মধ্যে যে একটা সঙ্ঘবদ্ধতা আছে তাও প্রকাশ পায় এই গানটির ভিতর দিয়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় এই গানটি গাওয়া হয় একই সুরে। মজুরশ্রেণীর কোনো বিশ্ব সম্মেলনে এই গানটি গাইতে শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। হয়তো চল্লিশটি দেশের লোকেরা চল্লিশটি বিভিন্ন ভাষায় একই সুরে একই সঙ্গে গানটি গেয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে বিভিন্ন ভাষীরা গানটি গাইছেন। প্রথমে একজন ফরাসী মজুর এই গানটি লেখেন। পরে নানান দেশের নানান ভাষায় তর্‌জমা হয়ে গানটি বিশ্বসঙ্গীতে পরিণত হয়।

১৯২৬ সালে আমি নজরুলকে এই গানটি বাঙলায় তর্‌জমা করতে বলি। তার জন্যে গানের একটি ইংরেজি কপি তো তাকে জোগাড় করে দিতে হবে। চেষ্টা করেও আমি এমন একখানা বই জোগাড় করতে পারলাম না যাতে ব্রিটেনের মজুররা যে তর্‌জমাটা গান তা পাওয়া যায়। আমেরিকার তর্‌জমাটি পাওয়া গেল আপ্‌টন সিংক্লেয়ারের হেল্‌ (Hell : a Verse Drama) নামক নাটিকায়। ব্রিটেনে গাওয়া তর্‌জমার সঙ্গে দু'টি কিংবা তিনটি শব্দের শুধু তফাৎ। তাতে মানে বদলায় নি, সুর তো নয়ই। আমাদের কেউ তখন

ইনটার-ন্যাশনাল সঙ্গীতের সুর জানতেন না, নজরুলও জানত না। নজরুল আমায় বলল—"এর স্বরলিপি (নোটেশন্) জোগাড় করে দাও। তা হলে তা যন্ত্রে বাজিয়ে সেই সুরের চৌহদ্দীর ভিতরে গানটি আমি তর্জমা করে দেব।" কিন্তু আমাদের কেউ দিতে পারলেন না এই নোটেশন। শেষে নজরুল একদিন আমাদের আফিসে (৩৭, হ্যারিসন রোডে) আসতেই আমি তাকে বললাম—"নোটেশন ছাড়াই তুমি গানটির অনুবাদ করে দাও। প্রথমে একবার তা "গণবাণী"তে ছাপতে দিই, তারপরে দেখা যাবে কি করা যায়।" তখনই সেখানে বসেই সে গানটির অনুবাদ করে দিল। বাঙলা ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ তো বটেই, আমার বিশ্বাস ভারতীয় ভাষাগুলিতে যতসব অনুবাদ হয়েছে সে-সবেরও সেরা। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দী অনুবাদ দেখেছি, তাঁর মনগড়া কথায় তা ভরা। নজরুলের অনুবাদে তার মনগড়া কথা নেই। তর্জমা করার পরে নজরুল আবারও আমাদের বলে দিল যে তার পরেও যদি আমরা নোটেশন জোগাড় করে দিই তবে সে গানে সুর-সংযোগ করে দেবে। কিন্তু নোটেশন আমরা আর জোগাড় করতে পারলাম না। ১৯২৭ সালে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপ যাওয়ার পরে তাঁকে একটা ছাপানো নোটেশন পাঠানোর জন্যে লিখেছিলেম। তিনি তখন মস্কোতেও ছিলেন। অনায়াসেই আমাদের তা পাঠাতে পারতেন। তা না করে তিনি পাঠালেন তাঁর নিজের একটি বাঙলা অনুবাদ। এটাও আমরা "গণবাণী"তে ছেপেছিলেম। নজরুল কিন্তু তার তর্জমায় সুর-সংযোগ করার সুযোগ আর পায় নি। ১৯২৯ সালে ফিলিপ স্প্রাট যখন বললেন যে তিনিই স্বরলিপি তৈয়ার করে দিবেন (ফিলিপ স্প্রাট গান জানতেন) তখন আমরা তো বহু বৎসরের জন্যে জেলে চলে গেলাম।

নজরুল ইস্‌লামের পুরো তর্জমাটিই আমি এখানে তুলে দিচ্ছি :

অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত

জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী, উঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত ॥

যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত ॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার !
ভেদি দৈত্য-কারা
আয় সর্বহারা !
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত ॥

কোরাস্‌ :—
নব ভিত্তি পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে !
শোন্‌ অত্যাচারী ! শোন্‌রে সঞ্চয়ী !
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী ॥
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ !
এই "অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি" রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥

কলিকাতা (গণবাণী, ২১শে এপ্রিল, ১৯২৭)
১ বৈশাখ, ১৩৩৪

সাপ্তাহিক "গণবাণী"তে ছাপানোর জন্যেই যে নজরুল এই আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের অনুবাদ করেছিল সে কথা আগে আমি বলেছি। "গণবাণী" হ'তে নিয়ে নজরুল গানটি তার "ফণি-মনসা"তে ছাপে, বর্মন পবলিশিং হাউসের প্রকাশিত "ফণি-মনসা"য়। তা থেকে তার "কবিতা-সংগ্রহ" "সঞ্চিতা"তে তা উদ্ধৃত হয়। "সঞ্চিতা"ও প্রথমে বর্মন পবলিশিং বা'র করেছিল। তার পরে তো দেখছি ভাট্টা, পুনিয়া হতে শ্রীমতী বিজলী দেবী তা প্রকাশ ক'রে আসছেন। স্বত্বের অধিকারিণীও তিনি। কলকাতার ডি. এম. লাইব্রেরী তার পরিবেশক। "সঞ্চিতা"র অষ্টম মুদ্রণ হতে এই গানটির "কোরাস" অংশটি এখানে তুলে দিচ্ছি :—

কোরাস্ :

"নব ভিত্তি' পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!
শোন্ অত্যাচারী! শোন রে সঞ্চয়ী।
ছিনু সর্বহারা, এই সংগ্রাম-মাঝ
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ।
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!
এই "অন্তরন্যাশনাল সংহতি"রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত॥ (১২০ পৃষ্ঠা)

"গণবাণী"তে গানটি যেমন ছাপা হয়েছিল ঠিক তেমনই আমি ওপরে তুলে দিয়েছি। তার সঙ্গে "সঞ্চিতা"র এই অংশটি মিলিয়ে পড়লে সকলে বুঝতে পারবেন কী বিশ্রী ধরনের ভুল করা হয়েছে। এই পুস্তকের ত্রয়োদশ মুদ্রণও আমি খুলে দেখলাম। তাতে দেখতে পাচ্ছি এই ভুল শোধরাতে গিয়ে আবার নূতন ভুল করা হয়েছে। এই ত্রয়োদশ মুদ্রণ হতেও আমি কোরাস অংশটি তুলে দিচ্ছি :—

"কোরাস্ :

নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে !
শোন্ অত্যাচারী ! শোন্ রে সঞ্চয়ী !
ছিনু সর্বহারা, হব' সর্বজয়ী !
এই সংগ্রাম-মাঝ,
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ,
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ !
এই 'অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥" (১১৮ পৃষ্ঠা)

"সঞ্চিতা"র অষ্টম মুদ্রণ হয়েছিল ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে, আর ত্রয়োদশ মুদ্রণ হয়েছে ১৩৭১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। ইচ্ছা করলে "সঞ্চিতা"র প্রকাশিকা তাঁর ত্রয়োদশ মুদ্রণে অন্তত "অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত"টি নির্ভুল করতে পারতেন। কারণ, পুরো গানটিই আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে"তে তুলে দিয়েছিলেম। আমার বইখানা ১৩৬৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু শ্রীমতী বিজলী দেবীর কথাই বা বলি কেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে কবির পুস্তকের অন্য প্রকাশকরাও এই রকম ভুল করছেন। এইভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কবির রচনাগুলি ছাপাখানার ভূতের রচনায় পরিণত হবে।

নজরুল ইস্‌লামের অন্য অনেক কবিতা রচনার সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িত রয়েছে। যে-সকল ঘটনা উপলক্ষে সেই সকল কবিতা রচিত হয়েছে সেই সকল ঘটনার কথা আমি পরে বলব। আমার মনে হয় এই কবিতাগুলির কথাও সেই সময়ে বলাই ঠিক হবে। যেমন ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে নজরুল অনেক কবিতা রচনা করেছে। তা ছাড়া সে তখন প্রবন্ধও লিখেছে। এই দাঙ্গার কথা আমি যখন লিখব তখন তখনকার লেখা কবিতা ও প্রবন্ধের কথাও আমি বলব। এই রকম আরও অনেক বিষয় আছে।

রুশ বিপ্লব, লালফৌজ ও কাজী নজরুল ইস্‌লাম

'ব্যথার দান' কাজী নজরুল ইস্‌লামের একখানা বহু প্রশংসিত ও বহুল প্রচারিত গল্প পুস্তক। এই পুস্তকের প্রথম গল্প 'ব্যথার দান' হতেই পুস্তকখানা 'ব্যথার দান' নাম পেয়েছে। এই গল্পটি প্রথমে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ খ্রীস্টীয় মাসের হিসাবে ১৯২০ সালের ১৫ই জানুয়ারী বা তার একদিন আগে-পরের তারিখ ছিল। আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে এই তারিখের ভুল করেছি এবং বলেছি যে খ্রীস্টীয় সালের হিসাবে এটা ছিল ১৯১৯ সাল। এই ভুলের জন্য আমি সত্যই বড় দুঃখিত। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা তিন মাস পরে পরে বা'র হতো বলে বরাবর নির্দিষ্ট তারিখের আগেই বা'র হতো। ১৩২৬ সালের মাঘ সংখ্যাও কয়েক দিন আগে বা'র হয়ে থাকবে। ১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাস (জুলাই, ১৯১৯) হতে আমরা নজরুল ইস্‌লামের লেখা ছাপানো আরম্ভ করি। তারপরে কাগজের প্রতি সংখ্যাতেই তার কিছু না কিছু লেখা ছাপা হয়েছে।

"ব্যথার দান" পড়ে আমরা তখনও বুঝেছিলেম এবং এখনও বুঝতে পারছি যে রুশ বিপ্লব ও লাল ফৌজের প্রতি নজরুলের একটা আকর্ষণ জন্মেছিল। ফৌজ হতে ফেরার আগেই তার দু'টি গল্প

আমরা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় ছেপেছিলেম। ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে তো 'ব্যথার দান' ছেপেছিলেমই, তার আগে কার্তিক মাসে (নবেম্বর, ১৯১৯) আমরা ছেপেছিলেম তার 'হেনা' নামক গল্প। এই দু'টি গল্পই সে ফৌজে থাকা অবস্থাতে লিখেছিল, এবং লিখেছিল তার হাবিলদার হওয়ার পরে। 'ব্যথার দান' গল্প যাদের নিয়ে লেখা হয়েছে তারা বেলুচিস্তানের বাশিন্দা। নজরুলের মুখে শুনেছি যে কোনো পলাতক সৈনিককে ধরার জন্যে তাকে (হয়তো সঙ্গে অন্য সৈনিকও ছিল) একবার বেলুচিস্তানের গুলিস্তান, বুস্তান ও চমন প্রভৃতি এলাকায় যেতে হয়েছিল। তার গল্পে পেশোয়ারের নামও আছে। পেশোয়ারের নিকটবর্তী নৌশহরা নামক স্থানে তো নজরুলরা প্রথম সৈনিক শিক্ষাই লাভ করেছিল। "ব্যথার দানে"র দু'টি চরিত্র দারা ও সয়ফুল মুল্ক্ বেলুচিস্তান হতে আফগানিস্তানের সহজ এলাকা পার হয়ে তুর্কিস্তান কিংবা ককেসাসে গিয়ে লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিল এবং বিপ্লব-বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। 'হেনা' ও 'ব্যথার দান' এই দু'টি গল্পই প্রেমের গল্প। কিন্তু এই দু'টি গল্পের ভিতর দিয়েই অদ্ভুত দেশ-প্রেমও ফুটে উঠেছে। দু'টি গল্পেই আমরা লেখকের আন্তর্জাতিকতার পরিচয়ও পাই, তবে 'ব্যথার দানে' বেশী।

পুস্তকে ছাপানোর সময়ে 'ব্যথার দান' গল্পটিকে নজরুল শুধু যে ছোট করেছে তা নয়, তার চরিত্রের নামও সে বদলে দিয়েছে। পুস্তকে যে-চরিত্রটির নাম দারা, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় তারই নাম নূরুন্নবী। এই চরিত্রটির নাম প্রথমে নূরন্নবী কেন নজরুল করেছিল, তারপরে নূরন্নবীর জায়গায় দারাই বা সে কেন করল, তার কারণ আমি জানিনে। সাহিত্য পত্রিকায় নূরন্নবীকে তার মা সংক্ষেপে নূরু নামে ডাকছেন। তার বাঁধন-হারাতেও নূরু নাম পাওয়া যায়। পরে দেখেছি এই নূরু নামের জন্যে তার কিছু দুর্বলতা আছে। সে চিঠি-পত্রে কোনো কোনো সময়ে নিজের নূরু নাম

স্বাক্ষর করেছে। শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী ও বিরজাসুন্দরী দেবী তাকে নূরু ডাকতেন। শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে নজরুলের পার্সী শিক্ষকের নাম ছিল হাফিজ নূরুন্নবী। প্রথম গল্প লেখার সময়ে এই নামটিই কি তার মনে পড়েছিল? কে জানে? আবার দারা নামটিও তার প্রিয়। আমার নাতির (মেয়ের ছেলের) নাম সে রেখেছে দারা। এও হতে পারে যে নূরুন্নবী নামটি বেলুচিস্তানে খাপ খায় না, কিন্তু দারা নামটি সে দেশের পক্ষে দিব্যি মানানসই।

'ব্যথার দান' প্রেমের গল্প তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে দেশপ্রেম আর আন্তর্জাতিকতার প্রচারও আমরা দেখতে পাই। আমি সাহিত্য পত্রিকা হতে তুলে দিচ্ছি।

নূরুন্নবার কথা

গোলেস্তান।

গোলেস্তান! জন্মভূমি আমার!! আবার অনেক দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি। কত ঠাণ্ডা তোমার কোল! কত সুন্দর তোমার ফুল। কত মিষ্ট তোমার ফল। কত শীতল তোমার জল! কত উদার তোমার আকাশ! কত স্নেহার্দ্র তোমার বাতাস! কত আদর মাখানো তোমার পরশ! আর কত করুণ তোমার ঐ সবুজ বুকের অবুঝ স্পন্দন।

আমার মা নেই ব'লে কি মাতৃহারা আমি পথে পথে ঘুরে মরব?—তাইবা হবে না কেন? কে আমায় শাসন করবে? ওগো আমার কেউ যে নেই।......

আমার বেশ মনে পড়ছে জননীর সেই স্নেহ-বিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা,—আমার অনেকগুলি ভাই-বোন মারা যাবার পর আমার আগমন, আর আমায় নিয়ে মা'র সেই

ক্ষুধিত স্নেহের ব্যাকুল বেদনা ;—সেই ঘুম-পাড়ানোর সরল ছড়া—

"ঘুম পাড়ানোর মাসী-পিসী ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভরে' পান দিব গাল ভরে খেয়ো !"

আর আমার মনে পড়ছে আমাদের মা ছেলের শত অকারণ আদর আবদার ! সবই এত স্পষ্ট হয়ে আমার চোখে ভাসছে।··· ওঃ ! মা আজ কোথায় ?—না, চিরটাদিনই আমার জন্যে এত ক্লেশ, এত যাতনা সইবার কিসের দায় কেঁদেছে মা'র ? মা মরে খুব ভাল করেছেন ! হাঁ, কিন্তু মায়ের সেই অন্ধ স্নেহটাইত আমাকে আমার এই বড়-মা দেশটাকে চিনতে দেয়নি। বেহেশ্‌ত হতে তোমার আবদেরে ছেলের কান্না তুমি শুনতে পাচ্ছ কিনা জানিনে মা, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, তোমায় হারিয়েছি বলেই—তোমার স্নেহের মস্ত শিকলটা আপনা হতে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ তোমার চেয়েও মহীয়সী জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি। তবে মা, এও আমাকে স্বীকার করতে হবে,— তোমাকে আগে আমার প্রাণভরা শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা অন্তরের অন্তর হতে দিয়েই তোমার চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালোবাসতে শিখেছি। তোমায় আমি ছোট করছিনে মা। ধরতে গেলে তুমিই বড়। ভালোবাসতে শিখিয়েচ ত তুমিই। আমার প্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইয়েচ ত তুমিই। আমাকে কাজে অকাজে এমন করে সাড়া দিতে শিখিয়েচ যে তুমিই। তুমি পথ দেখিয়েছ, আর তাই আমি চলেছি সেই পথ ধরে। লোকে ভাবছে, কি খামখেয়ালি পাগল আমি ! কি কাঁটাভরা ধ্বংসের পথে চলেছি আমি ! কিন্তু মা আমাদের চলার খবর তুমি জান, আর আমি জানি আর খোদা জানেন।"

১৯১৮-১৯ সালে আমরা যে ত্রৈমাসিক পত্রিকা বা'র করতাম তা বা'র করার জন্যে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে কোনো ডিক্লা-রেশন দিতে হতো না। যখন খুশী আমরা প্রেস বদলাতে পারতাম। ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক (নবেম্বর, ১৯১৯) সংখ্যক পত্রিকার ছাপা আমাদের মনোমত না হওয়ায় ঠিক হয়েছিল যে আমরা অন্য প্রেসে উঠে যাব। কলকাতার ইটালী এলাকাস্থিত "ইণ্ডিয়া প্রেসের" তারিফ শুনেছিলাম। কেতা দুরস্ত প্রেস। ছাপা ভালো, কথামতো কাজও পাওয়া যায়। তাই ঠিক হলো ১৩২৬ সালের মাঘ (খ্রীঃ জানুয়ারী, ১৯২০) সংখ্যার পত্রিকাখানা আমরা ইণ্ডিয়া প্রেসেই ছাপাব। নজরুল ইস্‌লামের "ব্যথার দানের" পাণ্ডুলিপি অনেক আগেই আমাদের হাতে এসেছিল। অনেক সময় হাতে রেখে সেই পাণ্ডুলিপি ও আরও কিছু লেখা সঙ্গে নিয়ে আমি একদিন "ইণ্ডিয়া প্রেসে"র মালিক শ্রীরামরাখাল ঘোষের সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রেসে আমাদের পত্রিকা ছাপানোর প্রস্তাব উপস্থিত করলাম। তিনি বললেন পত্রিকা ছাপাতে তিনি রাজী আছেন, তবে এটা যখন পত্রিকা তখন তিনি লেখা আগে প'ড়ে দেখবেন। আমার সঙ্গে লেখা থাকলে তিনি রেখে যেতে বললেন। "ব্যথার দানে"র পাণ্ডুলিপি ও অন্য যা কিছু লেখা আমার সঙ্গে ছিল আমি শ্রীঘোষের নিকটে সবই রেখে এলাম। তিনি আমায় যে-দিন যেতে বলেছিলেন আমি সে দিন গিয়ে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করি। তিনি খুবই দুঃখের সহিত বললেন যে আমাদের পত্রিকা তিনি ছাপতে পারবেন না। তবে, "ব্যথার দান" গল্পের লেখার ভিতর দিয়ে যে দেশ-প্রেম ফুটে উঠেছে তার জন্যে তিনি আমাদের অভিনন্দনও জানালেন। শ্রীঘোষ আমায় বললেন যে বিনয়কুমার সরকারের "গৃহস্থ" পত্রিকা ছাপানোর কারণে তাঁর প্রেসের ওপরে পুলিসের খুব খারাব নজর আছে। আমাদের পত্রিকাখানা ছাপিয়ে তিনি আরও বেশী পুলিসের নজরে পড়তে চান না। আমাদের উদ্যমের সহিত তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি

আছে বললেন তিনি।* পরে বুঝেছিলেন যে ব্যাপারটি উল্টো দিক হতেও ভাববার ছিল। ইণ্ডিয়া প্রেসের জন্যেও আমরা পুলিসের বিশেষ নজরে পড়ে যেতে পারতাম।

১৯১৯ সালে নজরুলের "ব্যথার দান" গল্পে যে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছিল তার জন্যে কলকাতার একটি প্রেস অন্তত গল্পটি ছাপাতে রাজী হয় নি। শুধু দেশপ্রেম নয়, নজরুল ইস্‌লামের এই গল্পের ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিকতাও ফুটে উঠেছে। আমাদের সাহিত্যে একটা নূতন জিনিস বলতে হবে।

এখন আমি "ব্যথার দানে"র কাহিনী সম্বন্ধে কিছু বলি। ঘটনার স্থান বেলুচিস্তানের গুলিস্তান, বুস্তান ও চমন প্রভৃতি জায়গা। দু'জন যুবক—দারা (নূরুন্নবী) ও সয়ফুল মুল্ক্ এবং একজন যুবতী—বেদৌরাকে নিয়ে এই প্রেমের গল্পটি রচিত হয়েছে। দারার মা মরবার সময়ে তাঁর একান্ত স্নেহের পাত্রী বেদৌরাকে দারার হাতে সঁপে দিয়ে যান এবং বলে জান যে দারা যেন কোনো অবস্থাতেই বেদৌরাকে না ছাড়ে। তাদের দু'জন কিন্তু আগে হতেই একে অন্যকে গভীরভাবে ভালোবাসত। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন কোথা হতে বেদৌরার এক ভণ্ড মামা এসে জোর করে বেদৌরাকে দারার নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সেই থেকে দারা খুঁজতে লাগল বেদৌরাকে। কিছু দিন পরে বেদৌরা তার ভণ্ড মামার জাল ছিঁড়ে পালিয়ে গেল। সে দিন থেকে সেও খুঁজতে লাগল দারাকে। এই সময় সয়ফুল মুল্কের সঙ্গে বেদৌরার দেখা হলো। সে নানান কথা রটিয়ে বেদৌরার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রলুব্ধও করতে লাগল বেদৌরাকে। এক দুর্বল মুহূর্তে বেদৌরা সয়ফুল মুল্কের এই লোভের নিকটে ধরা দিল। তবে, অল্প দিনের

* শ্রীরামরাখাল ঘোষ কি মালদার লোক ছিলেন? মালদাতেই এই ধরনের নাম হতে দেখেছি। তা ছাড়া, একসময়ে মালদা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের কর্মক্ষেত্রও ছিল। (লেখক)

ভিতরেই সয়ফুল মুল্ক্ বুঝতে পারল যে বেদৌরার হৃদয়ের সমস্ত স্থান জুড়ে বসে আছে দারা। সেখানে তিল পরিমাণ স্থানও নেই সয়ফুল মুল্কের জন্যে। তাতে সয়ফুল মুল্কের অনুতাপের আর সীমা থাকল না। সে ক্ষমা চাইল বেদৌরার নিকটে, বলল কোনো মহান কাজে জীবন বলি দিয়ে সে তার অন্যায় কাজের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

এর পরে দারার সঙ্গে বেদৌরারও দেখা হয়ে গেল। সে সব কথা খুলে বলল দারাকে। যুক্তি দিয়ে বিচার করে দারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে বেদৌরা নির্দোষ। কিন্তু সে তার মনের গহনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল যে হিংসা সেখানে বাসা বেঁধেছে। এতে তার রাগ হলো নিজের উপরে। সে তার মন হতে হিংসা ধু'য়ে ফেলার জন্যে বেদৌরার নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু কোথায় গিয়ে সয়ফুল মুল্ক্ কোনো মহান কাজে তার জীবন বলি দেবে? আর কোথায় গিয়েই বা দারা ধু'য়ে ফেলবে তার মনের হিংসা?

এখন সয়ফুল মুল্কের মুখ হতেই কথাটা শোনা যা'ক। সে বলছে—

"যা' ভাবলুম, তা' আর হ'ল কই? ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই লালফৌজে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে তারা খুব উৎফুল্ল হয়েছে। মনে করছে, এদের এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর ক'রে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তি সঙ্ঘের একজন।........

'ব্যথার দান' গল্পে আন্তর্জাতিকতা

"কিন্তু সহসা একি দেখলুম? দারা কোথা হতে এখানে এল? সে দিন তাকে অনেক ক'রে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, "এর চেয়ে ভালো কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এ দলে এসেছি।"

সয়ফুল মুল্ক্ ও দারা দু'জনেই যোগ দিল লালফৌজে। অথচ 'ব্যথার দান' পুস্তকে আছে যে তারা মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিয়েছিল। এখানে আমার কিছু বলার আছে। নজরুল ইস্‌লাম যখন 'ব্যথার দান' গল্পটি আমাদের নিকটে পাঠিয়েছিল তখন তাতে এই দু'জনের লাল ফৌজে যোগ দেওয়ার কথাই, অর্থাৎ আমি ওপরে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি ঠিক সেই রকমই ছিল। আমিই তা থেকে 'লাল ফৌজ' কেটে দিয়ে তার জায়গায় 'মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল' বসিয়ে দিয়েছিলেম। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে 'লাল ফৌজ' কথা উচ্চারণ করাও দোষের ছিল। সেই লাল ফৌজে ব্রিটিশ ভারতের লোকেরা যে যোগ দেবে, তা যদি গল্পেও হয়, তা পুলিসের পক্ষে হজম করা মোটেই সহজ হতো না। রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পরে ভূতপূর্ব জার সাম্রাজ্যের ভিতরকার বিপ্লব-বিরোধীরা সৈন্যদল গঠন ক'রে লড়াই শুরু করে। এই লড়াইয়ের পক্ষে অর্থ ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করতে থাকে জগতের ছোট-বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। এই শক্তিগুলির লোকবলও এই বিপ্লব-বিরোধী যুদ্ধে শামিল হয়েছিল। সকল দিক হতে বিপ্লবী রাশিয়া অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

বিপ্লবকে বাঁচাবার জন্যে রুশ দেশের ভিতরে মজুর শ্রেণীর পার্টি ও সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের নেতৃত্বে জনগণ যে-সৈন্যদল গঠন করেছিল তার নাম দেওয়া হলো 'লাল ফৌজ'। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব যেমন একা রুশ দেশের মজুর-কৃষকের বিপ্লব ছিলনা, সমস্ত দুনিয়ার মজুর-কৃষকেরা সে বিপ্লবকে আপন মনে করে নিয়েছিল, সেই রকম বিপ্লব-বিরোধী গৃহযুদ্ধেও লাল ফৌজ একা ছিলনা। লাল ফৌজকে এই গৃহযুদ্ধে সাহায্য করতে এসেছিল সমস্ত জগতের মেহনতী মানুষেরা ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা। আমাদের ভারতবর্ষও পেছিয়ে ছিলনা। এই সময়ে আমাদের দেশে ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট লালের আতঙ্কে শঙ্কিত হয়ে চার দিক হতে আটঘাট এমন ভাবে বেঁধে ফেলেছিল যেন

অক্টোবর বিপ্লবের কোনো হাওয়াই এদেশে প্রবেশ করতে না পারে। ঠিক এমন সময়ে একজন ভারতীয় সৈনিকের লেখা গল্পের নায়কেরা যদি 'লাল ফৌজে' যোগ দেয় তা হলে তার সৈনিক শৃঙ্খলার দিক হতেও খুব ভালো হতো না। তাই আমি নজরুলকে জিজ্ঞাসা না করেও তার 'লাল ফৌজ' কথা কেটে দিয়েছিলেম। তার জায়গায় 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' এই ভেবে লিখে দিয়েছিলেম যে যাঁর যা খুশী তিনি তাই বুঝে নিবেন। কিন্তু এখন 'ব্যথার দান' পুস্তকে 'ব্যথার দান' গল্পে 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' কথাটার জায়গায় নজরুলের গোড়ায় লেখা 'লাল ফৌজ' কথাটা বসিয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য। একথা মনে রাখতে হবে যে নজরুলের লেখা 'ব্যথার দান' আমার হাত দিয়েই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ছাপা হয়েছিল। আমার পরিবর্তনে সে খুব খুশী হয়ে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছিল। তারপরে, সে যখন কলকাতায় ছুটিতে এসেছিল তখনও শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্মুখে আবারও সে আমায় 'লাল ফৌজ' কথার পরিবর্তনের জন্যে ধন্যবাদ দিয়েছিল।

এখন কথা হচ্ছে রুশ বিপ্লবের প্রতি এবং তার ফলে যে 'লাল ফৌজ' গঠিত হয়েছিল সেই লাল ফৌজের প্রতি নজরুল ইস্‌লামের কোনো সহানুভূতি ছিল কিনা, না, শুধু কথায় কথায় তার গল্পে 'লাল ফৌজ', কথা এসে গিয়েছিল? আবার এমনও অনেক অবিশ্বাসী থাকতে পারেন যাঁরা বলবেন লাল ফৌজের কোনো উল্লেখই তো গল্পে নেই, তাই নিয়ে আবার আলোচনা কেন? আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে 'মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল' ও 'মহান্ ব্যক্তি সঙ্ঘ' বলতে তাঁরা কি বুঝেছেন? আসল কথা হচ্ছে এই রুশ দেশের অক্টোবর বিপ্লব ও লাল ফৌজের লড়াই নজরুল ইস্‌লামের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। তাই সে ইচ্ছা করেই বেলুচিস্তানকে তার গল্পের ঘটনাস্থল করেছিল। কারণ, বেলুচিস্তান হতে অনেক সহজে সোবিয়েৎ দেশের সীমানায় পৌঁছানো যায়।

আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল যে ফৌজের কঠোর সেন্সরিং-এর বেড়া পার হয়ে কাগজ পত্র নজরুলের হাতে পৌঁছাত কিনা এবং সে রুশ বিপ্লব ও লাল ফৌজ ইত্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হতে পেরে-ছিল কিনা। কিছু কাল আগে একখানা পত্র পড়ে আমার মনের এই সন্দেহ ঘুচে গেছে। পত্রখানা লিখেছিলেন নজরুল ইস্‌লামের পল্টনের বিশিষ্ট বন্ধু জমাদার শম্ভু রায় এবং লিখেছিলেন চুঁচুড়ার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নজরুলের স্নেহভাজন বন্ধু। সে নজরুল সম্বন্ধে একখানা পুস্তকও লিখেছে। সে-পুস্তক এখন আর ছাপা নেই। জমাদার শম্ভু রায়ের কথা আমি আগে অনেক বলেছি। একথাও বলেছি যে ফৌজ হতে ফেরার পরে তিনি সাব-ডেপুটি কলেক্টরের চাকরী পেয়েছিলেন। এই চাকরীতে ক্রমশ পদোন্নতি করে তিনি প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর হয়েছিলেন। বর্ধমানের ট্রেজারি অফিসারের কাজ করার সময়ে তিনি চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। তার পরে তিনি হুগলী শহরের বাবুগঞ্জ এলাকায় বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন। তখন প্রাণতোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সে নজরুল সম্বন্ধে লেখা তার বই তাঁকে উপহার দিয়ে কয়েকটি প্রশ্নও তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল। তার উত্তরে পত্রখানা লেখা। এই পত্র লেখার পরে জমাদার শম্ভু রায় মারা গেছেন। পত্রখানা আমি পড়েছি। প্রাণতোষের অনুমতি আছে যে ইচ্ছা করলেই আমার পুস্তকে আমি তা ছাপিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা এই পুস্তকে ছাপাবনা। প্রাণতোষের পুস্তক যখন আবার ছাপা হবে তখন সেই পুস্তকেই মূল পত্রখানা ছাপা হওয়া উচিত। তবে, আমি এখানে সেই পত্র হতে কিছু কিছু বিষয় নেব।

জমাদার শম্ভু রায়ের লেখা পত্র হতে আমরা জানতে পারছি যে করাচিতে তাঁদের ব্যারাকের প্রতি কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। যে-কোনো রকমের রাজনীতিক সাহিত্যের ব্যারাকে প্রবেশ নিষিদ্ধ

ছিল। সেন্সারিং-এর ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোর। তবুও এই সব ব্যবস্থা নজরুলের নিকটে হার মেনেছিল। সে এমন গোপন পথ খুলেছিল যে যার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে নিষিদ্ধ পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা অবলীলাক্রমে ব্যারাকের ভিতরে প্রবেশ করত। রাওলাট বা সিডিশন কমিটির রিপোর্ট তাঁদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু জমাদার রায় সেই রিপোর্ট নজরুলের নিকটে দেখেছিলেন। রুশ বিপ্লব সম্বন্ধেও নিষিদ্ধ সাহিত্য নজরুলের হাতে এসেছিল। জমাদার রায় ও নজরুলের আরও ক'জন বিশ্বস্ত বন্ধুকে নজরুল সে সাহিত্য দেখিয়েছিল। একদিন নজরুল তার নিজের ঘরের সামনে একটি উৎসব করেছিল। এই উৎসবের উপলক্ষ অক্টোবর বিপ্লব ছিল, না, লাল ফৌজের কোনো বিশিষ্ট জয়লাভ ছিল তা জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় লাল ফৌজের কোনো বিশিষ্ট জয়লাভ উপলক্ষেই উৎসবটি হয়ে থাকবে। জমাদার রায় বলছেন :—

"নজরুল তার বন্ধুদের মধ্যে যাদের বিশ্বাস করত তাদের এক সন্ধ্যায় খাবার নিমন্ত্রণ করে, অবশ্য এই রকম নিমন্ত্রণ প্রায়ই সে তার বন্ধুদের করত। কিন্তু ঐ দিন যখন সন্ধ্যার পর তার ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু তার অরগ্যান মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে মুখে একটা অন্য রকমের জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দে মহাশয়ের বাড়ী ছিল হুগলী সহরের মুটিয়া বাজার নামক পল্লীতে। তিনি অরগ্যানে একটা মার্চিং গত বাজানোর পর নজরুল সেই দিন যে-সব গান গাইল ও প্রবন্ধ পড়ল তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল

খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং ঠিক নাম মনে নেই সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। ঐ পত্রিকাতে আমরাও বিশদভাবে সংবাদটি দেখে উল্লসিত হয়ে উঠি। সে দিন সারা রাতই প্রায় হৈ হুল্লড়ে আমাদের কেটে গিয়েছিল।"

(১৯৫৭ সালের ৬ই জুন তারিখে চুঁচুড়ার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র হ'তে উদ্ধৃত।)

এই পত্রাংশ পড়ার পরে আমাদের মনে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে নজরুল ইস্‌লাম আন্তর্জাতিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এখন আমাদের বুঝতে হবে যে তার আন্তর্জাতিকতার ভাব শুধু তার স্বপ্নালুতা হতেই এসেছিল, না, তার কোনো বাস্তব ভিত্তিও ছিল। আমি আগেও বলেছি যে অক্টোবর বিপ্লব হতে রুশ দেশের জনগণ যা পেয়েছিলেন সেই পাওয়াকে সমস্ত দুনিয়ার জনগণ নিজেদের পাওয়া ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। তাই দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশ হতে জনগণের প্রতিনিধিরা লাল ফৌজকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষও পেছিয়ে ছিল না।

"লাল ফৌজের যে-সব আন্তর্জাতিক ইউনিট দক্ষিণ রাশিয়ায় যুদ্ধ করছিলেন তাঁদের ভিতরে ভারতীয়েরাও ছিলেন।

"তাঁরা ১৯১৮ সালে দখলকার ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে ইরান হতে ট্রান্সককেসাসে এসেছিলেন। তাঁদের মনে 'লালদের ভাবধারার ছোঁয়াচ' লেগে যেতে পারে ব্রিটিশ অফিসাররা এই ভয় করছিলেন। তাই, তাঁরা ভারতীয় সৈন্যদের ওপরে কড়া নজর রেখেছিলেন। ভারতীয় সৈন্যদের বারণ ক'রে দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা যেন স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মেলা-মেশা না করেন।

"কিন্তু ব্রিটিশ অফিসারদের এই সাবধানতা কোনো কাজেই লাগল না। পুরু দেওয়াল-ঘেরা ব্যারাকের ভিতরেও বিপ্লবী ভাবধারা প্রবেশ করল। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে

অসন্তোষ দেখা দিল এবং তাঁদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক সৈন্য তাঁদের ব্যায়োনেট ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে তুলে ধ'রে, সোজা গিয়ে লালফৌজে যোগ দিলেন।

"নিকোলাই গিকালো পরিচালিত সৈন্যদলে যে-সকল ভারতীয় সৈন্য ছিলেন তাঁদের ঘটনা সকলে জানেন। তাঁরা দাগিস্তান ও কাবার্দার পার্বত্য অঞ্চলে লড়াই করতেন। এই সৈন্যদের মুর্তজা আলী নামীয় ভারতীয় অফিসারের সাহসিকতার কথা আজ পর্যন্ত কেউ ভুলতে পারেন নি। তিনি শ্বেত কসাক প্রতি-বিপ্লবীদের নিকটে ভীতির প্রতিমূর্তিরূপে পরিগণিত হতেন। তাঁর সাহস, নির্ভীকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে তাঁর নাম রূপকথার পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

"পিয়াটিগর্ক্স্ হতে প্রকাশিত "কমিউনিস্ট পাথ্" নামক পত্রিকা ১৯২২ সালে লিখেছিল যে গিকালোর গ্রুপে শেষ যাঁরা ছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন মুর্তজা আলী। তিনি কৌশলী পার্বত্য যোদ্ধা ছিলেন, শ্বেত প্রতিবিপ্লবীদের চোখে ছিলেন তিনি মূর্তিমান ভীতিস্বরূপ, আর বাজপাখী যেমন তার শিকারের ওপরে ছোঁ মারে, তেমনি ছোঁ মারতেন তিনি শত্রুদের ওপরে।

"গৃহযুদ্ধের বীর যোদ্ধা গিকালোর ভগ্নী ভেরা ফিয়োদ্রবনা গিকালো তাঁর ভ্রাতার সৈন্যদলভুক্ত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি থেকে অনেক কথা বলেন।

"তিনি বলেন "আমি যখন আজকাল সোবিয়েৎ দেশ ও ভারতের দুই মহান জনগণের ভ্রাত্রীয় বন্ধনের কথা পড়ি তখন আমার মনে পড়ে সেই সকল সাহসী অথচ বিনয়ী আন্তর্জাতিকতাবাদী যোদ্ধাদের কথা। হতে পারে সংখ্যায় তাঁরা কম ছিলেন, কিন্তু বীর যোদ্ধা মুর্তজা আলীর মতো তাঁরা নিজেদের বাঁচিয়ে যুদ্ধ করেন নি।

"আমাদের বন্ধুত্ব যুদ্ধের ময়দানে ঝরা রক্তের মোহর মারা। জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব চিরজীবী হবে।"

(১৯৫৭ সালে মস্কোর ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস্ পাবলিশিং হাউস দ্বারা প্রকাশিত IN COMMON THEY FOUGHT [তাঁরা একসঙ্গে লড়েছিলেন] নামক পুস্তক হতে গৃহীত)।

কিন্তু এটাই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। এম. এন. রায়ের স্মৃতিকথা পড়ে আমরা লাল ফৌজে আরও অনেক ভারতীয় সৈন্যের যোগদানের কথা জানতে পারছি। ইরানের খোরাসান প্রদেশ ব্রিটিশ সৈন্যরা দখল করে রেখেছিল। এই ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ভিতরে ছিল অনেকগুলি ভারতীয় ইউনিটও। ভারতীয় সৈন্যরা বেশী সংখ্যায় ব্রিটিশ বাহিনী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল। তাঁদের মধ্য হতে কিছু লোক তুর্কির হয়ে লড়াই করার জন্যে আনাতোলিয়া যেতে চেয়ে অসফল হয়েছিলেন। তাঁরা বাকু কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাকীরা লাল ফৌজের ইন্‌টারন্যাশনাল ব্রিগেডে যোগ দিলেন। তাঁরা ভারতের পাঠান সৈন্য ছিলেন। রাইফেলের যুদ্ধে তো তাঁদের তুলনা ছিল না, কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যদের আর্টিলারি ও মেশিনগান্ ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেওয়া হতো না। ইন্‌টারন্যাশনাল ব্রিগেডে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের এইসব হাতিয়ার ব্যবহার করতে দেওয়া হলো। তাতে ভারতীয় সৈন্যদের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি তাঁরা এই সব জটিল উচ্চ পর্যায়ের অস্ত্রের ব্যবহার শিখে নিলেন যে তাতে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তা ছাড়া, গেরিলা যুদ্ধ অভিজ্ঞ রুশ সৈন্যরা তাঁদের গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষাও দিলেন। প্রথমে রুশ অফিসাররা তাঁদের যুদ্ধে পরিচালিত করছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের ভিতরেই ভারতীয় সৈন্যদের প্রমোশন দিয়ে অফিসারের পদ দেওয়া হলো। তাতে তাঁদের উৎসাহ আরও বাড়ল। নূতন নূতন ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ বাহিনী ছেড়ে আসতে লাগল। ইরানী বিপ্লবী সৈন্যরাও লাল

ফৌজের আন্তর্জাতিক ব্রিগেড্ গঠন করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় ব্রিগেডের যোগাযোগ হলো। ব্রিটিশ ফৌজের হেড্ কোয়ার্টার্স্ ছিল মাশ্হাদ। লাল ফৌজের ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডভুক্ত ভারতীয় সৈন্যরা মাশ্হাদ-আশ্কাবাদ (আশ্কাবাদ এখন তুর্কমেনিস্তান রিপাবলিকের রাজধানী) রোডের ধারে ধারে ব্রিটিশ সৈন্যদের আচমকা আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁরা ক্রাস্নোভদ্স্ক-মার্ভ রেলওয়েকে নিরাপদ রাখলেন যার ফলে ককেসাস হতে সেন্ট্রাল এশিয়ায় পেট্রল পাঠানোর সুবিধা হয়ে গেল। অপর পক্ষে সুদীর্ঘ কোয়েটা-মাশ্হাদ রোডের ধারে ধারে ইরানী বিপ্লবীরা ক্রমাগত ব্রিটিশ সৈন্যদের এমন আচমকা আক্রমণ করতে থাকলেন যে তাতে তাদের রসদ বন্ধ হয়ে গেল। ফলে, ব্রিটিশ ফৌজকে ইরানের খোরাসান প্রদেশ খালি ক'রে দিয়ে চলে যেতে হলো।

এইসব ঘটনা বিবেচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নজরুল ইস্লামের গল্পের নায়কেরা যে লাল ফৌজে যোগ দিল তা নিছক কল্পনার বিলাস ছিলনা, ওই রকম বাস্তব ঘটনা সেই সময়ে ঘটছিল বলেই সে তার নায়কদের লাল ফৌজে যোগ দেওয়ার কথা লিখতে পেরেছিল।

কাজী নজরুল ইস্লামের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে যে-ক'খানা পুস্তক এ-পর্যন্ত লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে সে-সবের মধ্যে আমার মতে ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত রচিত "নজরুল চরিত মানস" উচ্চতম আসন পাওয়ার দাবী রাখে। আমাদের বন্ধু আয়নুল হক খান সাহেব এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১৯৬০ সালে প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬৩ সালে এই পুস্তকখানার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ভারতী সংস্করণ বা'র হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ডক্টর গুপ্তের গ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর সঙ্গে সকল বিষয়ে যে আমার মতের মিল হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু

এটা তাঁর বিতৃষ্ণা, না, আতঙ্ক তা জানিনে, তিনি কিছুতেই 'লাল'কে বরদাশ্‌ত্‌ করতে পারছেন না। 'লাল' বিপ্লবী মজুর শ্রেণীর রং, মজুর শ্রেণীর পতাকা হচ্ছে 'লাল নিশান', আবার রুশ দেশে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে যে-বিপ্লব হয়েছিল তারপরে বিপ্লব-বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে গঠিত ফৌজের নাম হয়েছিল 'লাল ফৌজ'। এই 'লাল ফৌজে' নজরুল ইস্‌লামের পল্টনে থাকাকালে লেখা 'ব্যথার দান' গল্পের দু'জন নায়ক—দারা ও সয়ফুল মুল্ক্‌ যোগ দিয়েছিল। তা থেকে আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে লিখেছিলাম যে সে রুশ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তার উত্তরে ডক্টর গুপ্ত লিখেছেন—

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের 'লাল' বিরোধিতা—এটা বিতৃষ্ণা, না, আতঙ্ক

"মুজফ্‌ফর সাহেব শুধু 'ব্যথার দান' গল্পটির প্রসঙ্গ নিয়ে নজরুলের উপর রুশ প্রভাবের কথা উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে নজরুল 'লাল ফৌজ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এবং 'লাল ফৌজে'র মহৎ আদর্শের কথা তুলে ধরেছিলেন, তবুও একথা বলা বোধ হয় ঠিক নয় যে, তিনি সচেতনভাবে রুশ বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন বা তার প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। মুক্তিসেবক সৈন্যদলের কার্যকলাপকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা নিতান্তই কবিজনোচিত এবং নজরুলের নায়কদের জীবনে বা চরিত্রে একমাত্র ব্যক্তিগত প্রেমের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য ছাড়া 'লাল ফৌজের' যোদ্ধাদের মতো কোন সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সজ্ঞান বিদ্রোহ নেই। তাদের যুদ্ধ নেহাতই আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাক্রান্ত ও রোমান্টিক ভাবালুতাময়। আসলে 'ব্যথার দান' একটি প্রেমের বিদগ্ধ গল্প। নায়কদের দলে যোগদানের ঘটনা গল্পের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রেরণাহীনভাবে ক্ষীণসূত্রে গ্রথিত। এমনও হতে পারে যে

নজরুল বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী অর্থে 'লাল' কথাটিকে 'ফৌজে'র আগে ব্যবহার করেছিলেন। 'লাল নিশান', লাল পল্টন' ইত্যাদি কথা ব্যবহারের সময় তিনি বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবে 'লাল' কথাটিকে গ্রহণ করতেন ব'লে মনে করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রায় সমকালীন 'হেনা' গল্পটির উল্লেখ করতে হয়। ব্যথার দানের মতো 'হেনা'ও একটি ব্যর্থ প্রেমের গল্প। 'ব্যথার দানে' যদি ব্রিটিশ-বিরোধী সজ্ঞান মনোভাব থেকে 'লাল ফৌজে'র কীর্তির কীর্তন করা হত, তাহলে 'হেনা'র নায়ক কি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলতে পারত ?

"তবু আমি সরল মনে বলছি, ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। যদি বলি আমার এ যুদ্ধে আসার কারণ, একটা দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণ আহুতি দেওয়া, তাহলেও ঠিক উত্তর হয় না।'

"আমার মনের খামখেয়ালীর অর্থ আমি নিজেই বুঝি না।" ('নজরুল চরিত মানস', ভারতী সংস্করণ, ৬৯-৭০ পৃষ্ঠা)।

ডক্টর গুপ্তের গ্রন্থের এই উদ্ধৃতিটুকু খুব মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত। তিনি লিখেছেন "যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে নজরুল 'লাল ফৌজ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন…", কিন্তু এখানে 'যদি'র প্রশ্ন কি ক'রে উঠতে পারে ? আমি বলছি যে নজরুল 'লাল ফৌজ' কথাটা ব্যবহার করেছিল এবং আমি তা কেটে দিয়ে তার জায়গায় 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' বসিয়ে দিয়েছিলেম। এখানে 'যদি'র কোনো স্থান নেই, 'ধ'রে নেওয়া'র কথাও উঠতে পারে না। আমার কথা পরিপূর্ণরূপে অবিশ্বাস করার অধিকার তাঁর আছে, তাই তিনি করুন, তবে এত ঘুরিয়ে কথা বলার কি প্রয়োজন আছে তা'তো বুঝতে পারিনে। রুশ বিপ্লবের দ্বারা নজরুল ইস্‌লাম সত্যই প্রভাবিত হয়েছিল। তার জীবন চরিতের রচয়িতারূপে এটা ডক্টর গুপ্তের

বোঝা উচিত ছিল। ওপরে আমি জমাদার শম্ভু রায়ের পত্রাংশ তুলে দিয়েছি। তা থেকে কোনো লোকের মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগা উচিত নয় যে নজরুল ইস্‌লাম রুশ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। তার লেখায় তা ফুটে উঠেছে। অথচ ডক্টর গুপ্ত বলতে চান, "এমনও হতে পারে যে নজরুল বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী অর্থে 'লাল' কথাটিকে ফৌজের আগে ব্যবহার করেছিলেন।" হাঁ, বিপ্লবী অর্থে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী অর্থে কখনও নয়। 'লাল ফৌজে'র অর্থ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা জানতেন বলে তারা কোনো দিন তাঁদের দলের অর্থে লাল ফৌজ কথা ব্যবহার করেন নি। আর, 'লাল ফৌজ' আর 'লাল পল্টনে' কোনো তফাৎ নেই। ডক্টর গুপ্তের একটি কথা জানা উচিত যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা কোনো পতাকা কখনও ব্যবহার করেন নি। তাঁদের আন্দোলন গোপন ও অবৈধ ছিল ব'লে পতাকা ব্যবহার করার সুযোগ তাঁদের ছিল না। ১৯৩১ সালের আগে পতাকা ছিলনা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসেরও। তারপরে হেনা গল্পের কথা। এই গল্প থেকে যে উদ্ধৃতি ডক্টর গুপ্ত দিয়েছেন তা দেওয়ার আগে গল্পটি তাঁর আরও মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত ছিল। আফগান মেয়ে হেনার দেশপ্রেম কি আরও তলিয়ে বোঝার দাবী রাখেনা? এই গল্পের ভিতর দিয়েও নজরুলের আন্তর্জাতিকতা বোধ কি ফুটে ওঠে নি? ব্রিটিশ ফৌজের একজন ভারতীয় সৈনিক কোথায় কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল তা ডক্টর গুপ্তের বোঝা উচিত ছিল। "ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।" এই কথাটা সোহরাবের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল তখন যখন সে আফগানিস্তানের বাদশাহ্ আমানুল্লার সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। নজরুল ইস্‌লাম ব্রিটিশের ভারতীয় সৈনিক ছিল। করাচির সেনানিবাসে থাকাকালেই সে গল্পটি লিখেছিল। তখন তার বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। সে তার গল্পের নায়ক সোহরাবকে পাঠিয়েছিল আফগানিস্তানে বাদশাহ্

আমানুল্লার সৈন্যদলে, যে-সৈন্যদল যুদ্ধ করেছিল ভারতের ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে। কাজেই, "ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু" এই কথাগুলি দিয়ে নজরুল একটা ছদ্মাবরণ সৃষ্টি করেছিল মাত্র। সোহ্‌রাব আসলে কি কাজটা করছিল সেটাই তো আমাদের দেখতে হবে। সে তো সে সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সত্যকার যুদ্ধই করছিল।

কাজী নজরুল ইস্‌লামের জীবনচরিত রচনা করতে গিয়ে সে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই তাকে আঁকতে হবে। নিজের মনের রঙ দিয়ে নজরুলের কোনো চরিতকার যদি তার চিত্র আঁকতে চান তবে তিনি নিশ্চয় ভুল চিত্র আঁকবেন। নজরুলের 'লাল নিশান' সত্য সত্যই 'লাল'দেরই নিশান। শুধু 'ব্যথার দান' গল্পে নয়, তার রচনায় যেখানেই সে 'লাল নিশান' কথার উল্লেখ করেছে সেখানেই সে 'লাল'দের লাল নিশানকেই মনে করেছে। জীবনের পথে অনেক বিচ্যুতি তার ঘটেছে একথা সত্য, কিন্তু 'লাল' কখনও তার নিকটে 'কালো' হয়নি। ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত যখন নজরুলের চরিত্র চিত্রণ করছেন তখন ভালোয়-মন্দয় মিলিয়ে তাঁকে নজরুলকেই আঁকতে হবে। আমি জানিনে, 'লাল' সম্বন্ধে তাঁর মনে তীব্র বিতৃষ্ণা রয়েছে, না, 'লাল'দের সম্বন্ধে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত ; তবে যাই তিনি হোন না কেন, জীবনী তিনি লিখছেন কাজী নজরুল ইস্‌লামের। আমার মনে হয় এই কথা তাঁর কখনও ভোলা উচিত হবে না।

আমি ডক্টর গুপ্তের গ্রন্থের অনেক বেশী মূল্য দিই বলে এত কথা এখানে বললাম।

আর একটি কথা। আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গ"তে লিখেছিলেম যে নজরুলের 'আগে বাঙলা দেশের, সম্ভবত

ভারতবর্ষেরও, কোন কবি ও সাহিত্যিক রুশ বিপ্লবের পরের সোবিয়েৎ ভূমির কথা তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেন নি।" একথাটা ঠিক নয়। আমি পরে জেনেছি যে যুক্ত প্রদেশের (এখনকার উত্তর প্রদেশের) অনেক লেখক রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। 'সোশ্যালিজমে'র বিষয়ে ১৯১৯ সালে 'হিন্দী ভাষা'য় লিখিত একখানা পুস্তকও আমি দেখেছি। আমার ভুলের জন্যে আমি দুঃখিত।

কবি মোহিতলাল মজুমদার
ও
কাজী নজরুল ইস্‌লাম

আমরা দু'জনা দুই কাননের পাখী,
একটি রজনী একটি শাখার শাখী,
তোমার আমার মিল নাই মিল নাই,
তাই বাঁধিলাম রাখী।

—অন্নদাশঙ্কর রায়
(স্মৃতি হতে উদ্ধৃত)

গোড়াতেই আমি ব'লে রাখতে চাই যে এই অধ্যায়টি কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের কাব্য-বিচার করার উদ্দেশ্যে আমি লিখতে বসিনি। সে অধিকার আমার আছে ব'লেও আমি মনে করিনে। ইরানের মহান্‌ কবি সাআদী লিখেছেন :—

"একদিন গোসলখানায় কিছু সুগন্ধ মাটি
আমার এক বন্ধুর হাত হতে আমি পেলাম।
জিজ্ঞাসা করলাম "হে মাটি ! তুমি কস্তুরী, না, সুগন্ধ আবীর ?
তোমার গন্ধে আমার মন যে পাগল হয়ে উঠল।"
জওয়াব দিল মাটি "আমি তো অসার মাটিই,
কিন্তু কিছুকাল ফুলের সান্নিধ্যে আমি বসেছিলেম॥"

আমিও কিছুকাল মোহিতলাল ও নজরুল ইস্‌লামের ঘন সান্নিধ্যে বসার সুযোগ পেয়েছিলেম। সময়টা ছিল ১৯২০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস হতে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। এটাই ছিল নজরুল আর মোহিতলালের বন্ধুত্বেরও মিয়াদ। এর মধ্যে পাঁচ মাসেরও কিছু বেশী কাল নজরুল ইস্‌লাম কলকাতার বাইরে ছিল। অনেকে যে মনে করেন নজরুল আর মোহিতলালের বন্ধুত্ব বছরের পর বছর টিকে ছিল তা সত্য নয়।

এখন আমি বলব কি ক'রে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইস্‌লামের প্রথম পরিচয় হলো এবং তাঁরা পরস্পরের বন্ধু হলেন। বিখ্যাত লেখক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর "কল্লোল যুগ" নামক পুস্তকে যে লিখেছেন "নজরুলের গুরু ছিলেন এই মোহিতলাল। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান নজরুলকে।" ('কল্লোল যুগ', চতুর্থ মুদ্রণ, ৫২ পৃষ্ঠা)। আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে আমি লিখেছি যে এটা ভুল তথ্য। শেষ দেখা হওয়ার প্রায় ৩০।৩২ বছর পরে তাঁর সঙ্গে আমার আবার একদিন দেখা হয়েছিল। তখন তিনি আমায় বলেছিলেন যে আমার পুস্তক তিনি পড়েছেন। আরও অনেকে তাঁর এই ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। "কল্লোল যুগের" পরবর্তী মুদ্রণে আশা করি তিনি তাঁর এই ভুলের সংশোধন ক'রে দিবেন। নজরুল সম্বন্ধে তিনি এখন একখানা পুস্তকও লিখছেন। তাতেও তাঁর এই ভুল আর থাকবেনা এই আশা নিশ্চয় করা যায়। 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদককে লেখা মোহিতলালের পত্রখানা আগে অচিন্ত্যকুমারের পড়া থাকলে নিশ্চয় তিনি ভুল করতেন না।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভুল শোধরাতে গিয়ে আমার মনে হয় জানাব আজহার উদ্দীন খানও ভুল করেছেন। তিনি যে লিখেছেন "একদিন কবি করুণানিধানের বাসায় মোহিতলাল

'মোসলেম ভারতের' কয়েকটি সংখ্যা ওলটাতে ওলটাতে নজরুল ইস্‌লামের 'নিকটে' * কবিতার 'রিমঝিমিয়ে'-এর সঙ্গে 'সিঞ্জিনীয়ে' মিল দেখে কবির প্রতি আকৃষ্ট হন।" (বাংলা সাহিত্যে নজরুল, বহুল পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৬ পৃষ্ঠা)। নীচে আমি যে মোহিতলালের সুদীর্ঘ পত্রখানা পুরোপুরি তু'লে দিচ্ছি তাতে কিন্তু আজ্‌হার উদ্দীন সাহেবের কথা সমর্থিত হয় নি।

একখানি পত্র

('মোসলেম ভারত'কে লিখিত)

॥ শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ॥

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া যে আনন্দ আশা ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছি তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটী লিখিয়া পাঠাইলাম, যদি আবশ্যক মনে করেন পত্রিকায় মুদ্রিত করিবেন।

মুসলমান সমাজের নব জাগরণের অনেক লক্ষণ সর্বত্র দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে সেই লক্ষণ নিশ্চয় হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধনায়। আমি যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে আপনার এই 'মোসলেম ভারত' পত্রে সে সাধনার সিদ্ধির পরিচয় আছে। নিশ্চয়ই নির্জন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রকাশ সাধনার অবকাশে মুসলমান ভ্রাতৃগণ

* এই কবিতাটির 'নিকটে' নামকরণ কে করলেন, এবং কেন করলেন, তা জানিনে। তবে 'মোসলেম ভারতে' কবিতাটি 'বাদল প্রাতের শরাব' নামে ছাপা হয়েছিল। মোহিতলাল তাঁর পত্রে এই নামেরই উল্লেখ করেছেন। (লেখক)

পূর্ব হইতেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, নতুবা সহসা এমন সুন্দর ভাষা ও উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভব হইত না।

আমার অনেক দিন হইতে একটা ক্ষোভ ছিল এই, যে বাঙ্গালী হইয়া মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন থাকায়, মুসলমানগণ আমাদের এই সর্বাপেক্ষা গৌরবের ধন সাহিত্য ও ভাষাকে তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছেন না, এবং নিজেরাও তাঁহাদের হৃদয়নিহিত মনুষ্যত্বের, স্বধর্ম ও স্বকীয় সাধনার বিশিষ্ট সৌন্দর্যের অবাধ স্ফূর্তির অভাবে প্রাণে-মনে পঙ্গু হইয়া রহিলেন। কেননা, পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, যে শব্দ, যে বাণী মানবাত্মার হৃদয় রহস্যের একমাত্র প্রকাশ-পন্থা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিরঞ্জন গুহাশায়ী অন্তরদেবতা জীবনলীলায় মূর্তি ধারণ করেন—সেই বাক্, সেই ব্যক্তিত্বাব-গুণ্ঠিত ব্রহ্মের আত্মসৃষ্টি বা আত্মপ্রসারের আদি চেষ্টা মাতৃভাষাতেই সম্ভব। সেই বাণীকে অবহেলা করিলে আপনাকেই হারাইতে হয়। আত্মবিস্মৃত মুসলমান-সমাজ যেন যুগ ধর্ম বশে অবশে অজ্ঞাতে সেই সাধনমন্ত্র প্রাণ-কর্ণে শুনিয়াছেন, তাই আজ বোধ হইতেছে, তাঁহারা আপনাকে এবং জাতিকে এতদিনে চিনিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে আমাদিগকেও সেই সত্য-সুন্দর বিচিত্র-মধুর স্ব-রূপ দেখাইতে সমর্থ হইবেন। নহিলে এই সাহিত্য সাধনার মধ্যে তাঁহারা যে খাঁটী বাঙ্গালী এই প্রচ্ছন্ন সত্য কেমন করিয়া এমন প্রকট হইয়া উঠিল ?

এইবার এক নূতন রসধারা, নবজীবনের আবেগ-প্রবাহে, আমার এই অতি আদরের, আজন্ম-সাধনার, শ্রেষ্ঠ অনুচিকীর্ষার ধন বঙ্গ সাহিত্যের অকাল প্রৌঢ়ত্ব মোচন করিয়া, তাহার অঙ্গে অঙ্গে যৌবন-হিল্লোল সঞ্চারিত করিবে। পারস্যের গোলাব-বাগিচার বুলবুল তাহার বৈতালিক হইবে, আরবের মরুপ্রান্তরে দূর মরুদ্যানের খর্জুরকুঞ্জের আড়াল দিয়া যে বৃহৎ চন্দ্রোদয় হয়,

তাহার আলোকে বঙ্গ ভারতীর জরীন শাড়ী ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিবে। অনন্ত বালুরাশির দৈনন্দিন দহনজ্বালা, নিরুদ্দেশ মরুসমীরণের প্রদোষকালীন হাহাশ্বাস, নিশীথ আকাশের দিগন্ত বিসর্পী মহামৌনী নক্ষত্রসভা—জাগরণ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির ত্রিসন্ধ্যার ত্রিবিধ মন্ত্রে বঙ্গ ভারতীর অর্চনারতি হইবে। একটা অভিনব সম্ভাবনা, অপূর্ব সম্পদ নূতন সুর সংযোজনার আশা আমাকে সত্যই চঞ্চল করিয়াছে।

পত্রিকার প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনার মত সুন্দর কিছু এ পর্যন্ত চোখে পড়ে নাই। যেন, সাহিত্যের যে নব সাধনায় আপনারা ব্রতী হইয়াছেন, তাহার ভাবগত আদর্শকে তুলিকার সাহায্যে চক্ষুগোচর করা হইয়াছে,—কি সুসংগত সুষমা! বাণীর কি পবিত্র সুন্দর পুষ্পপীঠিকা! আমার নিবেদন, যদি সম্ভব হয়, তবে জগদ্‌বিখ্যাত পারস্য কারুশিল্পের (decorative art) এই জাতীয় চিত্রলিপি মুদ্রিত করিবেন; পারস্যের art-idea'র এই চাক্ষুষ বিগ্রহের সহিত বঙ্গীয় পাঠকের পরিচয় সাধন করিবার অন্য উপায় দেখি না।

মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্ব-শ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহু দিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তি-শালিনী—এক কথায়, সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি, এবং

আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক-সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি। বাঙ্গলার কবি-মালঞ্চে আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে, মলয় সমীরণের অভাবে ব্যজনী বীজন চলিয়াছে। এহেন সময়ে নূতন দিক হইতে নূতন হাওয়া বহিতে দেখিয়া গুমটক্লিষ্ট প্রাণে বড়ই আরাম পাইয়াছি। বাঙ্গলা কাব্যলক্ষ্মীর ভূষণ-শিঞ্জন, তাহার নটিনীলাঞ্ছন নৃত্যলীলা ও নূপুরনিক্কণ মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন শব্দসমষ্টি, কৃত্রিম নিয়মশৃঙ্খলিত নীরস কঠিন ধাতুর আওয়াজ, মানব কণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগম্ভীর জীবনোল্লাসময় স্বরবৈচিত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে; অসংখ্য কাব্যরসমাত্রবঞ্চিত অসার অপদার্থ কবি-যশঃ প্রার্থীর ঝিল্লির স্বরে বাঙ্গলা-কাব্যে অকাল সন্ধ্যার অবসাদ নির্জীবতা সূচিত হইতেছে। আপনার পত্রিকাতেও হিন্দু কবির সেই ঝিল্লিধ্বনি আছে। কিন্তু কাজী সাহেবের যে দুইটি কবিতা (অন্যগুলি পড়িবার সৌভাগ্য এখনও হয় নাই) পড়িলাম, তাহা দ্বারা মোসলেম ভারতের গৌরব রক্ষা হইয়াছে, বাঙ্গলা কবিতার মান বাঁচিয়াছে, লেখক ও পাঠকের মধ্যে চিত্তবিনিময় হইয়াছে!

কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এক কালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠ ভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকৃতি ও হৃদস্পন্দনের সহচর না হইয়া, ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ প্রীতিকর প্রাণহীন চারু চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার

হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া, মানবকণ্ঠের স্বর সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও, মাত্রা বিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথায়ও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—এই প্রকৃত কবি শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটী আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায়, যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতি প্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,—

আবুবকর উসমান উমর আলী হাইদর
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারি গান 'লা শরীক আল্লাহ্'!

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযারী শব্দ বিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে; বিশেষ এ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য 'লা শরীক আল্লাহ্' যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রযোগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য-যোজনা বাঙ্গলা কবিতায় কি অভিনর ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে!

"বাদল প্রাতের শরাব" শীর্ষক কবিতায় ইরানের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটীতেও কবির 'মস্ত্‌' হইবার ও 'মস্ত্‌' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেই ইহার উচ্ছল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।

পরিশেষে একটী বিনীত নিবেদন আছে। যে সকল ফার্সী শব্দ দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার আচার প্রথার সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমানের নিজ ভাষায় পরিণত হইয়াছে, যেগুলি না থাকিলে মুসলমান-জীবনের বাস্তব চিত্র বঙ্গ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিবে না, এবং অনেক স্থলে যে শব্দগুলিই ভাষার একটী ভঙ্গিরূপে পরিগণিত হইবে—সেই গুলিকে আমাদের মত নিরক্ষর হিন্দু পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য (অন্ততঃ প্রথম কিছু দিন) কি উপায় করিতে পারেন ? নমস্কারান্তে নিবেদন ইতি। ('মোসলেম ভারত,' ভাদ্র, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ ; আগস্ট, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ)।

কবি মোহিতলাল মজুমদারের সুদীর্ঘ পত্রে কোনো তারিখ দেওয়া ছিল না। তবে 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক এই পত্রখানা শ্রাবণ (১৩২৭) মাসে পেয়েই তা প্রেসে পাঠিয়েছিলেন। তাতে ভাদ্র (১৩২৭) মাসের 'মোসলেম ভারতে' পত্রখানা ছাপা হয়ে যায়। লিখিত ভাবে মোহিতলাল নজরুল ইস্‌লামের এই যে গুণকীর্তন করলেন তাই হয়েছিল তাঁদের মধ্যে মুখোমুখী পরিচয়ের সূত্র। তার আগে মোহিতলাল যে নজরুলকে চিনতেন না তা তাঁর পত্র হতেই বোঝা যায়। নজরুল ইস্‌লামও মোহিতলালকে চিনত না। অবশ্য দু'জনাই দু'জনার নাম পত্রিকায় পড়েছেন।

মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইস্‌লামের প্রথম সাক্ষাৎ

মোহিতলালের লেখা পড়ার পরে আমরা খবর নিয়ে জেনেছিলেম যে তিনি নজরুলের চেয়ে বয়সে বড়। নজরুলের বয়স

ছিল তখন একুশ, আর মোহিতলালের বত্রিশ। আমরা যারা তখন নজরুলের বন্ধু ছিলাম,—আমাদের মত হলো যে মোহিতলালের এই গুণগ্রাহিতার পরে নজরুলেরই উচিত প্রথমে গিয়ে মোহিত-লালের সঙ্গে দেখা করা, বিশেষ ক'রে সে যখন তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট।

নজরুল আর আমি তখন ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটে (এখন নওয়াব আবত্নর রহমান স্ট্রীট) থাকি। একদিন সন্ধ্যার পরে নজরুল মোহিতলালের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমহার্স্ট স্ট্রীটে গেল। নিশ্চয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ, সে ছাড়া আর কেই বা তাকে নিয়ে যেতে পারত? সে-সন্ধ্যায়ই মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়েছিল। দীর্ঘ সময় তাঁরা কথাবার্তাও বলেছিলেন। কোথায় বসে তাঁরা আলাপ করেছিলেন তা জানিনে। শুনেছিলেম যেখানে মোহিতলাল থাকতেন সেখানে বাইরের কাউকে নিয়ে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করার সুবিধা ছিল না। খুব সম্ভবত কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায়ের দাওয়াইখানায় তাঁরা ব'সে থাকবেন।

নজরুল রাত্রে ফিরে এসে সব খবর আমায় দিল। বলল, অনেক সব সাহিত্যিকের সম্বন্ধে মোহিতলালের মনোভাব খুবই তিক্ত। তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই তাঁর তীব্র অভিযোগ। নজরুলকে তিনি বলেছেন যে তাকে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে। তার জনপ্রিয়তা কেউ সহ্য করতে চাইবেন না, ইত্যাদি। সর্বোপরি, মোহিতলাল নজরুলকে দিয়ে ওয়াদা করিয়ে নিয়েছিলেন যে নজরুল কিছুতেই তার লেখা "প্রবাসী"তে ছাপাবে না। নজরুলের মুখে এই সব কথা শুনে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেম। আমি কেবলই ভাবছিলেম প্রথম সাক্ষাতেই কি ক'রে মোহিতলাল এত সব কথা নজরুলকে বলতে পারলেন? কতটা তিনি চিনেছিলেন নজরুলকে? তার ওপরে নজরুলকে দিয়ে তিনি যে 'প্রবাসী'তে লেখা

না-ছাপানোর ওয়াদা করিয়ে নিলেন এটা কি ভালো কাজ করলেন তিনি ? 'প্রবাসী'র তখন প্রতিষ্ঠা ও প্রচার দু'-ই বেশী। 'প্রবাসী'তে লেখা না ছাপালে নজরুল ইস্‌লামের মতো একজন উদীয়মান কবি কি ক'রে কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ? সেকালে অনেকেই এই ধরনের ধারণা মনে পোষণ করতেন। অনেক কাল পরে শ্রীসজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি'তে পড়েছি, তাঁর কবিতা 'প্রবাসী'তে ছাপানোর জন্যে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও তা প্রেসে পাঠানোর দায়িত্ব যাঁদের ছিল তাঁরা কিছুতেই তা প্রেসে পাঠাচ্ছিলেন না। তখন শ্রীসজনীকান্ত তাঁদের রেস্তোরাঁর মাংস খাইয়ে তাঁর প্রথম কবিতা 'প্রবাসী'তে ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি একান্ত মনে কামনা করছিলেম যে নজরুল ইস্‌লাম কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হো'ক। কাজেই, মোহিতলালের ওই রকম ওয়াদা করানোতে আমি মনে মনে চিন্তিত হয়েছিলেম।

অন্য দিক হতে ব্যাপারটা বিবেচনা ক'রে আমরা দেখলাম যে মোহিতলাল নজরুলের গুণগ্রাহী। যখন তাঁর ও নজরুলের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না তখনও তিনি 'মোসলেম ভারতে' পত্র লিখে উচ্ছ্বসিত ভাষায় নজরুলের গুণগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য, শান্তিনিকেতন হতে শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরীও ওই রকম পত্র লিখেছিলেন এবং আরও কেউ কেউ লিখেছিলেন। তবে, কবি হিসাবে মোহিতলালের তখনও বেশ নাম। তার ওপরে, তিনি সাহিত্যের একজন আলোচকও বটেন। এইভাবেই আমরা মনের সঙ্গে একটা সমঝতা ক'রে নিলাম যদিও মনে একটা খুঁত খুঁত থেকেই গেল।

প্রথম সাক্ষাতের পরে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার আমাদের বাসায় আসতে লাগলেন। যতটা মনে মনে হিসাব করতে পারছি তাতে সময়টা ছিল ১৯২০ সালের আগস্ট মাসের শেষ ভাগ কিংবা সেপ্টেম্বর মাসের আরম্ভ। মোহিতলাল তখন নেবুতলার ক্যালকাটা

হাইস্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। তাঁর স্কুল ছুটি হওয়ার পরেই তিনি আমাদের ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটে আসতেন। 'নবযুগ' বা'র করার পরে বিকালে আমাদের অবসর থাকত, তাঁরও স্কুল তখন ছুটি হয়ে যেত। কোনো কোনো দিন বিকালে আমরা ৩২, কলেজ স্ট্রীটে যেতাম। সেটা আগেই তাঁকে জানিয়ে রাখা হ'ত। সেটা হিসাব ক'রে তিনি ৩২ কলেজ স্ট্রীটেও যেতেন। তারপরে নজরুলের আড্ডার জায়গা ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে গজেন ঘোষের সাহিত্যিক আড্ডায়ও নজরুলের যাতায়াত আরম্ভ হয়। সেখানে অবশ্য মোহিতলালও যেতেন। 'বিজলী' অফিসেও নজরুল আড্ডা দিতে যেত। তাছাড়া, গান গাওয়ার জন্যেও লোকে তাকে নানান জায়গায় ডেকে নিত।

নজরুল আর আমি এক সঙ্গে ৩২, কলেজ স্ট্রীটে থেকেছি, অল্প দিন মার্কুইস লেনের একটি বাড়ীতেও থেকেছি এবং আগেই বলেছি যে ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটের বাড়ীতে মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে আমরা থাকতাম। শেষ একত্রে আমরা থেকেছি ৩/৪-সি তালতলা লেনে। এই সকল বাড়ীর মধ্যে মার্কুইস লেনের বাড়ীটি ছাড়া বাকী সব ক'টি বাড়ীতেই কবি মোহিতলাল মজুমদারের যাতায়াত ছিল। আমাদের বাড়ীতে তিনি আসতেন ব'লে এবং সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন বলে আমি তাঁকে খুব নিকট হতে দেখেছি। তাঁর কবিতার আবৃত্তি তো আমি শুনেইছি, আরও শুনেছি তাঁর নানান বিষয়ের আলোচনা। তা থেকে এটা বুঝেছিলেম যে তিনি শুধু একজন বড় কবি নন, একজন পণ্ডিত ব্যক্তিও বটেন।

ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী মোহিতলাল

মোহিতলালের এত পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সত্ত্বেও তিনি বড় ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী ছিলেন। তখন দেখেছি যে রাজা রামমোহন রায় হতে শুরু করে হেরম্ব মৈত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কাউকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে তিনি সহ্য করতেন।

তবে, রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় ১৯২০-২১ সালে নিজেকে ব্রাহ্ম বলে ঘোষণা করতেন না। কোনো হিন্দু কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কবিতা লিখেছেন সে-সব পড়তে পড়তে তিনি বলতেন রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হওয়ার কারণে কবিতাগুলিতে হিন্দু ভাব ফুটে ওঠেনি। আমার মনে হয়, ব্রাহ্মদের কথা উঠলে মোহিতলাল যেন নিজেকে ছোট করে ফেলতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে কোথায় কি বিচ্যুতি ছিল সে সব তিনি সংগ্রহ ক'রে এনে নজরুলকে পড়ে শোনাতেন। তিনি চাইতেন যে নজরুলও তাঁর মত পোষণ করুক। নজরুল কিন্তু তা মেনে নেয়নি। বাঙলা দেশের রাজনীতিতে ব্রাহ্মদের যে বড় অবদান আছে, একথা মোহিতলাল জানতেন না তা নয়, কিন্তু ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তাঁর মনের বিদ্বিষ্টভাব তিনি কিছুতেই কাটাতে পারতেন না। ১৯২০-২১ সাল বিশেষ কোনো ব্রাহ্ম আন্দোলনের যুগও ছিল না। তবুও কেন যে তাঁর মনের এই অবস্থা ছিল তা জানিনে। নজরুল ইস্‌লাম তার লেখা 'প্রবাসী'তে ছাপতে পাবেনা, এই ওয়াদা তিনি যে তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন সেটা তাঁর এই ব্রাহ্ম বিদ্বেষ হতে করিয়েছিলেন, না, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে 'প্রবাসী'র কোনো বিরোধ ঘটেছিল তা আমি কোনো দিন জানতে চাইনি। আমি বলেছি যে মোহিতলাল একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সত্যই তিনি তা ছিলেন। তবে, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্ম বিদ্বেষের এই যে খুব বেশী বাড়াবাড়ি ছিল আমার মনে হয় এটা তাঁর চরিত্রের একটা বিচ্যুতি ছিল। এই রকম বিচ্যুতি অনেকের চরিত্রেই দেখা যায়।

'প্রবাসী'তে কোনো লেখা ছাপতে পাঠাবে না, এই ওয়াদা নজরুল ইস্‌লাম যে মোহিতলালের নিকটে করেছিল, সঠিকভাবে বললে বলতে হয় যে ওয়াদাটা মোহিতলালই করিয়ে নিয়েছিলেন, সেই ওয়াদা কিন্তু নজরুল অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। যতদিন না মোহিতলালের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়নি ততদিন সে কোনো লেখাই 'প্রবাসী'তে পাঠায় নি।

মোহিতলাল মজুমদার কবিতা আবৃত্তি করতে বড় ভালো-বাসতেন। এই আবৃত্তি করার সময়ে তিনি যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। এমনই যাঁদের কবিতা আবৃত্তি করার অভ্যাস তাঁরা বোধ হয় নিজে নিজে কবিতা প'ড়ে তৃপ্তি পান না। তাই, তাঁদের শ্রোতা চাই। আমাদের বাসায় মোহিতলালকে একই কবিতা যে কতবার আবৃত্তি করতে শুনেছি তার কোনো হিসাব নেই। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মল বাজিয়ে যাওয়ার কবিতাটি তিনি বারে বারে আবৃত্তি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি মোহিতলাল আবৃত্তি করছেন সেটি হয়তো নজরুলের মুখস্থই আছে, তবুও পরম মনোযোগের সহিত মোহিতলালের আবৃত্তি নজরুলকে শুনতে হতো। আমি অকপটে স্বীকার করব যে মোহিতলালের আবৃত্তির মনযোগী শ্রোতা আমি ছিলাম না। তবে, তিনি যখন কোনো বিষয়ে আলোচনা করতেন আমি তা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করতাম। একটি প্রশ্ন বারে বারে আমার মনে ওঠে। সকল কবিকেই কি এই রকম কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে হয়? তা শোনানোর জন্যে সব সময়ে শ্রোতা কি পাওয়া যায়? মোহিতলালের এই বাড়াবাড়ি আবৃত্তিতে কেউ কি বিরক্ত হতেন না? আমার তো মনে হয় হতেন। নজরুলের সঙ্গে আমি দীর্ঘকাল থেকেছি। কেউ অনুরোধ করলেই সে নিজের কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাত। তাছাড়া, ধৈর্যশীল শ্রোতা পেলেই সে কবিতা আবৃত্তি করতে বসে যেত না।

কবি মোহিতলাল মজুমদারের যখন আমাদের বাসায় এত বেশী যাতায়াত ছিল তখন তাঁর সঙ্গে আমারও যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে তা তো স্বাভাবিক। সৌভাগ্যই বলতে হবে যে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো মনোমালিন্য ঘটেনি। কোনো রকম কথা কাটাকাটিও তাঁর সঙ্গে আমার কোনো দিন হয়নি। তাঁর কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের জন্যে আমি তাঁকে শ্রদ্ধাও করতাম। বাইরের লোকের মুখে শুনেছি তিনি আমায় অশ্রদ্ধা করতেন না। নজরুলের সঙ্গে তাঁর বিরোধের

কথা আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়ার পরে তিনি নাকি কোনো কোনো সময়ে বলেছেন যে তাঁর অভিযোগের আমি অনেক কিছু জানি। অবশ্য এটা ১৯২৩ সালে আমার জেলে যাওয়ার পরের কথা। তারপরে তাঁর সঙ্গে ১৯২৬ সালে একবার মাত্র আমার দেখা হয়েছিল।

খুব নিকট থেকে দেখে আমি তাঁকে যতটা বুঝেছিলেম তাতে তিনি অসন্তুষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিকও ছিলেন তিনি। যাঁকে তিনি ভালোবাসতেন তাঁকে সর্বদা কড়া শাসনে রাখতে চাইতেন। যে ব্যক্তি তাঁর বন্ধু হবেন তাঁর এতটুকুও নড়চড় করলে চলবে না। এই মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের বন্ধুত্ব হলো। দু'জনার মধ্যে কোনও মিল নেই। তাঁদের বয়সের পার্থক্য যে এগারো বছরের ছিল সে-কথা আমি আগেই বলেছি। দু'জনার মন-মেজাজ ও চাল-চলন সম্পূর্ণ আলাদা ছিল।

পরস্পরের চরিত্রে কোন মিল নেই, তবুও মোহিতলাল ও নজরুলের বন্ধুত্ব হলো

মোহিতলাল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে কেন্দ্র ক'রে বিচরণ করতেন। হইচই করলেও ক্ষুদ্র পরিসর স্থানে হইচই করতেন। নজরুল ইস্‌লাম বন্ধুদের নিয়ে জোর হইচই করত। সে চলা-ফেরাও করত সশব্দে। শুধু বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে সন্তুষ্ট সে থাকতে পারত না। তার বিচরণ স্থল ছিল অনেক, অনেক ব্যাপক। সে শুধু কবিতা আবৃত্তি করত না, গানও গাইত। শুরু হতেই গান তাকে বহু দূরে দূরে, জনগণের মধ্যেও নিয়ে যেত। শুধু গানের কথাই বা বলি কেন, আমি জানি যে হাওড়া জিলার বাঙালী চটকলের মজুরেরা নজরুলকে নিমন্ত্রণ করেছেন এই জন্যে যে তাঁরা নজরুলের গান তো শুনবেনই, কবিতার আবৃত্তিও শুনবেন। মোহিতলালের মতো একজন কড়া বুদ্ধিজীবীর পক্ষে এই ধরনের স্থানগুলিতে যাওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না।

অন্য দিক হতে বলতে গেলে মোহিতলাল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, আর নজরুল ছিল তাঁর প্রতি

শ্রদ্ধাশীল। এক সময়ে মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরে সেই প্রভাব তিনি সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠেছিলেন। 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদককে লেখা তাঁর পত্রে আছে :—

"বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এক কালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যা রূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতার শব্দার্থময়ী কণ্ঠ ভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদস্পন্দনের সহচর না হইয়া, ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ প্রীতিকর প্রাণহীন চারু চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির········।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব হতে মুক্ত হওয়ার পরে তাঁর সম্বন্ধেই মোহিতলাল এই সকল ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু নজরুল তাঁর মত যে পোষণ করত না তার পরিচয় তার 'দিল দরদী' কবিতা হতেই পাওয়া গিয়েছে।

দু'জন লোকের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব হওয়ার জন্যে তাঁদের চরিত্রে অনেকগুলি মিল থাকা দরকার। নজরুল ও মোহিতলাল দু'জনাই কবি ছিলেন, এই মিল ছাড়া তাঁদের চরিত্রে অন্য কোনো মিল ছিল না। তবুও যে তাঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে পেরেছিলেন তার কারণ ছিল মোহিতলালের প্রতি নজরুলের কৃতজ্ঞতাবোধ। অন্যত্র মোহিতলালের যে-পত্রখানা পুরোপুরি ছাপা হয়েছে তা থেকে সকলেই বুঝতে পারবেন যে মোহিতলালই লিখিতভাবে নজরুলের প্রথম গুণগ্রহণ ও মূল্যায়ন করেছিলেন। তাঁর এই গুণগ্রাহিতাই নজরুলকে কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বেঁধেছিল।

এটা সত্য কথা, মোহিতলাল শুধু যে নজরুলের অভিভাবক হয়ে বসতে চেয়েছিলেন তা নয়, তিনি তাকে গড়েও তুলতে

চেয়েছিলেন, অবশ্য তাঁর নিজের আকৃতিতে। সংস্কৃত কাব্য তিনি তাকে পড়ে শুনিয়েছেন। তার সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দ নিয়েও আলোচনা তিনি করেছেন। আমার ধারণা, এই ছন্দের আলোচনায় নজরুল উপকৃতও হয়েছিল। মোহিতলাল যখন ইংরেজ কবিদের বড় বড় কাব্য নজরুলের সঙ্গে ব'সে পড়তে চাইলেন তখনই তিনি করলেন ভুল। মোহিতলাল গোড়াতেই ধরে নিলেন যে নজরুল যখন মেট্রিকুলেশন পরীক্ষাও পাস করেনি তখন সে অশিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া আর কি? অতএব, তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ ক'রে নিতে হবে। এখানে তিনি কবি মোহিতলাল ছিলেন না, ছিলেন ক্যালকাটা হাই স্কুলের হেড্ মাস্টার মোহিতলাল। তিনি যখন একবার নজরুলকে অশিক্ষিত ব'লে ধ'রে নিলেন তখন তাঁর চোখে সে অশিক্ষিতই ছিল। একবারও তিনি যাচাই ক'রে বুঝতে চাইলেন না যে "পৃথিবীর পাঠশালা" হতে সে কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করেছে কিনা। আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই কারণে যে পরিচয় হওয়ার আগে যে-'কাজী সাহেবে'র কবিতার তিনি এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, পরিচয় হওয়ার পরেই কি ক'রে সেই 'কাজী সাহেবের' মাথায় তিনি ছড়ি ঘোরাতে লাগলেন! যখনই তিনি জানতে পারলেন যে নজরুল ইস্‌লাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষাই পাস নয় তখনই তিনি ধরে নিলেন যে সে তাঁর ক্যালকাটা হাইস্কুলের একজন ছাত্র। এখানেই মোহিতলাল তাঁর জীবনের একটি বড় ভুল করেছিলেন। তিনি যদি নজরুলের সঙ্গে ইংরেজি কাব্য ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন, যেমন সংস্কৃত সাহিত্য ও ছন্দ নিয়ে করেছিলেন, তবে নজরুলের ঔৎসুক্য বাড়ত এবং সে নিজে নিজেই পড়ত সে-সব কাব্য ও সাহিত্য, একেবারে যে পড়েনি তাও নয়। মজুরদের নিয়ে লেখা শেলীর কবিতার ভাব নিয়ে নজরুল কবিতাও লিখেছিল।

নজরুলের লেখা পড়লে সকলেই বুঝতে পারেন যে হিন্দুদের পুরাণ ইত্যাদির অনেক কিছু সে পড়েছিল। মহাভারতও সে পড়ে

নিয়েছিল। মুসলমানদের অনেক সব পুঁথিও তার পড়া ছিল। এই সবই সে পড়েছিল তার ছাত্র জীবনে। পড়ায় গভীর মনোযোগ না থাকলে কোনো স্কুলের ছাত্র এত সব পড়তে পারে না। তার বন্ধু জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র হতে আমরা জানতে পারছি যে পল্টনে থাকা কালেও সে খুব পড়াশুনা করত। কবি মোহিতলাল নজরুলকে কি বানাতে চেয়েছিলেন তা জানিনে, তবে আমার মতে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে নজরুল ভালো কাজই করেছিল। যে-কোনো ব্যক্তিত্ববান লোকই মোহিতলালের স্কুল মাস্টারী ও অভিভাবকত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না ক'রে পারতেন না।

১৯২১ সালে আমরা যখন ৩/৪-সি, তালতলা লেনের বাড়ীতে থাকতেম তখন মোহিতলাল আমাদের বাড়ীতে বেশী বেশী এসেছেন এবং যেদিনই এসেছেন থেকেছেনও বেশীক্ষণ। যদিও নজরুল আমায় কোনো দিন কিছু বলে নি তবুও আমার মনে হচ্ছিল যে মোহিতলালের বিরুদ্ধে নজরুলের মনে একটা বিরূপতা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে। নজরুল মোহিতলালের অভিভাবকত্ব আর যেন সহ্য করতে পারছিলনা। এক দিন এই ব্যাপারটি আরও খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ১৯২১ সালের দুর্গাপূজা উপলক্ষে মোহিতলালের স্কুল বন্ধ ছিল। এই ছুটির সময়ে তিনি ব্যারাকপুরে তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন। আমি যখন এই বিষয়টি "বিংশ শতাব্দী"তে লিখেছিলেম তখন ছুটিতে মোহিতলালের ব্যারাকপুর থাকার কথাই লিখেছিলেম। কিন্তু আমার বই (কাজী নজরুল প্রসঙ্গে) ছাপা হওয়ার সময়ে একজন বন্ধু আমায় জানালেন যে মোহিতলালের বাড়ী কাঁচরাপাড়ায়। তাই ছুটিতে তিনি নিশ্চয় কাঁচরাপাড়াতেই ছিলেন। এতে আমার মনে যে ধোঁকার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে আমি লিখেছিলেম যে "তাঁর বাড়ী ব্যারাকপুরে কিংবা কাঁচরাপাড়ার দিকে ছিল"। এখন জানতে

মোহিতলালের সম্বন্ধে নজরুলের বিরূপতার প্রথম প্রকাশ

পেরেছি যে মোহিতলালের বাড়ী কাঁচরাপাড়ায় ছিল সত্য, কিন্তু ১৯২১ (১৩২৮) সালের দুর্গাপূজার ছুটিতে তিনি ব্যারাকপুরেই ছিলেন তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে। সমসাময়িক অন্য ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি যে ছুটিটা দুর্গাপূজারই ছিল। যাক, যা আমি বলতে চেয়েছিলেম। এই ছুটির সময়ে মোহিতলাল একদিন তাঁর নব-রচিত একটি কবিতা পকেটে নিয়ে আমাদের তালতলা লেনের বাড়ীতে এলেন। কবিতাটি তিনি নজরুলকে পড়ে শোনালেনও। মোহিতলাল আশা করেছিলেন যে কবিতা শুনে নজরুল একটা আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে। আমি তাকে যতটা দেখেছি তাতে এই রকম অবস্থায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাই ছিল তার স্বভাব। আশ্চর্য এই যে সেদিন সে বিরুদ্ধ কাজই করল, অর্থাৎ কবিতা শোনার পরে তেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না। মোহিতলাল মনে মনে আহত হলেন। অবশ্য, কবিতা পড়া হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি অনেকক্ষণ বসেছিলেন। অনেক কিছু আলাপও করেছিলেন নজরুলের সঙ্গে। এর মধ্যে আমি পোশাক প'রে বাইরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেম। সময়টা বিকাল বেলা ছিল। মোহিতলাল আমাকে বললেন, 'দাঁড়ান, আমিও যাব আপনার সঙ্গে'। তিনি নজরুলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে আমার সঙ্গেই ঘর হতে বা'র হয়ে এলেন। আমাদের বাড়ী বড় রাস্তা হতে অনেকখানি ভিতরের দিকে ছিল। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে আমাকে খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন, "দেখুন, ট্রেনের পয়সা খরচ ক'রে আমি ব্যারাকপুর হতে নজরুলকে আমার নূতন লেখা কবিতা শোনাতে এসেছিলেম। কবিতা শুনে সে কোনো রকম আনন্দই প্রকাশ করল না"! নজরুল যে তার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করেছে তা তো আমি বুঝেইছিলেম, কিন্তু মর্মাহত মোহিতলালকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা ছিল না। তবে এটা যে ঝড়ের পূর্ব-লক্ষণ তা সেদিন আমি বুঝেছিলেম।

সময়টা ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর, না, অক্টোবর মাস ছিল তা আমি সঠিক বলতে পারব না, তবে দুর্গাপূজার ছুটির সময় যে ছিল তা তো আমি আগেই বলেছি। অন্যভাবে হিসাব করলে বলতে হয় যে নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের যে পরিচয় হয়েছিল তার এক বছর তখন কেটে গিয়েছিল। এই হিসাবটা আমি এখানে দিচ্ছি এই কারণে যে নজরুল আর মোহিতলালের প্রকৃত ছাড়াছাড়ি সেই দিনই হয়েছিল। তার পরেও ওই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোহিতলালের আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত চলেছিল। কিন্তু সেই যাতায়াতে কোনও আন্তরিকতা ছিল না। মোহিতলাল মজুমদারের অভিভাবকত্বের ভার নজরুল ইস্‌লাম আর কিছুতেই বহন করতে পারছিল না। এই অভিভাবকত্ব হ'তে বার হয়ে আসা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনও হয়ে পড়েছিল। যদি সে এইভাবে বা'র না হয়ে আসত তবে সে কাব্য ও সাহিত্য জগতে বেঁচে থাকতে পারত না। সত্য সত্য নজরুল সেদিন বেঁচে গিয়েছিল। সে প্রকৃতই সেদিন নিজেকে মুক্ত ও স্বাধীন ভাবতে পারছিল। মোহিতলালের মন জুগিয়ে চলা যে কী দুঃসহ ও দুঃসাধ্য কাজ ছিল সেটা যাঁরা খুব নিকট থেকে নজরুল-মোহিতলালকে দেখেননি তাঁরা বোঝেননি। শুধু সাহিত্যিক আড্ডায় ব'সে এ ব্যাপার বোঝা যায় না।

কবি মোহিতলাল মজুমদারের জীবনে এই রকম বন্ধু-বিচ্ছেদ বারে বারে ঘটেছে। এ-ব্যাপারে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমি যা বুঝেছিলাম তাতে নজরুলের ব্যাপারটা তাঁর নিকটে আলাদা ছিল। নজরুল তাঁর বয়োকনিষ্ঠ ও একান্ত অনুগত বন্ধু ছিল। তাকে তিনি নিজের আকৃতিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সব কিছুর উপরে তিনি তাকে ভালোওবেসে ফেলেছিলেন। কাজেই, নজরুলের সঙ্গে ছাড়াছাড়িতে তাঁর প্রাণে যে গভীর ভাবে বেজেছিল তা আর কে কতটা বুঝেছিলেন আমি জানিনে, কিন্তু বহু দিন তাঁদের সান্নিধ্যে বসার কারণে আমি তার গভীরত্ব অনুভব

করতে পেরেছিলেম। সেদিন আমি মনে মনে মোহিতলালের জন্যে সত্যই বেদনা অনুভব করেছিলেম। পসন্দ আর অ-পসন্দর ভাবটা এত কঠোরতার সহিত তাঁর ভিতরে বিদ্যমান ছিল যে মনে হতো সেটা যেন তাঁর মজ্জাগত। অন্যদের সমালোচনা তিনি অবলীলাক্রমে ক'রে যেতেন, কিন্তু তাঁর নিজের সমালোচনা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বন্ধুকে তাঁর কথা মেনেই চলতে হবে, এতটুকুও এধার-ওধার হলে চলবে না। চরিত্রগতভাবে তিনি একজন অসন্তুষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা অসুখী না হয়ে পারেন না। অসুখী ব্যক্তিই ছিলেন তিনি।

আমি আগেই বলেছি, ১৯২১ সালের সেই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের পরে মোহিতলাল যে আমাদের বাড়ীতে যেতেন, তাঁর সেই যাওয়ার ভিতরে কোনো রকম অন্তরের প্রেরণা ছিল না। তবুও নজরুলকে তিনি এত সহজে ছাড়তে পারছিলেন না ব'লে আসা-যাওয়াটা তিনি বজায় রেখেছিলেন। এইভাবে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ বা খ্রীস্টমাস সপ্তাহ এসে যায়। ব্রিটিশ আমলে এই সময়ে স্কুল-কলেজ ও অফিস-আদালত কয়েক দিনের ছুটি হতো। খ্রীস্টানদের এটা বড় দিন ব'লে সাধারণভাবে এই ছুটিকে বড়দিনের ছুটি বলা হতো। এই সময়ে নজরুল ইস্‌লাম রচনা করল তার বিখ্যাত "বিদ্রোহী" কবিতা।

"বিদ্রোহী" কবিতা রচনার বিবরণ দেওয়ার আগে আমার একটা ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে লিখেছি যে ১৯২১ সালের দুর্গাপূজার কাছাকাছি সময়ে (তার আগের বা পরের কোনো মাসে) নজরুল ইস্‌লাম তার "বিদ্রোহী" কবিতা রচনা করেছিল। এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল তথ্য। এই তথ্য পরিবেশন করে আমি বড় অন্যায় কাজ করেছি। নজরুল তখন আমার সঙ্গে থাকত ব'লে সকলে

"বিদ্রোহী" রচনার ভুল সময় দেওয়া সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ

আমার দেওয়া তথ্যকেই সঠিক তথ্য হিসাবে ধ'রে নিয়েছেন। নজরুলের চরিতকাররাও এই তথ্যই তাঁদের আপন আপন পুস্তকে লিখেছেন। ধরতে গেলে সমস্ত বাঙলা দেশের (পাকিস্তানসহ) মাথার ভিতরেই আমি একটি ভুল তথ্য ঢুকিয়ে দিয়েছি। ভুল তথ্য তো আমি এখানে নিশ্চয় সংশোধন করে দেব, কিন্তু আমাকে দিয়ে যে অন্যায় কাজটি হয়ে গেছে তার প্রতিকার যে কি করে হবে আমি তা জানিনে। আরও কিঞ্চিৎ সাবধান হলে আমার এ ভুল হতো না। এই অসাবধানতার জন্যে আমি মর্মান্তিকরূপে দুঃখিত।

আসলে "বিদ্রোহী" কবিতা রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। সব হিসাব খতিয়ে এবং সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে বেরিয়ে আসছে যে এটাই ছিল কবিতাটির রচনার সময়। শুধু একটি ঘটনাকে আমি নজরে রেখেছিলেম বলেই আমার এই ভুলটা হয়েছিল। "বিদ্রোহী" কবিতা প্রথম ছাপা হয়েছিল "বিজলী" নামক সাপ্তাহিক কাগজে। সেই সময়ে বৃষ্টি হয়েছিল। এই বৃষ্টিটাই আমার স্মৃতিতে আটকে ছিল। তা থেকে সঙ্গে সঙ্গে মনে এসেছিল যে বৃষ্টি হওয়া সম্ভব তো শরৎ কালেই। এই কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গাপূজার আগের কিংবা পরের মাসের কথা মনে উদয় হয়েছিল। সেই সময়ে যদি পুরনো "বিজলী" হাতের কাছে পেতাম তবে আমার ভুলটা কিছুতেই হতো না। তা হলে এটাও আমার মনে আসত যে কোনো কোনো বছর শীতকালেও বৃষ্টি হয়।

"বিদ্রোহী" কবিতার রচনার প্রকৃত সময় ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ

আমাদের ৩/৪-সি তালতলা লেনের বাড়ীটি ছিল চারখানা ঘরের একটি পুরো দোতালা বাড়ী। তার দোতালায় দুখানা ঘর ও নীচের তলায় দু'খানা ঘর ছিল। পুরো বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছিলেন ত্রিপুরা জিলার পশ্চিমগাঁর নওয়াব ফয়জুন্নিসা চৌধুরানীর নাতিরা (দৌহিত্ররা)। তাঁরা নীচের দু'খানা ঘর আমাদের ভাড়া

দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে নীচেরও একখানা ঘরের তাঁদের দরকার হয়। তখন নজরুল আর আমি নীচের তলার পুব দিকের, অর্থাৎ বাড়ীর নীচেকার দক্ষিণ-পূব কোণের ঘরটি নিয়ে থাকি। এই ঘরেই কাজী নজরুল ইস্‌লাম তার "বিদ্রোহী" কবিতাটি লিখেছিল। সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রিতে। রাত্রির কোন সময়ে তা আমি জানিনে। রাত দশটার পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধু'য়ে এসে আমি বসেছি এমন সময়ে নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনাল। "বিদ্রোহী" কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমি কী যে বলব তা জানিনে। কোনো দিন কোনো বিষয়ে আমি উচ্ছ্বসিত হতে পারি না। যে-লোক প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তার সামনা-সামনি তাকে প্রশংসা করাও আমাকে দিয়ে হয়ে উঠে না। তার অগোচরে অবশ্য আমি তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠি। আমার এই স্বভাবের জন্যে আমি পীড়া বোধ করি বটে, তবুও স্বভাব আমার কিছুতেই বদলাল না। নজরুল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাকেই প্রথম পড়ে শোনাল, অথচ, আমার স্বভাবের দোষে না পারলাম তাকে আমি কোনো বাহ্‌বা দিতে, না পারলাম এতটুকুও উচ্ছ্বসিত হতে। কী যে কথা আমি উচ্চারণ করেছিলেম তা এখন আমার মনেও পড়ছে না। আমার স্বভাবটা যদিও নজরুলের অজানা ছিল না, তবুও সে মনে মনে আহত যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় নজরুল ইস্‌লাম শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কবিতাটি লিখেছিল। তা না হলে এত সকালে সে আমায় কবিতা পড়ে শোনাতে পারত না। তার ঘুম সাধারণত দেরীতেই ভাঙত, আমার মত তাড়াতাড়ি তার ঘুম ভাঙত না। এখন থেকে চুয়াল্লিশ বছর

"বিদ্রোহী" কবিতা ৩।৪-সি, তালতলা লেনের বাড়ীতে রচিত হলো—আমি তার প্রথম শ্রোতা, কিন্তু নিজের স্বভাব-দোষে নিরুত্তাপ-শ্রোতা

আগে নজরুলের কিংবা আমার ফাউণ্টেন পেন্ ছিল না। দোয়াতে বারে বারে কলম ডোবাতে গিয়ে তার মাথার সঙ্গে তার হাত তাল রাখতে পারবে না, এই ভেবেই সম্ভবত সে কবিতাটি প্রথমে পেন্সিলে লিখেছিল।

সামান্য কিছু বেলা হতে 'মোসলেম ভারতে'র আফ্‌জালুল হক সাহেব আমাদের বাড়ীতে এলেন। নজরুল তাঁকেও কবিতাটি পড়ে শোনাল। তিনি তা শুনে খুব হইচই শুরু করে দিলেন, আর বললেন, "এখনই কপি ক'রে দিন কবিতাটি, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।" পরম ধৈর্যের সহিত কবিতাটি কপি ক'রে নজরুল তা আফ্‌জাল সাহেবকে দিল। তিনি এই কপিটি নিয়ে চলে গেলেন। আফ্‌জালুল হক সাহেব চ'লে যাওয়ার পরে আমিও বাইরে চলে যাই। তার পরে বাড়ীতে ফিরে আসি বারোটার কিছু আগে। আসা মাত্রই নজরুল আমায় জানাল যে "অবিনাশদা (বারীন ঘোষেদের বোমার মামলার সহবন্দী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য) এসেছিলেন। তিনি কবিতাটি শুনে বললেন", "তুমি পাগল হয়েছ নজরুল, আফ্‌জালের কাগজ কখন বা'র হবে তার স্থিরতা নেই, কপি ক'রে দাও "বিজলী"তে ছেপে দিই আগে।" তাঁকেও নজরুল সেই পেন্সিলের লেখা হতেই কবিতাটি কপি ক'রে দিয়েছিল। ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারী (মুতাবিক ২২শে পৌষ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) তারিখ, শুক্রবারে "বিদ্রোহী" "বিজলী"তেই প্রথম ছাপা হয়েছিল। বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কাগজের চাহিদা এত বেশী হয়েছিল যে শুনেছিলেম সেই সপ্তাহের কাগজ দু'বার ছাপা হয়েছিল। অনেকে যে লিখেছেন "বিদ্রোহী" "মোসলেম ভারতে" প্রথম ছাপা হয়েছিল সেটা ভুল। আফ্‌জাল সাহেব কার্তিকের "মোসলেম ভারতে"র জন্যে যখন কপি নিয়ে গিয়েছিলেন তখন পৌষ মাস ছিল। আমার ধারণা, তাঁর কার্তিক সংখ্যা ফাল্গুন মাসের আগে

"বিদ্রোহী" প্রথম সাপ্তাহিক "বিজলী"তেই ছাপা হয়েছিল,—'মোসলেম ভারতে' নয়

বা'র হয়নি। 'মোসলেম ভারত' নিয়মিত বা'র হত কিনা সেটা আজ যাঁরা নজরুল সম্বন্ধে লিখছেন তাঁরা কি ক'রে বুঝবেন? তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন কার্তিক (১৩২৮) মাসের "মোস্‌লেম ভারতে" "বিদ্রোহী" ছাপা হয়েছিল, আর ছাপা হয়েছিল ২২শে পৌষের (১৩২৮) "বিজলী"তে। কাজেই তাঁদের পক্ষে এটাই ধরে নেওয়া হিসাব সঙ্গত যে "মোসলেম ভারতে"ই "বিদ্রোহী" প্রথম ছাপা হয়েছিল। আসলে কিন্তু পৌষ মাসের (ডিসেম্বর, ১৯২১ মাসের শেষ সপ্তাহের) আগে নজরুল ইস্‌লাম তার 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনাই করে নি। কাজেই, "বিদ্রোহী" প্রথম ছাপানোর সম্মান সাপ্তাহিক 'বিজলী'রই প্রাপ্য। তবে, কবিতাটি কার্তিক সংখ্যার "মোসলেম ভারতে" ছাপানোর জন্যেই নজরুল প্রথমে আফজালুল হক সাহেবকে দিয়েছিল। সেই জন্যে এই কার্তিক সংখ্যার "মোসলেম ভারতে"র নামোল্লেখ করেই "বিজলী" কবিতাটি প্রথম ছেপেছিল, যদিও কার্তিক মাসের "মোসলেম ভারত" কখন ছাপা হবে তা কেউ সেই পৌষ মাসেও জানতেন না।

আবার শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যও "মাসিক বসুমতী"তে (কার্তিক, ১৩৬২) পুরানো কথা লিখতে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে খানিকটা তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন পেন্সিলে লেখা কবিতাটি নিয়ে শুধু তাঁকে শোনাবার জন্যেই নজরুল তাঁদের প্রেসে গিয়েছিল। তিনিই জোর ক'রে কবিতাটি "বিজলী"র জন্যে রেখে দেন। এই বিষয়ে নজরুল আমায় যা বলেছিল তা আমি ওপরে লিখেছি। অবিনাশ বাবু বলছেন নজরুল পড়ছিল, আর তিনি তার শ্রুতিলিখন করছিলেন। নজরুল কখনও এইভাবে কবিতা ছাপতে দিতনা। সে নিজ হাতে কপি ক'রে কবিতা ছাপতে দিত। "বিদ্রোহী"র বেলায়ও সে পেন্সিলের লেখা হতে নিজে কালিতে লিখে সেই কপি অবিনাশ বাবুকে দিয়েছিল। ঘটনার চৌত্রিশ বছর পরে এই সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর স্মৃতি

তাঁকে বিভ্রমে ফেলেছিল। আসলে অবিনাশবাবু নজরুলের আপন হাতের কপি করা "বিদ্রোহী" কবিতা "বিজলী"তে ছাপতে নিয়ে গিয়েছিলেন। নজরুল আমায় তাই বলেছিল। তিনি পেন্সিলের লেখা যে দেখেছিলেন সে কথা ঠিকই। আবার কোনো এক কাগজে (আমি নিজে পড়িনি) শ্রীনলিনীকান্ত সরকার নাকি লিখেছিলেন যে "বিদ্রোহী" কবিতা "বিজলী"তে ছাপানোর জন্যে তিনিই নজরুলের নিকট হতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে নিয়েছিলেন তো অবিনাশ বাবুই, কিন্তু শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের হঠাৎ মনে এসেছিল যে তিনিই যখন নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং "বিজলী"তেও ছিলেন তখন তাঁরই তো "বিদ্রোহী" কবিতা "বিজলী"র জন্যে নিয়ে যাওয়ার কথা। এই কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কথাটা কাগজে ছেপে দিয়েছিলেন। এই ভাবেই স্মৃতি মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

'বিদ্রোহী' ছাপা হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎকারের কথাও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন এবং নজরুলের মুখে শুনেই লিখেছেন। তাতে আছে, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে পড়ে শোনানোর পরে তিনি নজরুলকে বুকে চেপে ধরেছিলেন। নজরুল আমাকে এই খবর দেয় নি। তবে, আমাকে কথাটা না বলার কারণ হয়তো এই ছিল যে আমি তার কবিতার প্রথম শ্রোতা হয়েও কোনো আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিনি। অবিনাশবাবু লিখেছেন, ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে নজরুল নীচে থেকেই "গুরুজী, গুরুজী" বলে চেঁচিয়েছিল। অবিনাশ বাবু হয়তো ভুল বুঝেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে কেউ "গুরুজী" ডাকতেন না, ডাকতেন "গুরুদেব"।

শ্রীঅবিনাচশন্দ্র ভট্টাচার্য আজ আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই।

'বিদ্রোহী' রচনার সময়ে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার সম্ভবত কলকাতার বাইরে ছিলেন। ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত তাঁর স্কুল বন্ধ

ছিল। আর এই বন্ধে তিনি যদি কলকাতার বাইরে নাও গিয়ে থাকেন, তবুও আমাদের বাড়ীতে তিনি ক'দিন আসেন নি। যদি আসতেন তবে তাঁকেও নিশ্চয় নজরুল কবিতাটি পড়ে শোনাত। এমন একটি কবিতা লেখার পরে মোহিতলালকে শোনাবার জন্যে নজরুল যে তাঁর খোঁজে ছুটবে সেই ভালোবাসা নজরুল আর মোহিতলালের মধ্যে তখন আর বাকী ছিল না। কাজেই, 'বিজলী'তেই মোহিতলাল "বিদ্রোহী" প্রথম পড়ে থাকবেন। সাপ্তাহিক কাগজে বা'র হওয়ার কারণেই কবিতাটির প্রচার খুব বেশী হয়েছিল। কোনো মাসিক কাগজে ছাপা হলে এত বেশী প্রচার হতোনা। শুনেছিলেম সেই সপ্তাহের "বিজলী" দু'বারে উনত্রিশ হাজার ছাপা হয়েছিল। অবশ্য, এটা আমি 'বিজলী' আফিস হতে কখনো যাচাই করিনি। ধরতে পারা যায় প্রায় দেড়-দু'লক্ষ লোক কবিতাটি পড়েছিলেন। তার ফলে নজরুলের কবি-প্রতিষ্ঠা খুব বেশী রকম বেড়ে গেল। অন্য দিক হতে কলকাতার বিভিন্ন হোস্টেলে ও বোর্ডিং হাউসে যে-সকল ছাত্ররা আর আফিসের কর্মচারীরা থাকেন তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ এসে আমাদের কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের প্রচারের কথা জানাতে লাগলেন। স্বভাবতই তাঁরা নিজেদের খুব অসুখা বোধ করছিলেন। মোহিতলাল প্রচার করছিলেন যে নজরুল ইস্‌লাম তাঁর "আমি" শীর্ষক একটি লেখার ভাব নিয়ে কবিতাটি লিখেছে, অথচ কোনো ঋণ স্বীকার করেনি। এই প্রচারটি তিনি মৌখিকভাবেই করছিলেন, অদ্ভুত সংগঠিত প্রচার। অন্তত কয়েকজন লোকও তাঁর এই প্রচারের সহায়ক না হ'লে কলকাতায় তিনি একা মৌখিক এই কথাটা ছড়িয়ে দিতে পারতেন না। শুরুতে তিনি "আমি"র ভাব নিয়ে 'বিদ্রোহী' রচনার কথাই ব'লে বেড়াচ্ছিলেন। সম্ভবত তাতে তেমন কাজ না হওয়ায় অনেক পরে তিনি বলা

'বিদ্রোহী'র কৃতিত্বে মোহিতলালের দাবী

শুরু করেছিলেন যে নজরুল তাঁর লেখার ভাব 'চুরি' করেছে। তখন অবশ্য ঋণ স্বীকার করার কথা আর বলতেন না। মোহিত-লালের পক্ষে অসুবিধা ছিল এই যে তাঁর প্রচার যাঁদের ভিতরে চলেছিল তাঁদের কেউ কখনও "আমি" পড়েন নি, আর নজরুলের "বিদ্রোহী" সকলেই পড়েছিলেন। কারণ, "বিদ্রোহী" সাপ্তাহিক "বিজলীর" পৃষ্ঠাতেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকল না, আরও অনেক পত্র-পত্রিকা "বিজলী" হ'তে "বিদ্রোহী"র পুনর্মুদ্রণ করলেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যক 'প্রবাসী'তেও তা পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ফলে, নজরুলের প্রতিষ্ঠায় কোনো আঁচড় লাগল না। তা বরঞ্চ বেড়েই চলল।

কোন সূত্র হতে মোহিতলাল তাঁর "আমি"র 'ভাব নিয়ে' বা 'ভাব চুরি' করে 'বিদ্রোহী' রচনার কথা বলছিলেন তা সকলের জানা উচিত। ১৯২০ সালে একটি ঘটনা ঘটেছিল যার সঙ্গে আমারও অতি সামান্য যোগ ছিল। মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের যে প্রথম পরিচয় হয়েছিল তার এক-দেড় মাস পরের কথা। একদিন বিকাল বেলা নজরুল আর আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসে যাই। মোহিতলালও এসেছিলেন সেখানে। আমি আগেই বলেছি যে নজরুলের সাহিত্য সমিতিতে যাওয়ার কথা আগেই সে মোহিতলালকে জানিয়ে রাখত। মোহিতলাল আফজালুল হক সাহেবের ঘরে তাঁর তখ্‌ৎপোশের উপরে বসেছিলেন। কি সব আলোচনা হচ্ছিল, তার মধ্যেই তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে সাহিত্য সমিতির লাইব্রেরীতে বাঙলা ১৩২১ সালের "মানসী" আছে কিনা। "মানসী ও মর্মবাণী" নয়, "মানসী"। প্রথমে "মানসী"ই বা'র হয়েছিল, পরে "মর্মবাণী"র সঙ্গে মানসী সংযুক্ত হয়ে "মানসী ও মর্মবাণী" নাম হয়েছিল। সাহিত্য সমিতির লাইব্রেরীতে ১৩২১ সালের 'মানসী'

মোহিতলালের "আমি"

থাকা খুবই সম্ভব এই কথা মোহিতলালকে জানিয়ে আমি লাইব্রেরীতে তা' খুঁজতে গেলাম এবং আলমারী খুলে দেখতে পেলাম যে ১৩২১ সালেরই বাঁধানো "মানসী" সেখানে রয়েছে। এই বাঁধানো "মানসী" আমি মোহিতলালকে এনে দিলাম। তিনি পৌষ মাসের "মানসী" হতে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি. এ., অর্থাৎ তাঁরই লিখিত "আমি" শীর্ষক একটি গদ্য লেখা নজরুল ইস্‌লামকে পড়ে শোনালেন। নজরুল ছাড়া আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আফজালুল হক সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা আজ আমার মনে নেই। মোহিতলাল জোরে জোরে তাঁর লেখাটি পড়েছিলেন। আগেই বলেছি যে তখ্‌ৎপোশের ওপরে বসে তিনি লেখাটি পড়ছিলেন। নজরুল খানিকটা পেছিয়ে এমনভাবে বসেছিল যে যাতে মোহিতলালের পড়ার সময়ে সে তাঁর নজরে না পড়ে। আজ স্বীকার করতে আমার এতটুকুও লজ্জা নেই যে মোহিতলালের লেখাটি আমি উপভোগ করতে পারিনি। আজকালকার সাহিত্যিক আলোচনা হতে বুঝতে পারছি যে এই ধরনের লেখাকে জীবন জিজ্ঞাসা বলা হয়। তখন আমি তাও বুঝিনি। নজরুলের বসার কায়দা হতে আমার মনে হয়েছিল যে মনোযোগ সহকারে লেখাটি শোনার জন্যে সেও প্রস্তুত ছিল না। তবে, সে কবি মানুষ। হিন্দু শাস্ত্রও তার কিছু কিছু পড়া ছিল। আমার চেয়েও মোহিতলালের লেখাটি তার অনেক ভালো বোঝার কথা। তবে, মোহিতলালকে তাঁর "আমি" একবার মাত্র পড়তে শোনার এক বছরেরও বেশী সময় পরে,—১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল তার "বিদ্রোহী" কবিতা রচনা করেছিল। একবার মাত্র শুনে এত দীর্ঘকাল পরে সে "আমি"র ভাবসম্পদ 'নিয়ে' বা 'চুরি' করে যে 'বিদ্রোহী' রচনা করেছিল আমি তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে। কারণ আমি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত

সব কিছু নিজের চোখে দেখেছি। নজরুল যদি এতই শ্রুতিধর ও প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিল যে একবার মাত্র শুনেই তার সব কিছু মুখস্থ ও আয়ত্ত হয়ে গেল তবে তার অপরের ভাব গ্রহণ বা চুরি করার প্রয়োজনই বা কি? এটা আমি মানতে রাজী আছি, মোহিতলালকে লেখাটি পড়তে শুনে তার মনে হয়তো একথাটা আসতে পারে যে এই ধরনের একটি কবিতা লেখা যায়।

মোহিতলাল বড় কবি ছিলেন, বড় পণ্ডিতও ছিলেন একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তিনি মানুষও তো ছিলেন। কোনো মানুষ যতই মহান্ হোন্ না কেন, জীবনের কোনো দুর্বল মুহূর্তে তিনি ক্ষুদ্রও হতে পারেন। নজরুল ইস্‌লাম যে তাঁর আওতা হতে, তাঁর শাসন হতে বেরিয়ে গেল তার জন্যে তিনি তার উপরে খানিকটা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। নজরুল যদি মোহিতলালের আওতায় থেকে গিয়ে তার "বিদ্রোহী" রচনা করত,—আমার বিশ্বাস যে সে কিছুতেই তা পারত না,—তা হলে "আমি"র ভাব নিয়ে বা চুরি ক'রে লেখার কোনো কথাই তিনি তুলতেন না। সেই অবস্থায় মোহিতলালই হতেন নজরুলের "বিদ্রোহী"র প্রধান প্রচারক ও গুণগ্রাহক যেমন তিনি অনেক পরে হয়েছিলেন সজনীকান্ত দাসের "ব্যাঙ" কবিতার গুণগ্রাহী ও প্রচারক। এই দিকটি তলিয়ে বোঝার চেষ্টা না করলে আজকার সমালোচকরা সঠিক সিদ্ধাতে পৌঁছাতে পারবেন না।

কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের "আমি" ১৩২১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যক "মানসী"র পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। খুব অল্প সংখ্যক লোক তা পড়েছেন। আজ যাঁরা তা পড়তে চাইবেন তাঁদের কলকাতার দু'চারটি লাইব্রেরীতেই খোঁজাখুঁজি করতে হবে। লাইব্রেরীতে যাওয়াও সকলের পক্ষে সহজ নয়। আমি তাই মোহিতলালের "আমি" ও কাজী নজরুল ইস্‌লামের "বিদ্রোহী" পাশাপাশি তুলে দিলাম। সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তিরা এবার নিজেরাই বিচার করতে পারবেন।

আমি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি. এ.

(১)

আমি বিরাট। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভো-নীলিমার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলিশোভা, ছায়াপথ আমার ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্তসীমান্তের সিন্দুরচ্ছটা, সূর্য্য আমার তৃতীয় নয়ন এবং সন্ধ্যারাগ আমার ললাট-চন্দন।

বায়ু আমার শ্বাস, আলোক আমার হাস্য জ্যোতি। আমারই অশ্রুধারায় পৃথিবী শ্যামলীকৃত। অগ্নি আমার বুভুক্ষা-শক্তি, মৃত্তিকা আমার হৃৎপিণ্ড, কাল আমার মন, জীব আমার ইন্দ্রিয়। আমি মেরুতারকার মত অচপল।

আমি ক্ষুদ্র। প্রত্যুষের শিশিরকণা আমার মুখ-মুকুর, সাগর-গর্ভের শক্তিমুক্তা আমার অভিজ্ঞান, পতঙ্গের পক্ষপত্র আমারই নামাঙ্কিত; অশ্বত্থবীজে আমার শক্তিকণা, তৃণে আমার রসপ্রবাহ, ধূলি আমার ভস্মাঙ্গরাগ।

আমি সুন্দর। শিশুর মত আমার ওষ্ঠাধর, রমণীর মত আমার কটাক্ষ, পুরুষের মত আমার ললাট, বাল্মীকির মত আমার হৃদয়। সূর্য্যাস্তশেষ প্রায়ান্ধকারে আমি শশাঙ্কলেখা, আমি তিমিরাবগুণ্ঠিতা ধরণীর নক্ষত্রস্বপ্ন। আমার কান্তি উত্তরউষার (Aurora Borealis) ন্যায়।

আমি ভীষণ—অমানিশীথের সমুদ্র, শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টি-নেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি, হত্যাকারীর স্বপ্নবিভীষিকা, ব্রাহ্মণের অভিশাপ, দম্ভান্ধ পিতৃরোষ। আমি ভীষণ—রণক্ষেত্রে রক্তোৎসবের মত, আগ্নেয়গিরির ধূমাগ্নিবমনের মত, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত, কাপালিকের নরবলির মত, সদ্যশোকের মত, অখণ্ডনীয় প্রাক্তনের মত, দুর্ভিক্ষের সচল নরকঙ্কালে আমাকে দেখিতে পাইবে, যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর ভোগলালসায় আমারই জিহ্বা লক্‌লক্ করিতেছে। আমিই মহামারী। রুধিরাক্তকৃপাণ ঘাতকের অট্টহাসিতে, মৃত-জনের শূন্যদৃষ্টি চক্ষুতারকায় আমার পরিচয় পাইবে।

আমি মধুর—জননীর প্রথম পুত্রমুখচুম্বনের মত, তৃষিত বনভূমির উপর নববরষার পুষ্পকোমল ধারাস্পর্শের মত; দিব্যমাল্যাম্বরধরা ব্রীড়াবেপথুমতী বিবাহধূমারুণ লোচনশ্রী নববধূর পানিপীড়নের মত, যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির মত, প্রণয়িনীর সরমসঙ্কোচের মত, কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির মত। আমি ম্যাডনা—বক্ষে নিমীলিত নয়ন স্তনন্ধয় শিশু; আমি সাবিত্রী অঙ্কে মৃত পতি; আমি বিদর্ভরাজ-তনয়ার প্রণয়দূত—হংস; আমি তাপসী মহাশ্বেতার নয়নসলিলার্দ্র-তন্ত্রী বীণা; আমি স্বামীর সহিত সপত্নীর মিলনে স্মিতমুখী বাসবদত্তা; আমি পতিপরিত্যক্তা "ত্বমের ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগ"—বচনা জানকী। সান্ধ্য আকাশের মেঘস্তরে আমার বসনাঞ্চল ঘুরিয়া যায়, উষার আরক্ত কপোলে আমারই লজ্জারাগ। আমি করুণার অশ্রুজল, প্রেমের আত্মত্যাগ, স্নেহের পরাজয়। আমার নত নেত্রের কিরণ সম্পাতে রজনী জোৎস্নাময়ী, আমারই সুগোপন নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে ধরণীর উপবন কুসুমিত হইয়া উঠে; আমিই সুখসপ্তের নয়ন-পল্লবে মৃণাল-বর্ত্তিকায় স্বপ্নাঞ্জন পরাইয়া দিই। আমি হৃদয়-সীমায় চুম্বনের মত জাগিয়া উঠি এবং নেত্রপ্রান্তে অশ্রুর মত ঝরিয়া যাই।

আমি আনন্দ—শরৎ প্রভাতের স্বর্ণালোক। পত্রপুষ্পে ওষধিলতায় সে আনন্দ শিহরিয়া উঠিতেছে ; ক্ষুদ্র মৃত্যু, তুচ্ছশোক, অজ্ঞান-অশ্রুর উপরে আমার আনন্দ বৃহৎ অসীম অনন্ত আকার ধারণ করিয়াছে। আমি শনির উপরে বৃহস্পতি, সয়তানের পার্শ্বে জেহোবা, আহ্রিমান ওরমজদ, মারবিজয়ী নির্ব্বাণ দেবতা। আমি শ্মশানকূলবাহিনী জাহ্নবী, নিশীথ অন্ধকারে প্রস্ফুটিত ফুলদল, অসহায় ক্রন্দনের উপাসনা। আমি ধান্তারি হিরণ্যজ্যোতি, গিরিশিলার কলনির্ঝরিণী, ধূসর মৃত্তিকার শ্যাম রোমাঞ্চ। আকাশ আমার আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারে না, আলোক কাঁপিয়া উঠিতেছে, গ্রহজগৎ অপূর্ব সঙ্গীতে তালে তালে নৃত্য করিতেছে। ধরণী ষড়ঋতুর নৃত্যচক্রে কখনও অবশ কখনও অশ্রুপ্লাবিত, কখনও হিন্দোলোৎসবে মাতিয়া উঠিতেছে। নিখিলের অশ্রুশিশির আমার হাস্যকিরণে অরুণায়মান।

আমি রহস্যময়, আমি দুর্জ্জেয়। অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে, উর্দ্ধে আকাশ ও নিম্নে জলস্থল আমার সত্ত্বায় স্তম্ভিত হইয়া আছে। দিগন্তে মৃত্যুর চক্রনেমি সুষুপ্তির রাজ্য। আকাশে অমৃত আলোকের দীপালি-উৎসব, পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবন-মরণের আলোছায়া। আমিই আলোক, আমিই অন্ধকার ; আমি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রাণশিখা, আমি অনির্ব্বান স্থির রশ্মি। আমি বৈতরণীর নাবিক, স্বচ্ছ অন্ধকারে রজতচিক্কণ খরস্রোতে আমার প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট দেখাইবে, জোৎস্নালোকে আমার মুখ গুণ্ঠনাবৃত।

আমি জগতে চেতনা দিয়া নিজে অচেতন। অস্তির মধ্যে আমি নাস্তি। আমিই বিশ্বচিত্র, আমিই তাহার চিত্রকর। আমিই হোম, আহুতি এবং হোতা। আমি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে আপনাকে আপনি অন্বেষণ করিতেছি। আমি অমৃত আস্বাদনের জন্য বিষ

পান করিয়াছি, জীবনের জন্য মৃত্যু এবং ধ্বংসের জন্য সৃষ্টি বিধান করিয়াছি। ভোগের জন্য এক হইতে বহু হইয়াছি। পূজা লইবার জন্য আপনি পূজারী হইয়াছি ; পরমানন্দের জন্য দুঃখানুভূতি এবং সত্যের জন্য মিথ্যার সৃষ্টি করিয়াছি। আমি মহাচেতনা— ক্ষুদ্রচেতনায় বিভক্ত। আমি এক অদ্বৈত শ্বাশত মহাসঙ্গীত— বিশ্ববীণার অসংখ্য তন্ত্রীর মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছি। এই গ্রহ-উপগ্রহময় বিশ্বরচনা আমার কন্দুক-ক্রীড়া। আমি জড় জগতের আকর্ষণ শক্তি, প্রাণী জগতের ক্ষুধা, এবং মানব জগতের প্রেম। পরমাণুর বিবাহে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে—আমি সেই বিবাহে প্রজাপতি, আমি স্রষ্টা, আমি ব্রহ্মা। আমি সর্ব্বভূতে আত্মরক্ষণ ধর্ম বিষ্ণুরূপে অবস্থিত। আমি মানব হৃদয়ে প্রেম—মৃত্যুঞ্জয়, আমি মহাদেব। দয়িতের জন্য, প্রিয়জনের জন্য আত্মবিসর্জন ; সন্তানের জন্য মাতৃরূপার প্রাণত্যাগ, নবীনের জন্য পুরাতনের উচ্ছেদ—আমি সেই মধুর মৃত্যু, সেই মহাপ্রেমিক, মহাকাল। আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু, আমিই আবার অমৃত ; আমিই সুখ, আমিই দুঃখ, আমিই আবার আনন্দ ; আমিই ষড়রিপু, আমিই আবার প্রেম।

(২)

আমি মৃৎপুত্তল, ধরণী আমার প্রসূতি, পশু আমার সহোদর। ঊর্দ্ধে নক্ষত্রমালিনী নিশিথিনী, নিম্নে অযুত তরঙ্গ-কোলাহল-বিক্ষুব্ধ মহাসাগর, আমি বাতাহতপক্ষ বিহঙ্গ। আকাশে সুবর্ণ-চুর্ণমুষ্টি ছিটাইয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিলে নিদ্রালস চক্ষু ঢুলিয়া পড়ে। নিম্নের গভীর বজ্রনাদী সাগর গর্জনে কর্ণ বধির হয় এবং ঝটিকান্দোলিত পক্ষ দুইটি ব্যথার ভরে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

পৃথিবী শ্যামল, আকাশ নীল ও রৌদ্র হিরণ্ময়—আমি সদ্যোদ্‌গত পক্ষ পতঙ্গ। পত্রপুষ্প তুলিতে থাকে, বায়ু মধুময় বোধ হয়, এবং বসন্তদিনের কুসুম-সঙ্গীত চিত্তহরণ করে; কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার তিমিরাবরণে যখন সকলই ঢাকিয়া যাইবে, তখন হিমসিক্ত পক্ষ দুইটি বায়ুভরে আর কাঁপিবে না। পৃথিবীর পুষ্প বীথিকায় আমার হাসি-অশ্রুর মেলা। রজনীর হিমকণা আমার বক্ষ ও আনন অভিষিক্ত করে, কখনও তাহা হইতেই সুরভির সৌরভের সঞ্চার হয়; তখন মর্ত্তের বায়ুমণ্ডল একটি প্রদোষ বা একটি প্রভাত ব্যাপিয়া আমোদিত হইয়া থাকে। শুক্লযামিনীর কৌমুদী-কিরণ ও শারদ প্রভাতের অরুণিমা যখন হৃদয়ের সহস্রদলকে পূর্ণ বিকশিত করে, যখন পাখী পঞ্চমে গায়িতে থাকে, বসন্ত বায়ুর আতপ্তশ্বাসে নয়নের অশ্রু শুকাইয়া যায়, তখনই অসহ্য পুলকে ঝরিয়া যাই। নিম্নে ধূলিতলে কি অপূর্ব্ব সমাধি-শয়ন। আবার কখনও প্রবল বাত্যা অশনিসম্পাতেও করকা-বৃষ্টি অর্দ্ধ-মুকুলিত পুষ্প-জীবন ছিন্নবৃন্ত হইয়া যায়, কালরাত্রির অন্ধকারে অকালে হারাইয়া যাই।

আমি সৃষ্টি-গ্রন্থের প্রহেলিকা। আমার হাসি ক্রন্দনের ন্যায় শোকোদ্দীপক, এবং ক্রন্দন হাসির ন্যায় চিত্তহারী। আমি নক্ষত্রলোকের গান গাই, সমগ্র বিশ্বরচনা আমার মানসপটে প্রতিবিম্বিত; আমি নূতন কল্পলোক সৃজন করিতে পারি, কিন্তু পৃথিবীর কঙ্কর কণ্টকে আমার পদতল রক্তাক্ত, পবনতাড়িত ধূলিজালে আমি অন্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমি আম-মাংসভোজী। আমি মৃত্যু জলধির উপর শয়ন করিয়া অমৃত-ইন্দুর স্বপ্ন দেখি। কিন্তু কোথায় আকাশের স্থিররশ্মি নক্ষত্রমালা, কোথায় আমার গৃহকোণের তৈলনিষেকপুষ্ট বায়ুবিকম্পিত ধূমমলিন দীপশিখা! আমি তাহারই আলোকে ছায়া ধরাধরি করিতেছি।

আমি দুর্বল অসহায়। আমার ক্ষুদ্র তনুযষ্টি মাধবী মদিরায় ঘুরিয়া পড়ে, অসহ্য শীতবাতে আমার হস্তপদ যুপবদ্ধ পশুর মত কাঁপিতে থাকে। কিন্তু আমার হৃদয়তলে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহাও নির্বাপিত হয় না—সে অগ্নিকুণ্ডে বহ্নিবিক্ষু পতঙ্গের মত ভস্মসাৎ হইয়া যাই। আপনার হৃদপিণ্ড আপনি ছিঁড়িয়া ফেলি, আকাশে দেবতা হাসিয়া উঠে। খধূপের মত ঊর্দ্ধে উঠিতে যাই, কিন্তু ভস্মাবশেষ হইয়া ধূলিচুম্বন করি। আমি কালস্রোতে অম্বুবিম্ব, প্রবল ঘূর্ণাবর্তে তৃণখণ্ড, স্রোতোবেগ কম্পিত বেতসলতা।

আমি কখনও তন্দ্রাতুর—স্বপ্নবিলাসী, কখনও কর্মবীর্য্যের অবতার। কখনও নিদ্রোত্থিত সিংহের মত জীবন-বাগুয়ার গ্রন্থিছেদনের নিষ্ফল প্রয়াস করিয়া আপনার অহঙ্কারে আপনি মত্ত হইয়া উঠি, শেষে মৃত্যু নিষাদের অব্যর্থশরে আহত হইয়া ক্লিষ্ট জীবন বিসর্জন করি। কখনও স্থির নির্বিকার হইয়া মনোরাজ্যে অধিষ্ঠান করি; তখন সোমসূর্য্য, লোকলোকান্তর, গ্রহ উপগ্রহ কিছুই আমার মনোরথের অনধিগম্য নয়। তখন বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব কৌশল ভেদ করিতে পারি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা অনুষ্টুপ ছন্দে গাঁথিয়া যাই।

আমি মূর্খ, আমি নির্ব্বোধ। বৃথা বুদ্ধির গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সরল আনন্দ ও সহজ উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই। পুষ্পমুকুল যে সৌরভস্বপ্নে বিভোর থাকে, তাহাতেই তাহার পুষ্পজীবন কাটিয়া যায়। একটু আলোক, একটু বায়ুজীবন ভিন্ন সে আর কিছুই চায় না। পাখী তাহার বসন্তগীত শেষ হইলে কোথায় চলিয়া যায়, আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুপক্ক, নিটোল স্বর্ণাভ ফল, নীল আকাশতলে পক্ষ মুক্ত করিয়া সন্তরণ, দুটি গান ও সরসী জলে পুচ্ছসংস্কার—সে আর কিছুই চায় না। কিন্তু

আমি ভোগের অনন্ত উপকরণ কোলে করিয়া কাঁদিতেছি, অতীত স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ ভয় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। নিষ্ফল স্বপ্ন ও কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া আমি আপনাকে আপনি বন্দী—করিয়াছি। জীবন আমার জন্য শোক করিতেছে, মৃত্যু অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

আমি উন্মাদ। পর্ণকুটীরে হোমাগ্নি জ্বালিয়াছি, সাগর বালুকায় গৃহরচনা করিয়াছি, আমি নিদাঘ ঝটিকায় তুলসীমূলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়াছি—আমি ভালবাসিয়াছি। হায় উন্মাদ! ক্ষয়িতমূল নদীতটে আসন্ন আঁধারে কার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছ? ধূলি ধূলিকে আলিঙ্গন করিতেছে। মৃত্যু-পুরোহিত বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। উহার নাম কি? প্রেম! মৃত্যুরোগের অব্যর্থ ঔষধ? একা থাকিলে মরিয়া যাইব, তাই আর একজনের হাত ধরিতে হইবে। এক ভিখারী আর এক ভিখারীকে অন্ন দিবে, একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইবে? বর্ষারাত্রে বজ্রবিদ্যুৎময় আকাশতলে গৃহহারা আমি কাহাকে জড়াইয়া ধরি? যখন মস্তকের উপর কৃতান্তের শাণিত কৃপাণ ঝুলিতেছে, তখন নিমীলিত নয়নে কার অধর সুধা আস্বাদন করিতেছি।

কিন্তু পারি না। জ্ঞান-সত্যের লৌহকবচ এই মুহ্যমান হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে পারে না, কিন্তু এই পুষ্পময় অঙ্গাবরণ পরিধান করিলে মৃত্যু-বিভীষিকা পলায়ন করে। অমৃত কি তাহা জানি না, কিন্তু যেন তাহার আভাস পাইয়াছি। জননীর পয়োধর, শিশুর অধরপুট ও প্রণয়িনীর বাহুবেষ্টন অন্য জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; তখন ধরণীর ধূলি হইতে আকাশের পানে চাহিতে ইচ্ছা করে; অন্তরের মধ্যে যে বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া বোধ হয়। কে বলিবে সে কি মোহ—সে কি ভ্রান্তি?

কিন্তু আর একজনের অশ্রু দেখিলে, আমার অশ্রু শুকাইয়া যায়, আর একজনের হাসি দেখিলে মৃত্যুভয় থাকে না। আর একজনের হাত ধরিলে অনায়াসে অদৃষ্টকে পরিহাস করিতে পারি। এ মদিরা পান করিলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হই। তখন কুটীরাঙ্গণে পৌর্ণমাসীর জোৎস্নালোক ব্যর্থ মনে হয় না। একটি চাহনি, একটি চুম্বন, একটু হাসি, একটু অশ্রুজল পাগল করিয়া দেয়। পৃথিবী ঘুরিয়া থাক, আকাশ চন্দ্রতারকা লইয়া ছিঁড়িয়া পড়ুক, আমার আবেগ প্রশমিত হইবার নয়। আমি তখন কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি।

আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বিরাটকে আমি ধারণা করিতে পারি। আমি মরণশীল, কিন্তু অমৃত আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। আমি দুর্বল, কিন্তু আমার চিন্তা-শক্তি ধরণীকে নবকলেবরে প্রদান করে। আমি অন্ধ, কিন্তু উর্দ্ধ হইতে আমার মুখে যে আলোক আসিয়া পড়ে তাহাতে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়া যায়। কে বলিবে, আমি কে? এ সমস্যার কে সমাধান করিবে।

(মানসী, পৌষ ১৩২১, পৃষ্ঠা ৫৭২)

বিদ্রোহী

কাজী নজরুল ইসলাম

[শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ বি. এ. কর্তৃক আর্য পাবলিশিং হাউস্, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দোতালা) কলিকাতা হ'তে প্রকাশিত এবং কান্তিক প্রেস্, ২২ সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা হ'তে মুদ্রিত "অগ্নি-বীণা"র দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত। প্রকাশকাল, আশ্বিন, ১৩৩০]

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি',
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাতৃর:
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম-কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানিনাকো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম
ভাসমান মাইন্‌,
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর,
আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর!
বল বীর—
চির উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ!
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্‌!
আমি চপলা-চপল হিন্দোল!
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এমন যা,'
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!

আমি মহামারী, আমি ভীতি ধরিত্রীর।
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর-মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে-চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি' বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—
চির-উন্নত মম শির!

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক!
আমি বেদূঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পানির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র, মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!

আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস, আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস !
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী !
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল-দোল্।

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি !
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর !
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদন, বিষজ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে
গতি ফের।
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত- চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে-দেখা-অনুখণ,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন-কন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর !
আমি উত্তরী-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিনী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি—
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন,
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া,
স্বর্গ-মর্ত্য করতলে,
আমি তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে !
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল !
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প !
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি',
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি' !
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল !
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা-সিন্ধু উতলা ঘুম ঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম
মম বাঁশরীর তালে পাশরি' !
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী ।
আমি রুষে উঠে' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক, হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া !
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া ।
আমি শ্রাবণ-প্লাবন বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা ।—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা !
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু জ্বালা বিষধর কাল-ফণী !

আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি !

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয় !
আমি মানব, দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্য !
আমি উন্মাদ আমি উন্মাদ !!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া
গিয়াছে সব বাঁধ !!
আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ, ভয়াল, মহাকাল,
আমি বিবসন, আজ ধরাতল নভঃ ছেয়েছে আমারি
জটাজাল !
আমি ধন্য ! আমি ধন্য !!
আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীরবিদ্রোহী সৈন্য
আমি ধন্য ! আমি ধন্য !!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার !
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব-সৃষ্টির
মহানন্দে।
মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে
ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হারা খেয়ালী
বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন !
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত-শির !

আমি মোহিতলাল মজুমদারের “আমি” ও কাজী নজরুল ইস্‌লামের “বিদ্রোহী” পাশাপাশি উদ্ধৃত করেছি। “আমি” আর “বিদ্রোহী”র মধ্যে যে একটা সাদৃশ্য আছে এটা স্বীকার করা যায়, কিন্তু সাদৃশ্য ও আত্মসাৎ কি এক কথা? এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন :—

“মোহিতলাল মজুমদারের ‘আমি’ (জীবন জিজ্ঞাসার অন্তর্গত) প্রবন্ধের ভাববস্তুর সঙ্গে নজরুলের বিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটির সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কবিতার রচনার বেশ কয়েক বছর আগে মোহিতলালের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। মোহিতলাল মনে করেন তাঁর রচনাকেই নজরুল আত্মসাৎ করেছেন, অথচ কোথাও তার উল্লেখ মাত্র নেই। বলা বাহুল্য, ‘আমি’ প্রবন্ধের বীজ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে গ্রন্থটি থেকে গৃহীত, আধ্যাত্মিক রূপকার্যের মুল্যেই সেটি উল্লেখ্য, সাহিত্য-গুণে নয়। পরন্তু নজরুলের কবিতাটি যে একান্ত আত্মগত

প্রেরণার ফল, তা কাব্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। নতুবা রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে বিরাজমান, তখনই নজরুলের আকস্মিক আবির্ভাব দলগোষ্ঠী নির্বিশেষে এমন সম্বর্ধিত হত না।" ('নীলকণ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম', 'বিংশ শতাব্দী', শ্রাবণ, ১৩৭১)।

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত !"

'বিদ্রোহী' কবিতার এই সুর মোহিতলালের 'আমি'তে কোথাও নেই। নজরুলের আপন প্রেরণায় রচিত 'বিদ্রোহী' বাঙলা সাহিত্যে একক কবিতা। সব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও এই কবিতা বাঙলা সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করবে। কাজেই, 'বিদ্রোহী'র জন্যে মোহিতলালের ঋণ স্বীকার করার কোনও কথাই উঠতে পারে না। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে-গ্রন্থের কথা অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত উল্লেখ করেছেন তার নাম 'অভয়ের কথা'। আমি মোহিতলালকে এই গ্রন্থখানা ব'য়ে বেড়াতে দেখেছি। তিনি তা নজরুলকেও পড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনো ফল তাতে হয়নি। 'অভয়ের কথা' হতেই মোহিতলাল তাঁর 'আমি' প্রবন্ধের 'বীজ' গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ঋণ স্বীকার করেন নি। ডক্টর সুকুমার সেন 'আমি'র সম্বন্ধে লিখেছেন,—"তাহাতে 'অভয়ের কথা'র লেখক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্বই পরিস্ফুট"। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা)।

কবি মোহিতলাল মজুমদার যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে কথা আমি আগে বলেছি, তিনি কবি নজরুল ইস্‌লামের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ডে

লিখেছেন, "সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব মোহিতলাল সযত্নে কাটাইতে যত্নবান হইয়াছিলেন, কিন্তু কাজী নজরুল ইস্‌লামের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন করিয়া সত্যেন্দ্র-প্রভাব জাগিয়াছিল।" (২৬৪ পৃষ্ঠা)।··· "কাজী নজরুল ইস্‌লামের প্রভাব কাটিতে একটু দেরি হইয়াছিল। তাহার উদাহরণ 'কালা পাহাড়' ও 'রুদ্র-বোধন'।" (ঐ, ২৬৫ পৃষ্ঠা)। এই দু'টি কবিতা মোহিতলালের "স্মরগরলে" সঙ্কলিত হয়েছে। এই থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে নজরুল ইস্‌লাম মোহিতলালের ভাব-সম্পদ আত্মসাৎ করেনি, বরঞ্চ মোহিতলাল নিজেই নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কিন্তু "বিদ্রোহী" কবিতাকে উপলক্ষ ক'রে মোহিতলাল যে নজরুলের উপরে বিরূপ হলেন তাঁর সেই বিরূপতা দিনের পর দিন বেড়েই যেতে লাগল। 'প্রবাসী' গোষ্ঠীর প্রতি তিনি এত তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করতেন যে নজরুল ইস্‌লামকেও তিনি 'প্রবাসী'তে লেখা পাঠাতে দেন নি। 'প্রবাসী'র পরিচালকদের নাম উচ্চারিত হলেই তিনি "মর্কট", "বিটকেল" ও আরও নানান রকম অশালীন কথা ব্যবহার করতেন। নজরুলের প্রতি তাঁর বিরূপতা শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেই 'প্রবাসী' গোষ্ঠীতেই ঠেলে দিল। 'প্রবাসী'-গোষ্ঠীতে কোনো কবি ও সাহিত্যিকের যোগদান আমি অন্যায় মনে করিনে, কিন্তু কবি মোহিতলাল মজুমদার কোন্ নীতিতে প্রবাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছিলেন, আবার সেই গোষ্ঠীরই একজন তিনি হলেনই বা কোন্ নীতিতে? 'প্রবাসী' আফিস হতে, অবশ্য 'প্রবাসী'র মালিকানায় নয়, "শনিবারের চিঠি" বা'র হওয়ার পরেই তিনি "প্রবাসী"তে লেখা শুরু করেছিলেন। তিনি নিজেই এ কথা তাঁর "শনিবারের চিঠি ও আমি" প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন :—

"যখন ঐ নূতন সাহিত্যিক উপদ্রবটি (শনিবারের চিঠি) বেশ একটু উৎসাহ সহকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তখন

আমি "প্রবাসী" পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এই যুবকটির চরিত্র আমাকে অতিশয় আকৃষ্ট করে—এমন স্বাস্থ্যপূর্ণ দৈহিক ও মানসিক যৌবন বাঙালী যুবকের জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। ইনি "শনিবারের চিঠি"র জনক—দুষ্ট সরস্বতীর সেবক হইলেও, সর্ববিধ রাগদ্বেষমুক্ত, উদার ও নিস্পৃহ যুবক। এই সময়ে আমি ইঁহাদের বৈঠকে ('শনিবারের চিঠির' বৈঠকে) বসিতাম বটে কিন্তু ঐ পত্রিকায় কিছু লিখি নাই; আমার বয়সের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ইঁহারাও আমাকে দলে টানিতে সঙ্কোচবোধ করিতেন।"

১৯২৪ সালে মোহিতলালের বয়স ৩৬ বছর ছিল। আর সজনীকান্ত দাসের বয়স ছিল ২৪ বছর। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযোগানন্দ দাসের বয়স কত ছিল তা আমি জানিনে। তবে, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের বয়স শ্রীসজনীকান্ত দাসের বয়সের চেয়ে বেশী ছিল। 'শনিবারের চিঠি'র পরিচালকরা মোহিতলালকে তাঁদের বৈঠকে বসতে দিতেন, অথচ কেন যে তাঁর প্রতি তাঁদের এত শ্রদ্ধাবোধ ও সঙ্কোচবোধ ছিল তা বোঝা যায় না। যুবক তিনিও ছিলেন। তা ছাড়া, কাজী নজরুল ইস্‌লাম ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গবাণের 'প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য' তিনিও ছিলেন। সেই তিনি যখন 'শনিবারের চিঠি'র দলে ভিড়ে গিয়ে চরম সুবিধাবাদের পরিচয় দিলেন তখন আবার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সঙ্কোচবোধ কোথা থেকে আসতে পারে? নজরুলের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ও বিরূপতাই তাঁর এই পতন ঘটিয়েছিল। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের যদি এত গুণকীর্তনই করা যায় তবে নজরুলের 'প্রবাসী'তে লেখা কেন তিনি বন্ধ করতে গিয়েছিলেন? এর একটা কৈফিয়ৎ মোহিতলাল কোথাও দেন নি।

সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' পড়ে আমরা জানতে পারছি যে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাস হতে ২৭, বাদুড়-বাগান লেনের একই মেসে তিনি আর মোহিতলাল মজুমদার বাস করছিলেন। সজনীকান্ত মোহিতলালের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু মোহিতলাল কিছুতেই তাঁর নিকটে ঘেঁষছিলেন না। তখন তিনি পাঁচসিকা খরচ ক'রে মোহিতলালের "স্বপন পসারী" একখানা কিনে এনে তার মধ্য হতে "উচ্চৈঃস্বরে 'পুরূরবা' কবিতাটি পড়তে লাগলেন। তার ফলে মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো বটে, কিন্তু "আপনাতে আপনি মত্ত দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ" মোহিতলালকে কিছুতেই বাগে আনতে পারা গেল না। তিনি দূরে দূরেই থাকতে লাগলেন। সজনীকান্ত বলছেন :

"কামস্কাটকীয় ছন্দ রচনার ছলে কাজী নজরুল ইস্‌লামের "বিদ্রোহী"কে ব্যঙ্গ করিয়া একদিন "ব্যাঙ" লিখিয়া ফেলিলাম।........।

"একদিন প্রাতে আমার ঘরে বেশ ঘটা করিয়া বসিয়া দুই-চারিজন বন্ধুর নিকট কামস্কাটকীয় ছন্দ এবং বিশেষ জোর দিয়া "আমি ব্যাঙ" পাঠ করিতেছি, মোহিতলাল ধীরে ধীরে আমার দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই "পুরূরবা" পাঠের পর তাঁহার আর এই অধীনের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ হয় নাই—কবিতা শোনা তো দূরের কথা। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তিনি তখন নজরুল ইস্‌লামের প্রতি অপ্রসন্ন তাই "বিদ্রোহী"র প্যারডি কানে প্রবেশ করিতেই আত্মবিস্মৃত ভাবে আমার ঘরে চলিয়া আসিয়াছেন।" (আত্মস্মৃতি, প্রথম খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা)।

এই বারে সজনীকান্তের সঙ্গে মোহিতলালের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠল। সজনীকান্ত মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে একখানা "স্বপন পসারী" কিনতে গিয়ে পাঁচ সিকা শুধু শুধু খরচ করেছিলেন।

সাহিত্য-জগতের লোক হয়ে তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে নজরুলের বিরোধিতাই ছিল সেই সময়ে মোহিতলালের বন্ধুত্ব অর্জনের সব চেয়ে বড় উপায়। এইবার এই "ব্যাঙ" কবিতাটি নিয়ে মোহিতলাল মেতে উঠলেন। তিনি সজনীকান্তকে স্থানে স্থানে পরিচিত করিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

সজনীকান্ত বলছেন :—

> "এই সময়ে মোহিতলালের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিলাম। আমার খাতাখানি যতই ব্যঙ্গ কবিতায় বোঝাই হইতে লাগিল, তিনিও ততই খাতা-বগলে আমাকে লইয়া পরিচিত মহলে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমটা গিয়া আমার পরিচয়-পর্বটা শেষ করিলেই আমি দম দেওয়া ঘড়ির মতন বাজিতে থাকিতাম—কাজী নজরুলের প্যারডিটাই বেশি বাজাইতে হইত।"

এর পরে সজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠিতে' যোগ দিলেন। তাঁর "আমি ব্যাঙ" কবিতাটি ১৮ই আশ্বিন (১৩৩১) তারিখের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হলো। এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষরের সঙ্গে মোহিতলাল পরিচিত ছিলেন। এই কবিতাকে তিনি তাঁর পরিচিত মহলে যথাসাধ্য প্রচার করেছিলেন। তাঁর লেখা (শনিবারের চিঠি ও আমি) হতে আমরা জানতে পারছি যে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র বৈঠকে বসতেন। যাঁরা মোহিতলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন তাঁরা জানতেন যে কথায় কথায় তিনি "মর্কট" ও "বিটকেল" কথা ব্যবহার করতেন। এই কথাগুলি আবার 'শনিবারের চিঠি'রও ভূষণ হয়েছিল। অদ্ভুত যোগাযোগ!

'শনিবারের চিঠি' প্রথম বা'র হয়েছিল ১৯২৪ সালের ২৬শে জুলাই (মুতাবিক, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৩১) তারিখে। প্রথম সংখ্যা হতেই নজরুলকে এই কাগজ গাল দিচ্ছিল। নজরুল বলত, সে 'শনিবারের চিঠি'র গালির গালিচার বাদশাহ্। কবি মোহিতলাল

মজুমদারও যে তাতে জুটেছিলেন সে কথা ওপরে উল্লেখ করেছি। সজনীকান্তের "আমি ব্যাঙ" প্রকাশিত হতেই নজরুলের বন্ধুরা মনে করলেন যে প্যারডিটি মোহিতলালের লেখা। কারণ, মোহিতলাল অনেক আগে হতেই পরিচিত মহলে এটা প্রচার ক'রে বেডাচ্ছিলেন। অতএব, তাঁরা জিদ করতে লাগলেন যে এর একটা জওয়াব দেওয়া দরকার। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "কল্লোল যুগ" হতে জানতে পারা যাচ্ছে যে "কল্লোল অফিসে" এক রকম আটকে রেখেই নজরুলকে দিয়ে তার "সর্বনাশেব ঘণ্টা" লেখানো হয়েছিল। এই কবিতা ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যক "কল্লোলে" ছাপা হয়েছিল। নজরুলের "ফণি মনসা" নামক পুস্তকে অবশ্য এই কবিতা "সাবধানী ঘণ্টা" নামে ছাপা হয়েছে। এই কবিতার জওয়াবে কবি মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন "দ্রোণ-গুরু", 'শনিবাবের চিঠি'তে তা ছাপা হয়েছিল। আমি 'কল্লোল' ও 'শনিবারের চিঠি' হতে সংগ্রহ ক'রে দু'টি কবিতাই এখানে পাশাপাশি তুলে দিলাম।

সর্বনাশের ঘণ্টা

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেষা !
হে দ্রোণাচার্য্য ! আজি এই নব জয়যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
শিষ্য তোমার ; দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিৎ কদর্যতার গ্লানি !
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদ্গার গুরু শিষ্যের শিরে ; তব বুক হোক্ খালি !
বন্ধু গো ! গুরু ! দূষিত দৃষ্টি দূর কর, চাহ ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়, সে যে পাঁক ঢালে শিরে !
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজ তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি ;
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি !
হে অস্ত্র-গুরু ! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়-কেতু, হলে কুক্কুর কুরু নেতা !
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী
ব্রহ্ম অস্ত্র ব্রহ্ম দৈত্যে দিয়া হে ব্রহ্মচারী !
তোমার কৃষ্ণ রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি নেচেছে মরাল কত সহস্র শত,
কোথা সে দীঘির উচ্ছল জল কোথা সে কমল রাঙা,
হেরি শুধু কাদা, শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা !

সেই কাদা মাখি চোখে মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর নাচের ভালুক হয়েছ, হেসে মরি দেখে ঢং !
অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এস গুরু,
হের দিবালোকে—বাঁদরের বেদে কেটেছে গুম্ফ ভুরু !
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি,
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানী !
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক ঐ শিখণ্ডী আজ রথের সারথী তব,—
হানো বীর তব বিদ্রূপ বান, সব বুক পেতে লব
ভীষ্মের সম ; যদি তাহে শর-শয়নের বর লভি,
তুমি যত বল আমিই সে রণে জিতিব অস্ত্র কবি !
তুমি জান, তুমি সম্মুখ রণে পারিবে না পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে,
রক্ত অসির কৃষ্ণ মসীর যে কোন যুদ্ধে গুরু,
তুমি নিজে জান তুমি অশক্ত, তাই করিয়াছ সুরু
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা আড়ালে থাকি,
ন্যক্কার-আনা নপুংসকেরে রথ-সম্মুখে রাখি।
হের গুরু আজ চারি দিক হতে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি জ্বালায় তোমার পুরানো প্রদাহ ক্ষত !
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে !
কালীর দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালী দহে—
তাহার দাহ তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জ্বলুনীর চোটে। তুমি পাও কোন্ সুখ
দগ্ধ মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি !
শিব সুন্দর সত্য তোমার লভিল একি এ গতি ?
যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম

কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম
কিনিতেছ গুরু! কেন এত তব হিয়া দগ্‌দগী জ্বালা?
হোলীর রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা-মালা?
তোমার গোপন দুর্ব্বলতারে, ছি ছি করে মসীময়
প্রকাশিলে, গুরু, এই খানে তব অতি বড় পরাজয়।
তুমি ভিড়িওনা গো ভাগাড়ে-পড়া চিল শকুনের দলে,
শতদল দলে তুমি যে মরাল শ্বেত সায়রের জলে।
ওঠ গুরু, বীর, ঈর্ষা-পঙ্ক-শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন!
উঠ গুরু উঠ, লহ গো প্রণাম বেঁধে দাও হাতে রাখী,
ঐ হের শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখী।
অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের বিদ্রোহ-বারিবাহ।
দোতালায় বসি উতলা হয়োনা শুনি বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল মর্ম্ম ছানি!
বিদ্রূপ করি উড়াইবে এই বিদ্রোহ তেঁতো জ্বালা?
সুরের তোমরা, কি করিবে তবু হবে কান ঝালাপালা
অসুরের ভীম অসি-ঝনঝনে, বড় অসোয়াস্তি কর!
বন্ধু গো এত ভয় কেন? আছে তোমার আকাশ-ঘর!
অর্গল এঁটে সেথা হ'তে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ ম'ল? সত্য কি? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি!
বরেন ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুমকানী,—ছি ছি এত অসত্য ওমা
কেমন করে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখা গো আমায় ধর ধর! মা গো কত জানে এরা ছল!
সইলো আমার কাতুকুতু-ভাব হয়েছে যে, ঢলে পড়ি!
আঁচলে জড়ায়ে পা চলে না আর, হাত হতে পড়ে ছড়ি!

শ্রমিকের গাঁতি বিপ্লব বোমা, আ ম'লো তোমরা মর !
যত সব বাজে বাজখাঁই সুর, মেছুনিবৃত্তি ধর !
যারা করে বাজে দুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ঐ বোকাদের ইতর ভাষায় গালি দাও খুব করে।
এই ইতরামি বাঁদরামি-আর্ট আষ্ঠেপিষ্ঠে বেঁধে
হন্যে কুকুর পেট পালি আর হাউ হাউ মরি কেঁদে !
এই শয়তানি, করে দিনরাত বল আর্টের জয় !
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ ভ্যাঙচানো নয়।
আপনার নাক কেটে দাদা এই পরের যাত্রা ভাঙা
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট নাকি সুর, কান রাঙা !
আর্ট ও প্রেমের এই সব মেড়ো মাড়োয়ারী দলই জানে,
কোন বিদ্রোহের অসন্তোষের রেখা নেই কোনখানে।
সব ভুয়ো দাদা ও সবে দেশের কিছুই হইবে নাক,
এমনি করিয়া জুতো খাও আর মলমল-মল মাখ !
জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা তৈরী হতেছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনি একদিনে গেছে ছ'ড়ে !
বন্ধু গো ! গুরু ! আঁখি খোলো, খোলো শ্রবণ হইতে তুলা,
ঐ হের পথে গুর্খা সেপাই উড়াইয়া যায় ধুলা !
ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার !
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন বাঁশে তোমার আর্টের আর্টশালা হবে নেড়া !
প্রেমও আছে গুরু, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হয়ে, ছেড়ে যাও, মানা নাই।
আমি বলি—গুরু বলো তাঁহাদেরে কোন বাতায়ন ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙ্গা সজনীর মত হাতছানি দিয়ে ডাকে !
যত বিদ্রূপই কর গুরু তুমি জান এ সত্য-বাণী,

কারুর পা চেটে মরিব না, কোন প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মত,
ধরা-মা'র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত !
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস
ততদিন গুরু সকলের সাথে করে নাও পরিহাস !

(কল্লোল, কার্তিক, ১৩৩১)

একটা ক্ষুদ্র মশকের হুল সহিতে পারো না তুমি!
—অত্যাচারীর খড়্গ ভাঙ্গিবে, রাখিবে ভারত-ভূমি!
হুলের আঘাতে, কুরুক্ষেত্রে ফেলি দিয়া গাণ্ডীব,
রথ হতে নামি' মৃত্তিকা'পরে মাথা ঠোকে ঢিব্ ঢিব্!
নারায়ণী-সেনা হাসিছে অদূরে, রঙ্গ দেখিছে তারা,
আমার মাথা যে হেঁট হয়ে যায়, পশ্চিমে ওই কারা—
ফেরুপাল বুঝি—হর্ষিত চিতে চীৎকার করি' ওঠে,
সূর্য্যের মুখে অস্তমলিন হাসি বুঝি ওই ফোটে!

* * *

কেন তোর এই অধঃপতন বল্ দেখি, ফাল্গুনি!
এই বিদ্বেষ ঈর্ষ্যার জ্বালা কার তরে বল্ শুনি?
আমি গুরু তোর, একা তোরি গুরু? —আর কেহ নাহি রবে?
আজিকার এই সমরাঙ্গণে যদি কেউ যশ লভে—
রণ-কৌশলে আর কেহ যদি আমারে প্রণাম করি'
দূর হ'তে পায় আমারি শিক্ষা-সাধনার কারিগরি—
ধর্ম্মক্ষেত্রে সে কি অধর্ম্ম? তোমারি হইবে জয়?
তোমার দর্পে আর কেহ যদি হেসে কুটি-কুটি হয়,
সে কি তার মহা ধর্ম্ম-দ্রোহ?—হয় যদি তাই হোক্,
তার লাগি' মোর অপরাধ কিবা—কেন তায় এত শোক।
আজ দেখিতেছি, একদিন সেই নিষাদের নন্দনে
করেছিনু ঘোর অবিচার আমি মমতা অন্ধ মনে।—
তোমারি লাগিয়া অঙ্গুলি তার চেয়েছিনু দক্ষিণা,
সে পাপের সাজা কেবা দিবে আর ক্রূর অর্জ্জুন বিনা
আজ পুনরায় নবধানুকীর অঙ্গুলি কাটি' লয়ে
পাঠাতাম যদি তোমার সকাশে—হর্ষে ও বিস্ময়ে
গুরুদেব বলি' কত বাখানিতে বৃদ্ধের বীরপনা!—
সে আর হবে না—আর করিবনা ধর্ম্মেরে বঞ্চনা।

এতকাল ধরি' দিয়াছ যে গুরু-ভক্তির পরিচয়,
সেই ভালো ছিল, তার বেশী এ যে হয়ে গেল অতিশয় !
মনে ভেবে দেখ, কিবা মানে তার, কি বুঝিবে রাজগণ,—
ধিক্কারে আজ মুখরিত হ'ল কুরুদের প্রাঙ্গণ !

* * *

না-না, না-না, না-না, একি এ প্রলাপ বকিতেছি বার বার !
অশ্বত্থামা ! ফের পড়, লিপি,—হয়নি পরিষ্কার !
মোর প্রাণাধিক প্রিয়তম সেই কিরীটীর নহে লিপি,
এ লিখেছে কোন্ কুলশীলহীন পরের প্রসাদজীবী !
লেখার মাঝারে ওঠে না ফুটিয়া সেই মনোহর মুখ,
আজানু-দীর্ঘ সেই বাহু তার, বিরাট বিশাল বুক !
হ্রস্ব খর্ব এ কোন্ বামন উপানৎ পরি' উচা
হইবারে চায়, চুরি করা চূড়া মাথায় বেঁধেছে ছুঁচা !
অর্জ্জুন নিজে শ্যাম-কলেবর—কৃষ্ণের সখা সে যে !—
সেকি ঘৃণা করে কৃষ্ণবরণ ? বধূ কৃষ্ণার তেজে
বাহুতে বীর্য্য, বক্ষে জাগিল যৌবন-ব্যাকুলতা,—
সে করেছে গ্লানি মসীরূপ বলি' ? সম্ভব নহে কথা !
এ কোন্ শবর কিরাতের গালি, অনার্য্য জাতি-চোর !
নকল কুলীন !—বর্ণ-গর্ব্বে কুৎসা রটায় মোর !
হয়েছে ! হয়েছে ! অশ্বত্থামা ! জেনেছি এতক্ষণে—
বীরকুল গ্লানি সেই নিন্দুকে এবার পড়েছে মনে !
আমি ব্রাহ্মণ, চির-উজ্জ্বল ব্রহ্মণ্যের শিখা
ললাটে আমার—মিথ্যা-দহন জ্বলে যে সত্যটীকা !
রাজসভাতলে জনগণমাঝে করি না যে বিচরণ ;
পথ কুক্কুর নীচ-সহবাস ত্যজিয়াছি প্রাণপণ ।
তবু যে আমার ধনু নির্ঘোষে টঙ্কার-ঝঙ্কারে
নিজে গায়ত্রী-ছন্দ-জননী আসিয়া দাঁড়ান দ্বারে ।

আমার পর্ণ-কুটীরের তলে রাজার দুলাল বীর—
গড্ডলিকার দল নহে—আসি' মাটিতে নোয়ায় শির ,
আমি সাধিয়াছি আর্য-সাধনা-সনাতন সুন্দর !—
যে-মন্ত্র-বলে শাশ্বতীসমা সদগতি লভে নর ।
ত্যজি' অনার্য্য-জুষ্টপন্থা, অন্ত্যজ—অনাচার,
ক্ষত্রিয় সাজি' ক্ষত্রিয়ে দিছি ব্রাহ্মণ-সংস্কার ।
কর্ণপটহ বিদারণ করি', সাথে করি নাই কোলাহল ।
যুগ-ধর্মের সুযোগ বুঝিয়া চির-সত্যের গ্লানি
করি নাই কভু,—যশোলিপ্সার—স্বার্থের আপসানি !
নিজ হৃদয়ের পুরীষ-পঙ্ক দুই হাতে ছড়াইয়া
যুগবাণী বলি', ধ্রুব-শাশ্বত পদতলে গুঁড়াইয়া,
যত মূর্খ ও ষণ্ডামার্কে ভক্তশিষ্য করি',
এই দেবতার দিবারে করিনি পিশাচের শর্ব্বরী !
জানিস্ বৎস, কোন মহারথী—এ কোন নূতন গ্রহ,
মোর সাথে চির-শত্রুতা মানি', বিদ্বেষ দুঃসহ
পুষিয়াছে মনে ?—বৈরী সে, যথা কৃষ্ণের শিশুপাল !—
সত্যের এই মিথ্যা-বৈরী যুগে যুগে চিরকাল !
আজ আসিয়াছে নূতন ছদ্মে শিষ্যের সাজ পরি'—
গুরু-শিষ্যের ভক্তি ও স্নেহ কুৎসায় লবে হরি' !
চিনেছি তোমারে, হে কপটচারী দাম্ভিক দুর্জ্জন !
বক্ষের মণি অর্জ্জুন নও—পাদুকার অর্জ্জুন !
বীর সে পার্থ আর্ত্ত হয় না স্বার্থের সঙ্কোচে,
—গুরুহত্যার পাতকের ভয়ে ললাটের স্বেদ মোছে !
বজ্র-আঘাতে হয় না কাতর বীর সে সব্যসাচী—
তারে কাবু করে গোটা দুই তিন বাতাসের মশা-মাছি !
তাহারি কারণে উন্মাদ হ'য়ে করিবে সে গুরু-দ্রোহ !
একি পাপ ! একি অহঙ্কারের নিদারুণ সম্মোহ !

সে কি পাণ্ডব! দ্রোণের শিষ্য ক্ষত্রিয়—চূড়ামণি!—
খুলে ফেল্ তোর ক্ষত্রিয়-বেশ, ওরে পাণ্ডব-শনি!
রাধেয় কর্ণ পরিচয় তোর! আর যাহা পরিচয়—
সে কথা কহিতে ঘৃণায় আমার রসনা ক্ষান্ত হয়!
চিরদিন তুই মিথ্যার দাস, মিথ্যাই তোর প্রিয়—
গুরু ভার্গবে প্রতারণা করি' সেজেছিলি শ্রোত্রিয়!
সেই কীট তোরে ছাড়িল না আজও! সেদিন পড়িলি ধরা
দংশন সহি'!—আজ বিপরীত—হ'লি যে অর্দ্ধমরা!
জামদগ্নিব অভিশাপ বহি' পলায়ে আসিলি চোর!
জাতি আপনার লুকা'তে নারিলি, লজ্জা নাহি যে তোর!
দ্রোণ-গুরু নয়, সার্থক তোর গুরু সে পরশুরাম—
বিস্ময় মানি দম্ভে তোমার—রেখেছ গুরুর নাম!

* * *

ওরে নির্ঘৃণ! আপনি আপন বিষ্ঠার পর্ব্বতে
চড়ি' বসিয়াছ—মনে করিয়াছ আঁধারিবে হেন মতে
সবিতার মুখ!—মোর যশো-রবি-রাহু হ'তে সাধ যায়!
আরে, আরে, তোর স্পর্দ্ধায় দেখি জোনাকিও লাজ পায়!
কেমনে আনিলি হেন কথা মুখে? যজ্ঞের হবিটুকু
সন্তর্পণে রাখিয়াছি ঢেকে, তাও হেরি চাকু-চুকু
করিয়া লেহন, সাধ যায়—সেথা উগারিতে একরাশি
অমেধ্য যে সব উদরে রাজিছে—কতকালকার বাসি,
চুরি করা যত গর্ হজমের!—পথে প্রান্তরে যার
সৌরভ পেয়ে এতদিন পরে ভরিয়াছে সংসার
লালা ও পঙ্কবিলাসীর দল—শবভুক নিশাচর,
শকুনি, গৃধিনী, শৃগালের পাল—রসনা—তৃপ্তিকর
পাইয়াছে ভোজ! ভাবিয়াছ বুঝি সেই রস উপাদেয়?
দেব-যজ্ঞের আহুতি সে ঘৃত সোমরস হবে হেয়?

উন্মাদ—তুই উন্মাদ! তাই পতনের কালে আজ
বিষ-বিদ্বেষ উথলি' উঠেছে, নাই তোর ভয় লাজ!
আমারে করেছে কুরু-সেনাপতি কৌরব নৃপমণি,
তাই হিংসায় পুরীষ-ভাণ্ডে মাছি ওঠে ভন্ ভনি'!
তাই তাড়াতাড়ি পার্থের নামে কুৎসার ছল ধরে'
তারি নামে লিপি পাঠালি আমারে কুৎসিত গালি ভরে'
আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
অধঃপাতের দেরী নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর!
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি তুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
গুরু ভার্গব দিল যা' তুহারে!—ওরে মিথ্যার রাজা!
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার, মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে!
দুদিনের এই মুখোস-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস!
মিথ্যায় ভুলি' যে মহামন্ত্র গুরু দিয়েছিল কাণে,
বড় প্রয়োজনে পড়িবে না মনে, সে বিফল সন্ধানে
নিজেরি অস্ত্র নিজেরে হানিবে—শেষ হবে অভিনয়,
এতদিন যাহা নেহারি' সকলে মেনেছিল বিস্ময়!

[শনিবারের চিঠি, বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা (দ্বাদশ সংখ্যা),
৮ই কার্তিক, ১৩৩১)]

আমি আগেই বলেছি, নজরুল ইস্‌লামের "সর্বনাশের ঘণ্টা" তার "ফণি মনসা" নামক পুস্তকে "সাবধানী ঘণ্টা" নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে। অনেকেই তা পড়েছেন, কেউ ইচ্ছা করলে এখনও তা পড়তে পারেন। কিন্তু মোহিতলালের "দ্রোণ-গুরু" দুষ্প্রাপ্য।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৮ই কার্তিক তারিখের বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যক "শনিবারের চিঠি" কোনো পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় না। সজনীকান্ত দাস তাঁর যে ব্যক্তিগত লাইব্রেরী স্থাপন করে গেছেন একমাত্র তাতেই তা পাওয়া যায় ব'লে আমার বিশ্বাস। তাঁর পুত্র শ্রীরঞ্জনকুমার দাসের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। তাই, আমি প্রথমে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মারফতে কবিতাটির একটি প্রতিলিপির জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাই। তারপরে, নজরুলের বড় ছেলে কল্যাণীয় সব্যসাচীর মারফতেও তাঁকে আমি অনুরোধ করি। সব শেষে আগে টেলিফোনে কথা ব'লে আমি নিজে একদিন তাঁর বাড়ীতে যাই। তিনি খুব সাদরে আমায় গ্রহণ করেছিলেন, এবং তখনই বাঁধানো 'শনিবারের চিঠি' এনে আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমার একজন তরুণ বন্ধু (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) কবিতাটি আমার হয়ে কপি ক'রে নিয়েছেন।

১৬২ ছত্রের এই বিরাট কবিতাটি হতে সজনীকান্ত মাত্র দশটি ছত্র তাঁর 'আত্মস্মৃতি'র প্রথম খণ্ডে (১৬১ পৃষ্ঠা) উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই নিদারুণ কবিতার শেষ কয়েক পংক্তি মারাত্মক, বাংলা সাহিত্যে অভিশাপের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।" আমি জানিনে, নজরুলের চরিতকাররা পুরো "দ্রোণ-গুরু" কবিতাটি পড়ার সুযোগ কখনো পেয়েছেন কিনা। তাঁদের মধ্যে জনাব আজহার উদ্দীন খান তাঁর "বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল" পুস্তকে এই দশটি ছত্রই তুলে দিয়েছেন। আবার দেখছি ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তও তাঁর "নজরুল চরিত মানস" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এই দশটি ছত্রই।

নজরুল ইস্‌লাম মহাভারত হতে উপমা দিয়ে তার 'সর্বনাশের ঘণ্টা' শুরু করেছে। সে-ই প্রথম মোহিতলালকে বলেছে দ্রোণাচার্য, আর নিজেকে বলেছে তাঁর শিষ্য। মোহিতলালও সেই ভাষাতেই, অর্থাৎ নিজে "দ্রোণ-গুরু" হয়ে নজরুলের কবিতার জওয়াব দিয়েছেন এবং তাতে সজনীকান্তকে বানিয়েছেন অর্জ্জুন। তার জন্যে

মোহিতলালকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু পাশাপাশি দু'টি কবিতা পড়লে সকলে দেখতে পাবেন যে নজরুল সম্ভ্রমের সঙ্গে তার কবিতাটি আরম্ভ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সংযম বজায় রাখার চেষ্টাও সে করেছে। হয়তো "ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার" জাতীয় কথাগুলি না বললেই ভালো হতো। কিন্তু অসহিষ্ণু ও দাম্ভিক মোহিতলাল সংযমের কোনো বাঁধনের তোয়াক্কাই করেন নি। তাঁর মনে যা এসেছে তাই তিনি লিখেছেন তাঁর কবিতায়! নজরুলকে তিনি বলেছেন "হীন জাতি-চোর," যাঁরা নজরুলকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন তাঁদের তিনি বলেছেন "মর্কট", আর জনগণ তাঁর নিকটে "গড্ডলিকা"।

নজরুল আর মোহিতলালের কবিতা হতে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদেরও ধারণা জন্মেছিল যে মোহিতলাল নজরুলের গুরু। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সেই কথা বলেছেন। শ্রীসজনীকান্ত বলেছেন, "গুরুর সহিত শিষ্যের তখন মনোমালিন্য গাঢ়তর হইয়াছে।" আজ্‌হার উদ্দীন খানও এই একই ভুল করেছেন তাঁর "বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল" নামক পুস্তকে। নজরুল যদি ওই ভাবে 'গুরু-শিষ্য' দিয়ে তার কবিতাটি শুরু না করত তা'হলে সে ভালোই করত। তা থেকে সাধারণ পাঠকদের মনে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে এটা কল্পনা করা যায়, কিন্তু অচিন্ত্যকুমার ও সজনীকান্তের মতো বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মনেও এইরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি কেন হলো? বাঙলা সাহিত্যে তো উর্দু সাহিত্যের মতো গুরু-শিষ্যের কোনো রেওয়াজ নেই। উর্দু সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই যে মহাকবি গালিবও মির্জা আবদুল কাদির "বেদিল"কে গুরু মানতেন। তিনি লিখেছেন,

"হে গালিব, কাব্য-পথে আমার
পথ ভুলের কোনো আশঙ্কা নেই।
বেদিলের লেখনীই আমার
কাব্য-প্রান্তরে খিজিরের যষ্ঠি।"

উর্দু কবি তস্‌লীম নিজেকে নিজে বলেছেন :

"হে তস্‌লীম, আমি নসীম দিহ্‌লবীর শিষ্য,
লখ্‌নৌর কবিদের রীতি অনুসরণে আমার কি দরকার"?

এইরূপ একটা ধারণা আছে যে প্রান্তরের ও সমুদ্রের পথ-প্রদর্শক হচ্ছেন খিজির (খিদিরও উচ্চারণ হয়)। তা' থেকে কলকাতার খিদিরপুর ও মেদিনীপুরের খেজুরী নাম হয়েছে। দিহ্‌লবীর অর্থ হচ্ছে দিল্লীবাসী।

এই ধরনের রেওয়াজ যখন আমাদের বাঙলা সাহিত্যে নেই তখন কোনো এক কবিকে অন্য কবির শিষ্য বলা সম্পূর্ণ ভুল নয় কি? তাছাড়া, প্রভাবিত তো মোহিতলালই নজরুলের দ্বারা হয়েছিলেন। অন্তত, সাহিত্যিক ও সমালোচকরা সেই মতই তো প্রকাশ করেছেন।

মোহিতলালের দাম্ভিকতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার জন্যে জনগণের সান্নিধ্যে তো কোনো দিন তিনি যেতেই পারলেন না, তাঁর সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিজীবী মহলের বন্ধুত্বও বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। নজরুল ইস্‌লাম ও হেমেন্দ্রকুমার রায় সহ তিনিও যখন 'শনিবারের চিঠি''র ব্যঙ্গবাণের লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন তখন তার বিরুদ্ধে লড়াই না ক'রে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র দলের নিকটে আত্মসমর্পণ ক'রে তাঁদেরই একজন হয়ে গেলেন! তাঁর ব্রাহ্ম-বিদ্বেষ ও 'প্রবাসী'র প্রতি বিতৃষ্ণা কোথায় যেন উবে গেল, 'প্রবাসী'তেও লিখতে আরম্ভ করলেন তিনি। তাঁর নূতন পক্ষপরিবর্তনের হেতু ছিল কাজী নজরুল ইস্‌লাম। কারণ, প্রমীলা সেনগুপ্তাকে বিয়ে করেছিল ব'লে ব্রাহ্মরা নজরুলের ওপরে বড় বেশী চটে গিয়েছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' ব্রাহ্ম মালিকানা-বিশিষ্ট 'প্রবাসী' আফিসে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার 'জনক' ছিলেন 'প্রবাসী'র তখনকার পরিচালক শ্রীঅশোক

চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে নজরুলের বিয়ে হয়েছিল, আর জুলাই মাসে বা'র হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'। দিনক্ষণ বিচার ক'রেই মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠি'তে যোগ দিয়েছিলেন এবং 'প্রবাসী'তে লেখা আরম্ভ করেছিলেন। তা না করলে নজরুল-বিরোধিতার এত বড় একটা সুযোগ তিনি কোথায় পেতেন? অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে নজরুলই হয়েছিল তাঁর আক্রমণের তখন লক্ষ্য। বুদ্ধিমান মোহিতলাল এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র দলে যোগ দিয়ে তার ব্যঙ্গবাণের হাত হতে বেঁচেছিলেন এবং সেই সঙ্গে নজরুলকে ঘায়েল করার পরম সুযোগও পেয়ে গিয়েছিলেন। মোহিতলাল লিখেছেন, "সে পত্রিকার (শনিবারের চিঠির) জন্ম হইয়াছিল কয়েকটি যুবকের আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য।" তিনি জানেন কোন্ প্রবৃত্তি তিনি নিজে চরিতার্থ করেছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'তে মোহিতলাল অনেক কাল টিকে ছিলেন। কিন্তু তাঁর 'শনিবারের চিঠি ও আমি' শীর্ষক প্রবন্ধ ('বিংশ শতাব্দী,' শারদীয় সংখ্যা, ১৮৮১ শকাব্দ) প'ড়ে মনে হচ্ছে যে সেখানেও তিনি অসহনীয় হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলে তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল তাঁর 'মানস কন্যা' শনিবারের চিঠিকেও।

জনাব আজহার উদ্দীন খান 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল" নাম দিয়ে একখানা বড় পুস্তক রচনা করেছেন। পরে তাঁর "বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল" নামক পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তক দু'খানা নিছক সাহিত্যালোচনার উদ্দেশে রচিত হয় নি। দু'খানা পুস্তকেই কবিদের জীবনের ঘটনাও আলোচিত হয়েছে। বাঙলা দেশে কে না জানেন যে নজরুল আর মোহিতলালের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বেধেছিল? তথ্যনিষ্ঠ হয়ে দু'জনার প্রতি সুবিচার যে কি ক'রে একজন লেখক করতে পারেন তা আমার পক্ষে বোঝা মুশকিল। তাঁদের দু'জন যদি পরস্পর সম্পর্কহীন হতেন তা হ'লে আজহার

উদ্দীন সাহেব অনায়াসেই দু'জনার সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারতেন। তাঁর লেখা সম্বন্ধে বাঙলা দেশের সুধীমণ্ডলী কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা আমি জানিনে, কিন্তু আমার মনে ধারণা জন্মেছে যে তাঁর সহানুভূতি মোহিতলালের দিকেই বেশী। তিনি তাঁর "বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল" পুস্তকে লিখেছেন :—

> "মোহিতলাল একদিন "মানসী" পৌষ (১৩২১) থেকে 'আমি' শীর্ষক প্রবন্ধটি কাজীকে পাঠ ক'রে শোনান। এর কিছু দিন পরেই নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখেন (কার্তিক, ১৩২৮)।"

আজ্‌হার উদ্দীন সাহেব এই তথ্য কোথা থেকে পেলেন? এই নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। ইচ্ছা করলেই তিনি সঠিক তথ্য পেতে পারতেন। তাঁর "কিছু দিন পরেই"-র অর্থ আমরা কি বুঝব? এই "কিছু দিন পরেই" এক সপ্তাহ পরে হতে পারে, হয়তো এক মাস পরেও হতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় তিনি এক বছর পরে মনে করেন নি। অথচ, নজরুল 'বিদ্রোহী' রচনা করেছিল মোহিতলালের মুখে "আমি" পড়তে শোনার এক বছরেরও বেশী দিন পরে। আমার লেখা হতে তিনি অনায়াসে এই তথ্য পেতে পারতেন। আমার কাছ থেকে পুরনো "মানসী" নিয়েই তো মোহিতলাল নজরুলকে লেখাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। এই অধ্যায়ের অন্যত্র আমি তা লিখেছি। তাঁর "বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল" বা'র হওয়ার প্রায় দু'বছর আগে এই তথ্য আমি মাসিকের পৃষ্ঠায় ও আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে ছেপেছিলেম। তিনি লিখেছেন, " 'আমি'র সুর নিয়েই 'বিদ্রোহী' কবিতার সৃষ্টি, যদিও দু'জনের মানসধর্মের পার্থক্য রয়েছে ; 'আমি'র মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ আর 'বিদ্রোহী'র সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা, অথচ, কাজী এই ঋণ প্রকাশ্যে স্বীকার করেন নি।" এখানে সুর মানে বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই

হতে পারে না। কিন্তু 'আমি' ও 'বিদ্রোহী'র বক্তব্য কি এক? আজ্‌হার সাহেব নিজেই তো বলছেন যে পার্থক্য রয়েছে। তবে ঋণ স্বীকারটা কিসের? আমার তো মনে হয় 'সুর' বলতে তিনি বক্তব্যই মনে করেছেন। তা না হলে কেন তিনি লিখলেন যে "এর কিছুদিন পরেই নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখেন।" তার মানে 'আমি'র কথাগুলি মনে তাজা থাকতে থাকতেই নজরুল 'বিদ্রোহী' রচনা করেছিল, 'আমি'র বক্তব্য নিয়েই। অন্য সাহিত্যিক ও সমালোচকরা এই কথাটি বলছেন না বলেই তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথাটি বলেছেন। আসলে মনে হচ্ছে যে মোহিতলালের মৌখিক বক্তব্য তাঁরও বক্তব্য, অর্থাৎ "নজরুল 'আমি'র ভাব নিয়েছে, কিন্তু ঋণ স্বীকার করে নি"।

আজ্‌হার উদ্দীন সাহেব আরও এমন সব বক্তব্য প্রকাশ করেছেন যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন "বাংলা সাহিত্যে মোহিতলালে"র ২০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, " 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর কাজীর বহু তরুণ বন্ধু জুটে গেল। মোহিতলাল হৈ চৈ ভালবাসতেন না, কাজেই আস্তে আস্তে স'রে দাঁড়ালেন।" মোহিতলালকে তাঁর সমর্থন করতেই হবে, তা সমর্থনটা তথ্যনিষ্ঠ হোক, আর না হোক। সেই ১৯২০ সাল হতেই তো নজরুলের তরুণ বন্ধুরা জুটেছিলেন। তাঁদের ভিতরে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারও ছিলেন। বত্রিশ বছরের মোহিতলালকে কি বলব? মধ্যবয়সী? বৃদ্ধ? তিনিও হইচই ভালোবাসতেন, কিন্তু ছোট গণ্ডীর ভিতরে। তরুণেরা তো নজরুলের সঙ্গে ছিলেনই, 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হওয়ার পরে সব বয়সের লোকেরা নজরুলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। আজ্‌হার সাহেবের বোঝা উচিত যে নজরুলের জনপ্রিয়তার পেছনে তার কবিতা তো ছিলই, ছিল তার গান, আরও ছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে তার সৈনিকত্ব। মোহিতলালের শুধু কবিতা ছিল, অন্যগুলি ছিল না। কি ক'রে তিনি নজরুলের

মতো জনপ্রিয় হতে পারেন? তিনি আস্তে আস্তে স'রে দাঁড়িয়েছিলেন একথা সত্য। তার কারণ, নজরুল তাঁর অভিভাবকত্ব হতে বা'র হয়ে এসেছিল, তার কারণ, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কল্পনাতীত রূপে সম্বর্ধিত হয়েছিল। কিঞ্চিৎ প্রতিশোধের বাসনা নিয়েই তিনি স'রে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই তিনি গিয়েছিলেন 'প্রবাসী'তে, তাই তিনি ভিড়েছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র দলে।

আজ্‌হার উদ্দীন সাহেব তো বুঝেইছিলেন যে—

> "জীবনের কোন বিশেষ ঘাটে মোহিতলাল বেশী দিন নোঙর ফেলে অবস্থান করতে পারেন নি—ছুটেছেন এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে, এক দল থেকে আর এক দলে।"

এই ছিলেন প্রকৃত মোহিতলাল। কিন্তু মুশ্‌কিল বেধেছে অন্য এক জায়গায়। তিনি মোহিতলালের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় বিশ্বাসবান। তিনি মনে করেন মোহিতলাল অভিশাপ দিতে পারেন এবং সেই অভিশাপ লেগেও যায়। তাঁর এই বিশ্বাসের জন্যে আমি তাঁর সমালোচনা করেছিলেম। তখন তিনি "দ্রোণ-গুরু" কবিতার অভিশাপের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার পরে "সুইনবার্নের অনুসরণে" নামক একটি কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, "ইংরেজি কবিতার অনুসরণ হলেও কবির মনে ছিল নিজের ও নজরুলের তুলনা। এর দু'টি পংক্তিও মর্মান্তিকরূপে সত্য—

> সর্পদষ্ট মৃতসম মরিয়াও হইবি অমর—
> শব হয়ে জাগিবিরে মৃত্যুহীন মরণ-বাসর।

আজকের নজরুল কি সত্যই শব হয়ে অনন্ত 'মরণ-বাসরে জেগে' নেই?" যদি এক মুহূর্তের জন্যে মেনেও নিই যে মোহিতলালের অভিশাপ নজরুলের বেলায় কার্যকরী হয়েছে, তবুও জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে, কেন দিলেন মোহিতলাল নজরুলকে এই অভিশাপ? কি ক্ষতি করেছিল সে মোহিতলালের? তাঁর

স্বপ্রয়োজিত অভিভাবকত্ব হতে বা'র হয়ে গিয়েছিল, এই ছিল কি নজরুলের অপরাধ ? কেউই তো শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিভাবকত্ব মেনে থাকতে পারেন নি। এমন যে সজনীকান্ত দাস, বয়সের মাত্র বারো বছর ব্যবধান হওয়া সত্ত্বেও যাঁকে আজ্‌হার সাহেবের ভাষায় মোহিতলাল "পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন," তাঁর নিকটেও মোহিতলাল অসহনীয় হয়ে পড়েছিলেন। নজরুলের "সর্বনাশের ঘণ্টা" লেখাই কি তার অপরাধ ? তার জওয়াবে তার চেয়ে অনেক, অনেক খারাব ভাষায় মোহিতলাল কি "দ্রোণ-গুরু" লেখেন নি ? শনি-চক্রের ভিতরে গিয়ে কী তিনি করেন নি নজরুলের বিরুদ্ধে ? নজরুল তো শুধু "সর্বনাশের ঘণ্টা"ই লিখেছিল। কিন্তু মোহিতলাল তো ঘণ্টা বাজিয়েই চলেছিলেন। তবুও কেন দিলেন তিনি অভিশাপ ? জনাব আজ্‌হার উদ্দীন সাহেব ; আপনি তো বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগের শিক্ষিত যুবক। আপনার মনে অভি-শাপের কুসংস্কার কি ক'রে বাসা বাঁধতে পারল ? আপনি মোহিত-লালের কথাও কেন একবার ভাবছেন না ? তিনি জীবনে এত মনোকষ্ট কেন পেলেন ? এত অসুখেই বা কেন ভুগলেন ? আপনিই তো বলছেন তাঁকে "অতিপরিচয়ের অপরিচয় দিয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছে।" মাত্র ৬৪ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এসব কেন হলো ? কার অভিশাপে ?

আপনি কাজী নজরুল ইস্‌লামের চরিতকার। আপনিই আপনার পুস্তকে তার ব্যাধির কথা লিখেছেন। ব্রিটেনের ডাক্তার-দের অভিমতের উল্লেখ আপনার পুস্তকে আছে। ভিয়েনার ডাক্তার হান্‌স হফ্‌ যে শেষ মত দিয়েছেন তাও লেখা আছে আপনারই পুস্তকে। তাঁর মত হচ্ছে যে কবি পিক্‌স্‌ ডিজিজ নামক মস্তিষ্কের রোগে ভুগছেন। এই রোগে মস্তিষ্কের সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী অংশগুলি সংকুচিত হয়ে যায়। এই কারণেই কবি আজ হৃতসম্বিৎ ও রুদ্ধবাক্‌। এই সব কথা আপনার পুস্তকে

লিখেও আপনি মোহিতলালের অভিশাপকে টেনে এনেছেন। মহাভারতের কাহিনীতে যা ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব জগতে তা ঘটা সম্ভব নয়। মোহিতলালের অসম্ভব অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাকে তুলে ধরার জন্যে নজরুলের চরিতকার হয়ে আপনি তার ওপরে অবিচার করেছেন। কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি মোহিতলালের ওপরেও অবিচার করেছেন? নজরুলের মতো মোহিতলাল হৃতসম্বিৎ হননি বটে, কিন্তু ব্যাধিতে তিনিও ভুগেছেন, নানান রকম দুর্গতির সম্মুখীন তিনিও হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত অকালে ৬৪ বছর বয়সে তাঁর হাসপাতালে মৃত্যু ঘটেছে। দেশের সব লোক তো আপনি নন। তাঁরা কি ভাবতে পারেন না যে শাপগ্রস্ত হয়েই মোহিতলাল এত কষ্ট পেয়েছেন এবং অকালে মরেছেন। কার শাপ লেগেছিল তাঁর ওপরে? নজরুলের? কাহিনীর অভিশাপ তো শুনেছি দু'পক্ষের ওপরেই দু'পক্ষের লাগত।

* * *

আমার যতটা মনে পড়ছে ১৯২৬ সালের শেষ ভাগেই বোধ হয় হবে,—কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের সহিত আমার শেষ দেখা হয়েছিল। নজরুলের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরেও ১৯২২ সালে তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা হয়েছে। একবার তিনি যে "ধূমকেতু" আফিসে এসেছিলেন সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। নজরুল জেলে চলে যাওয়ার পরে (১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী) তাঁর সঙ্গে আমার পথে-ঘাটে দেখা হয়েছিল কিনা ঠিক মনে করতে পারছিনে, হয় তো হয়ে থাকবে। ১৯২৩ সালের মে মাসে আমিও গিরেফ্‌তার হয়েছিলেম। মোহিতলালের সঙ্গে আমার শেষ দেখাটা একদিন দুপুরের কিছু পরে হঠাৎ হয়েছিল হ্যারিসন রোডের (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) ফুটপাথে। কলেজ স্ট্রীটের মোড় ছাড়িয়ে শিয়ালদার দিকে যেতে বাঁদিকের ফুটপাথে

দেখাটা হয়ে গেল। ক'বছরের পরে এই দেখা হওয়ায় তিনি খুশীই হলেন,—বললেন, ভাবেন নি যে আর কোনো দিন তাঁর দেখা হবে আমার সঙ্গে। জেলে আমি যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়েছিলেম, রক্ত বমি করেছিলেম রায়-বেরেলি ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে,—এই সব কথা তিনি শুনেছিলেন। বললেন, "চলুন কিছুক্ষণ এক জায়গায় বসা যা'ক"। কিন্তু বসব কোথায়? সময় ছিল দুপুরের পর। বাঙালী চা-এর দোকানের চেয়ারগুলি তখন টেবিলের ওপরে উঠে গেছে। তা-ছাড়া বিশেষ বিশেষ এলাকার বড় দোকানগুলি ছাড়া অন্য কোনো বাঙালী হিন্দু-চালিত চা-এর দোকানে মুস্‌লিম নামধারীরা তখনও ঢুকতে পেতেন না। চলতে চলতে হঠাৎ দেখা গেল গলির মুখে দু'খানা বেঞ্চি ও একখানা টেবিলওয়ালা বাঙালী হিন্দুর একখানা ছোট্ট দোকান তখনও খোলা আছে। মোহিতলাল দোকানদারের সঙ্গে কথা বললেন, যদিও আমার ধুতি-শার্ট পরা ছিল, তবুও দোকান-দারকে আমার নাম ও পরিচয় জানালেন। মালিক অনুগ্রহ ক'রে আমাদের বসতে ও চা খেতে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হলো। বেশীর ভাগ কথাই তিনি আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহিত্যের কথা তিনিও তুললেন না,—আমারও একান্ত চেষ্টা ছিল যে ওই খাতে যেন আমাদের আলোচনাটি বয়ে না যায়। নজরুলের কথাও তিনিই প্রথম তুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন সে নাকি খুব অসুস্থ? সে তখন কৃষ্ণনগরে থাকত। আমি তাঁকে জানালাম যে নজরুলকে জোর ম্যালেরিয়ায় ধরেছিল, আরও তার নানান অসুখ। দীর্ঘ চিকিৎসার পরে তখন প্রায় ভালো হয়ে এসেছে সে। মোহিতলাল বললেন, নজরুল শরীরের বড় কম যত্ন নেয়। পুরনো ভালোবাসার কথা হয় তো তখন তাঁর মনে পড়েছিল। এই ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে সে দিন। যাওয়ার সময় আমার ঠিকানা নিলেন। বললেন, তাঁর বইগুলি আমায় পাঠিয়ে দিবেন। তখনও মোহিতলাল

কলকাতায় স্কুল মাস্টার। তিনি ক্যালকাটা হাইস্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। আমি যখন জেলে যাই, তার আগে হতে তিনি মেট্রপলিটান স্কুলে গিয়েছিলেন আরও বেশী বেতনে। শ্রীসজনীকান্ত যে লিখেছেন তিনি মাসে ৪৫ টাকা বেতন পেতেন এটা ঠিক কথা নয়। মোহিতলাল নিজেই তো লিখেছেন যে মাসে তিনি একশ' টাকা পেতেন।

বই মোহিতলাল অবশ্য কোনো দিন আমায় পাঠান নি। উনিশ শ' ত্রিশের দশকে আমার এক ভাইপো যখন ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আমি মীরাট জেল হতে তাকে মোহিতলালের সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিলেম। দেখা সে ক'রেও ছিল। জেলে না থাকলে আমি বরাবরই কলকাতার স্থায়ী বাশিন্দা। ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে আসার পরে আমি কখনও মোহিতলালের সঙ্গে দেখা করি নি। তিনি অতি বড় কমিউনিস্ট বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলেন।

বিফল উদ্‌যোগ

১৯২১ সালে নজরুল ইস্‌লাম আর আমি একটি উদ্‌যোগ গ্রহণ ক'রে তাতে বিফল মনোরথ হয়েছিলেম। ১৯২০ সালে আমরা কি ক'রে যে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' বা'র করার উদ্যোগ নিয়েছিলেম সেই কথা আগে বলেছি। সেই থেকেই দৈনিক কাগজ আমার মাথায় বাসা বেঁধেছিল। খিলফৎ-অসহযোগের প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে 'নবযুগ' বা'র হয়েছিল। কিন্তু কাগজে লেখার ভিতর দিয়ে আমরা খানিকটা গণ-আন্দোলনের, অর্থাৎ মজুর আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলেম। 'নবযুগ' ছেড়ে দেওয়ার পরেও আমার মাথা থেকে কিছুতেই দৈনিক কাগজ বা'র হয়ে গেলনা। তখনও আমি ভাবতে থাকি যে যেমন করেই হো'ক ছোট্ট দৈনিক কাগজ একখানা আমাদের বা'র করতেই হবে। এই চিন্তা আমার মনের গোপন লোকের চিন্তা ছিল না। এটা ছিল আমার সরব চিন্তা। নজরুল ইস্‌লামও আমার এই চিন্তায় শামিল ছিল। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে আমি যখন তাকে নিয়ে আসার জন্যে কুমিল্লায় যাই সেখানেও তার সঙ্গে আমার দৈনিক কাগজের আলোচনা হয়। সেখানেও আমরা অনেককে এই কথা বলি। এমন কি একথাও নজরুল আর আমার মধ্যে হয় যে দৈনিক কাগজ যদি আমরা বা'র করতে পারি তবে তাতে শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের একমাত্র পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তকেও

নেওয়া হবে। কলকাতায় ফিরে আমরা দৈনিক কাগজের উদ্যোগ বিশেষভাবে নেব এটা স্থির করেই নজরুল আর আমি কুমিল্লা হতে রওয়ানা হই।

এই দৈনিক কাগজের কথা মাথায় নিয়েই নজরুল আর আমি ৩/৪-সি, তালতলা লেনের বাড়ীতে বাস করতে যাই ১৯২১ সালের জুলাই মাসের শেষ ভাগে কিংবা আগস্ট মাসের শুরুতে। যে-চিন্তা ১৯২০ সালে মাথায় এসেছিল আবার সেই চিন্তাই মাথায় এলো এই সময়েও। অর্থাৎ, একটি জয়ণ্ট স্টক কোম্পানী গঠন করে সেই কোম্পানীর শেয়ারের টাকায় কাগজ বা'র করা। কিন্তু একটি কোম্পানী গঠন করার জন্যেও টাকার প্রয়োজন। সেই টাকা আমাদের ছিল না। অনেক লোকের সঙ্গে অনেক রকম কথা হলো, কিন্তু কোনো সুরাহা হলো না। আমার পরিচিত কয়েকজন মাদ্রাসার ছাত্র কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের বাড়ী ভাড়া নিয়ে তাঁত ও চরখা বসিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের আন্দোলনে তাঁত ও চরখা প্রাধান্য পেয়েছিল। এই ছাত্রদের মুখে কুত্‌বুদ্দীন সাহেব আমাদের উদ্যোগের কথা জানতে পারেন এবং নজ্‌রুল ইস্‌লাম ও আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমাদের মুখে সব কথা জানতে পেয়ে তিনি বললেন যে কোম্পানী গঠন করতে যে টাকার প্রয়োজন হবে সেই টাকা তিনি দিতে রাজী আছেন। তবে, তাঁর নিজের একটা মত তিনি আমাদের জানালেন। বললেন, প্রথমে আমাদের একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বা'র করা উচিত। সেই কাগজ জনপ্রিয় হলে তাকে কেন্দ্র ক'রেই যদি আমরা জয়ণ্ট স্টক্ কোম্পানী করি তবে শেয়ার ভালো বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সাপ্তাহিক কাগজ বা'র করার জন্যে প্রাথমিক ব্যয় তিনিই বহন করবেন এ কথাও তিনি আমাদের বললেন। তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ না ক'রে আমরা যে একটা দারুণ ভুল করেছিলেম সেই কথা বলার আগে আমি কুত্‌বুদ্দীন সাহেবের কিছু পরিচয় দেব।

কুত্‌বুদ্দীন সাহেব কলকাতার বাশিন্দা ছিলেন। এক সময়ে তিনি মিলিটারী একাউণ্ট্‌স্‌ ডিপার্টমেণ্টে অডিটরের কাজ করতেন। পরে চাকরী ছেড়ে দিয়ে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বিখ্যাত উর্দু পত্রিকা 'আল হিলাল' ও 'আল্‌বালাগ'-এর ম্যানেজার হয়েছিলেন। প্রথম যুদ্ধের সময়ে পাঞ্জাবের খাজা আবদুল হাই সাহেব কলকাতায় এসে যখন "ইক্‌দাম" (আগে চলো) নাম দিয়ে একখানা উর্দু দৈনিক বা'র করেছিলেন (সেই সময়ে গবর্নমেণ্টের জুলুমে মাওলানা আজাদের কাগজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং মাওলানা নিজে রাঁচিতে রাজবন্দী ছিলেন) তখন কুত্‌বুদ্দীন সাহেব এই কাগজের সঙ্গেও সংসৃষ্ট ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট অবশ্য এ কাগজ চালাতে দেয় নি। খাজা আবদুল হাই সাহেবকেও বাঙলা দেশ হতে বা'র ক'রে দেওয়া হয়েছিল। কুত্‌বুদ্দীন সাহেবের সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর সম্বন্ধে আরো বড়ো কথা এই ছিল যে তাঁর মাতৃভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাঙলা কাগজ বা'র করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদের পরিচয়

আমরা যদি সেই সময়ে কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করতাম তার চেয়ে ভালো কাজ আর কিছুই হতে পারত না। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিনি ব'লে পরে আমরা, বিশেষ করে আমি অনুতাপ করেছি। আজও সেই কথা মনে পড়লে আমি নিজেকে অনুতপ্ত মনে করি। আমারই হঠকারিতায় শেষ পর্যন্ত "ন্যাশনাল জর্নাল্‌স্‌ লিমিটেড্‌" নাম দিয়ে কোম্পানী রেজিস্ট্রী হয়ে গেল। শ্রীকিরণশঙ্কর রায় হতে শুরু করে মাওলানা আবুবকরকে পর্যন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর করা হলো এই আশায় যে হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্তরা শেয়ার কিনতে রাজী হবেন। অপর দিক বিবেচনা করে কোম্পানীর ইংরেজি অনুষ্ঠান পত্রে 'প্রোলেটারিয়েট' কথাটাও আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেম। বাঙলায় অবশ্য মজুর-চাষী প্রভৃতির কথা বলা

হয়েছিল। ভিতরে ভিতরে আমাদের রাজনীতি রূপ গ্রহণ করছিল। কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার কথাও তখন আমাদের মনে এসেছিল। আবার আমরা একথাও মনে রেখেছিলেম যে শ্রীকিরণশঙ্কর রায় ও মাওলানা আবুবকর আমাদের ডিরেক্টর। তার জন্যে যতটা সংযত হওয়া দরকার ততটা সংযত অবশ্য আমাদের হতে হয়েছিল।

এই সব তো করা হলো, কিন্তু আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা যতগুলি শেয়ার কেনার ওয়াদা করেছিলেন তার বেশী শেয়ার বিক্রয় হলো না। কাজেই, নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে প্রয়োজনীয় শেয়ার বিক্রয় না হওয়ায় কোনো শেয়ার আর কারুর নামে বাঁটা হলো না। তার মানে কোম্পানী আর হলো না। আমাদের, বিশেষ ক'রে আমার বিবেচনার ভুলে কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের অনেক টাকা ডুবে গেল। সেই টাকাতে অনায়াসেই আমরা সাপ্তাহিক কাগজ বা'র করতে পারতাম। বিফলমনোরথ হওয়ার হতাশার ভিতর দিয়েও কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের বন্ধুত্ব আমাদের একটা বড় লাভ হয়েছিল। আগে আমি তাঁকে দূর থেকে দেখে আসছিলেম, তাঁর সঙ্গে মুখামুখী পরিচয় আমার ছিল না। এবারে তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখী পরিচয়ই শুধু হলো না, নজরুলের আর আমার বন্ধুও তিনি হলেন। আরও কিছু দিন পরে তিনি আমাদের মতবাদেরও সমর্থক হলেন। এই কোম্পানী করতে গিয়ে আরও এমন অনেকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল যাঁরা কখনও আমাদের পার্টিতে,—ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্ট্‌স্ পার্টিতে কিংবা কমিউনিস্ট পার্টিতে—যোগ দেন নি বটে, কিন্তু আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব মারা গেছেন।

'ধূমকেতু'র উদয়

'ধূমকেতু'র কথা বলার আগে ক'দিন পরে পরে তা বা'র হতো আর কি তার আয়তন (সাইজ) ছিল, এই কথাগুলি আমায় পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে। এই সম্বন্ধে নানান রকম ভুল ধারণা অনেকের মনেই আছে। এখনও পত্র-পত্রিকায় 'ধূমকেতু'র সাইজ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকে ভুল কথা লিখছেন। নজরুল ইস্‌লামের জীবনী বিষয়ে একখানি পুস্তকের * চারটি সংস্করণ হয়েছে। এই চারটি সংস্করণেই একই ভুল ছাপা হয়েছে। এর চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হয়েছে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে, অর্থাৎ আমার 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে' প্রকাশিত হওয়ার তিন বছর কয়েক মাস পরে। আমি এই চতুর্থ সংস্করণ হতে তুলে দিচ্ছি :—

"এই সময়ে তাঁর (নজরুলের) ইচ্ছে হল একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবার। শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভেঙে নতুন চেতনায় সঞ্জীবিত ক'রে তোলার জন্যে তিনি ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট থেকে তাঁর বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেন (১৩২৯ : ১৯২২, ১২ই আগস্ট), ফুলস্কেপ সাইজ, চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম এক পয়সা। (২৯ পৃষ্ঠা)

---

* বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজ্‌হার উদ্দীন খান প্রণীত।

"অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্যে 'ধূমকেতু' সপ্তাহিক থেকে কিছু দিন অর্ধ-সাপ্তাহিক হিসেবেও বেরোয়।" (৩৩ পৃষ্ঠা)

আসলে নজরুল ইস্‌লামের 'ধূমকেতু' কিন্তু সপ্তাহে দু'বার ব'ার হতো। "হপ্তায় দু'বার দেখা দেবে" এই ঘোষণা কাগজেই থাকত। 'ধূমকেতু' কখনও "সপ্তাহিক" থেকে "অর্ধ-সাপ্তাহিক" হয় নি।

'ধূমকেতু'র প্রতি পৃষ্ঠার সাইজ ছিল লম্বায় পনের ইঞ্চি ও চওড়ায় দশ ইঞ্চি, অর্থাৎ ক্রাউন ফলিও সাইজ। এই রকম আট পৃষ্ঠার কাগজ ছিল 'ধূমকেতু'।

একখানা 'ধূমকেতু'র নগদ দাম ছিল এক আনা আর তার এক বছরের গ্রাহক হওয়ার চাঁদা ছিল পাঁচ টাকা।

'ধূমকেতু'র সারথী (সম্পাদক) ও স্বত্বাধিকারী ছিল কাজী নজরুল ইস্‌লাম। তার কর্মসচিব (ম্যানেজার) ছিল শ্রীশান্তিপদ সিংহ। কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন আফ্‌জালুল হক সাহেব।

নজরুল ইস্‌লামের অন্যতম চরিতকার ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিত মানসে' 'ধূমকেতু'র এই আয়তন ইত্যাদির কথাগুলি সঠিক দিয়েছেন।

নজরুল ইস্‌লামের 'ধূমকেতু'র কয়েকটি সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে।

দশ বছর পরে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিকের 'ধূমকেতু' নজরুলের 'ধূমকেতু' ছিল না।

এখন আমি কিঞ্চিৎ আগেকার ঘটনাসহ 'ধূমকেতু'র জন্মকথা বলব। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের ৩/৪-সি তালতলা

লেনের বাড়ী হতে নজরুল ইস্‌লাম কুমিল্লা চলে যায়। তারপরে সে আর আমি একসঙ্গে আর কখনো থাকিনি। কুমিল্লায় সেই বারে সে একসঙ্গে তিন-চার মাস ছিল। চার মাসের কিছু কমই হবে। এই বারে কুমিল্লাতে থাকার সময়েই সে তার বিখ্যাত "প্রলয়োল্লাস" কবিতা রচনা করেছিল। এই কবিতার কথা আমি পরে আলোচনা করব। কবিতাটি 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল।

'সেবকে'র বিশেষ অনুরোধে নজরুল কুমিল্লা হতে কলকাতায় ফিরে এসেছিল। 'সেবক' বাঙলা দৈনিক কাগজ ছিল। তার মালিক ও সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মুহম্মদ আক্‌রম খান। রাজদ্রোহের (ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪-এ ধারার) অপরাধে তখন তিনি এক বছরের কয়েদ খাটছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ইংরেজি কাগজ 'সার্‌ভেণ্ট' এর নামের সঙ্গে অর্থের মিল রেখে মাওলানা আক্‌রম খান তাঁর কাগজের 'সেবক' নাম রেখে-ছিলেন। মূলত বিরাট-ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলনের কাগজ ছিল 'সেবক'। যদিও এই আন্দোলনের হাজার হাজার বন্দী তখনও জেলে ছিলেন তবুও ১৯২২ সালের মে জুন মাস পর্যন্ত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। 'সেবক' আর তেমন বিক্রয় হচ্ছিল না। মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী সাহেব তখন ছিলেন 'সেবকের' প্রকৃত সম্পাদক। 'নবযুগের' প্রসঙ্গে তাঁর কথা আমি বলেছি। কাগজের বিক্রয় পড়ে যাওয়ার কথা তিনি আমায় বললেন এবং আরও বললেন যে নজরুল ইস্‌লামকে মাসিক একশ' টাকা বেতন দেওয়ার কথা ব'লে কুমিল্লায় তিনি পত্র লিখে দিচ্ছেন। "তিনি এসে লেখা আরম্ভ করলে যদি কাগজের বিক্রয় বাড়ে", এই কথাও বললেন ওয়াজিদ আলী সাহেব। পত্র পেয়েই নজরুল কুমিল্লা হতে চলে এলো। বলা বাহুল্য, কুমিল্লায় সে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসাতেই ছিল।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল যদি কলকাতায় ফিরে না এসেও

থাকে তবে জুন মাসের শুরুতে ফিরে এসে সে নিশ্চয় 'সেবকে' যোগ দিয়েছিল। ২৪শে জুন (১৯২২) তারিখে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান। এই মৃত্যু নজরুলকে খুবই বিচলিত করেছিল। পরের ভোরের 'সেবকে', সে গভীর অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতা মিশিয়ে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিল। আমার যতটা মনে পড়ে এত অনুভূতি দিয়ে অন্য কোনো কাগজ কবি সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সম্পাদকীয় লেখেনি।

নজরুল 'সেবকে' কাজ করেই যাচ্ছিল। এর মধ্যে এক অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত অবস্থায় একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বা'র করার কথা একজন এসে তার নিকটে তুলল। হাফিজ মস্ঊদ আহ্মদ নামক

'ধূমকেতু'র জন্ম-কথা

একজন লোকের সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। তার বাড়ী ছিল চট্টগ্রাম জিলায়। যাঁদের পুরো কুর্আন্ মুখস্থ থাকে তাঁদের হাফিজ বলা হয়। মস্ঊদ আহ্মদেরও সম্ভবত কুর্আন মুখস্থ ছিল। সে দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়েছিল বলে তাকে আমি খানিকটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। উত্তর প্রদেশের সাহারনপুর জিলায় দেওবন্দ মাদ্রাসায় ধার্মিক ভিত্তিতে ব্রিটীশ-বিরোধী বিপ্লবী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হতো। তবে, সেখানকার প্রত্যেক ছাত্রই যে বিপ্লবী হতো এমন কোনো কথা নেই। মস্ঊদ আহ্মদকে অন্য কারণে আমি পসন্দ করতাম না। বাঙালী হয়েও বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গেও সে উর্দুতে কথা বলত। এটাই ছিল কারণ যার জন্যে তার সঙ্গে আমি কখনও ঘনিষ্ঠ হইনি। মনে আছে একদিন বিকাল বেলা আমি ধর্মতলা স্ট্রীটের ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিলেম। কোথা থেকে মস্ঊদ আহ্মদ আমার পাশে এসে দাঁড়াল এবং কেমন আছি ইত্যাদি কথা আমায় জিজ্ঞাসা করল। শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে মস্ঊদ আহ্মদ বাঙলায় কথা বলছে, যদিও ভালো বাঙলা বলার চেষ্টা ক'রে সে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল। সে 'সমস্যা'কে উচ্চারণ করছিল 'সমিস্যা'। তখন বুঝেছিলাম যে শিশু বয়স হতেই মস্ঊদ আহ্মদ মাদ্রাসায় পড়েছে,

বাঙলা লেখা-পড়া কখনও করে নি। তার মাতৃভাষা ছিল চাটগাঁর বিশিষ্ট বাঙলা বুলি। সে বুলিতে সে বাইরের লোকের সঙ্গে কথা কখনও বলত না।

মস্‌উদ আহ্‌মদ আমার নিকটে একটি প্রস্তাব এই ব'লে করল যে একখানা বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকা সে বার করতে চায় এবং তার লেখার ও চালাবার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। কাগজখানা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিক কাগজ হবে একথাও সে আমায় বলল। খলিফা ওমর যে 'সোশ্যালিজমে'র খানিকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সে কথার উল্লেখ করতেও সে ভুলল না। সব শুনে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম টাকার কি ব্যবস্থা হবে? সে জানাল যে আড়াইশ' টাকা সে জোগাড় করেছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার প্রস্তাব নাকচ করে দিলাম। আমি তাকে বলে দিলাম যে আড়াইশ' টাকা মাত্র হাতে নিয়ে কাগজ বার করতে যাওয়া হঠকারিতা হবে। মনে হলো যে সে হতাশ হয়ে চলে গেল। আসলে সে কিন্তু হতাশ হয় নি। আমি তার প্রস্তাব নাকচ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে সোজা কাজী নজরুল ইস্‌লামের নিকটে চলে গেল এবং একই প্রস্তাব তার নিকটেও করল। 'সেবক'-এ নজরুল সুখী ছিল না। কাজেই, মস্‌উদ আহ্‌মদের প্রস্তাবে সে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। একাজে তার যাওয়া উচিত কিনা এ পরামর্শ সে কারুর সঙ্গে করল না, আমার সঙ্গে তো নয়ই। কারণ, আমি মস্‌উদ আহ্‌মদের প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছিলেম। বন্ধুদের সে শুধু জানাল যে একখানা কাগজ সে বা'র করতে যাচ্ছে, সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি চায়। মস্‌উদ আহ্‌মদের প্রস্তাব ছিল সাপ্তাহিক কাগজের, কিন্তু নজরুল ঠিক করল যে কাগজখানা সপ্তাহে দু'বার বা'র হবে।

নজরুলই কাগজের নাম স্থির করল "ধূমকেতু"। আফ্‌জালুল হক সাহেব মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে চিফ প্রেসিডেন্সী

ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হতে ডিক্লারেশন নিলেন। তখন ডিক্লারেশন নেওয়া সহজ হয়ে গিয়েছিল। জামানত হিসাবে টাকা জমা দিতে হতো না। ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট। কুমিল্লা হতে ফিরে এসে 'সেবকে' যোগ দেওয়ার পরে নজরুল আফ্‌জাল সাহেবের সঙ্গে এ বাড়ীতেই ছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাণী

বাণী চেয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (তখন পণ্ডিচেরিতে ছিলেন) এবং আরও অনেককে পত্র লিখেছিল। বাণী তাঁদের নিকট হতে এসেওছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কবিতায় নিম্নলিখিত কয় ছত্র পাঠিয়েছিলেন :

কাজী নজরুল ইস্‌লাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্‌না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ
১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ফটোস্টার্ট কপি হতে উদ্ধৃত)

রবীন্দ্রনাথ একবার নজরুলকে তলওয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন তিনি সত্যই, কিন্তু কথাটা নানান জনে নানান ভাবে লিখেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এক জায়গায় কথাটা

লিখেছেন। আমি নজরুলের মুখে যা শুনেছিলেম তা হচ্ছে এই যে সাক্ষাতের প্রথম দিনেই রবীন্দ্রনাথ কথাটা নজরুলকে বলেছিলেন। তখনও তিনি ভাবেন নি যে নজরুল গভীর ভাবে রাজনীতিক সংগ্রামে বিশ্বাসী। নজরুল কবি, কাব্যচর্চাই তার পেশা হওয়া উচিত, তার মানে রাজনীতিতে তার যাওয়া উচিত নয়,—এই সব ভেবেই তিনি তলওয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছার কথাটা বলেছিলেন। অন্ততঃ, নজরুল তাই বুঝেছিল। রবীন্দ্রনাথ শুধু ওই কথা বলেই চুপ করে যান নি। তিনি তার সঙ্গে একটি প্রস্তাবও দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, নজরুল শান্তিনিকেতনে চলুক। সেখানে সে ছেলেদের কিছু কিছু ড্রিল শেখাবে আর গান শিখবে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে।

কিন্তু "ধূমকেতু"র জন্যে নজরুল যখন রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে বাণী চাইল তখন তিনি তাকে বুঝে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে সে নিজে যে-পথ বেছে নিয়েছে তাকে সেই পথে যেতে দিলেই সে বিকশিত হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ যে-বাণী নজরুলকে পাঠিয়েছিলেন সেটা ছিল নজরুলের প্রতি তাঁর রাজনীতিক আশীর্বাদ। তাই তিনি তাকে ব'লে দিলেন—

"জাগিয়ে দেরে চমক মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন"।

যে কথাটা রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প দিনের ভিতরে এবং দূরে থেকেও বুঝে নিয়েছিলেন সে কথাটা মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুলের আরও কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধু খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কোনো দিন বুঝতে পারলেন না।

১২ই আগস্ট (১৯২২) তারিখে "ধূমকেতু"র প্রথম সংখ্যা বা'র হলো। শিক্ষিত তরুণদের ভিতরে সঙ্গে সঙ্গেই তা জনপ্রিয়তা লাভ ক'রে ফেলল। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী মাথায় বহন করেই "ধূমকেতু" বা'র হতে লাগল। ওদিকে মসৃউদ আহ্‌মদ পুরো আড়াই শ' টাকাও দিতে পারল না। যতটা মনে পড়ে সে দু'শ টাকা পর্য্যন্ত

দিয়েছিল। পরে আমরা জানতে পেরেছিলেম যে সে পুলিসের দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিল। টাকাও তার পুলিসের নিকট হতেই পাওয়ার কথা ছিল। পুলিসই সম্ভবত টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। বাঁকী পঞ্চাশ টাকা মস্‌উদ আহ্‌মদ দিলেও তেমন কোনো সাশ্রয় হতোনা। আর্থিক সঙ্কট শুরু হতেই শুরু হয়েছিল। তবুও যে কাগজ চলছিল তার কারণ ছিল এই যে কাগজ নগদ বিক্রয় হয়ে কিছু কিছু পয়সা সঙ্গে সঙ্গেই হাতে এসে যাচ্ছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বা অগ্রিমও টাকা দিচ্ছিল এমন ক'টা বিজ্ঞাপনও পাওয়া গিয়েছিল। 'এক্সপার্ট এড্‌ভারটাইজিং এজেন্সী' সেই সময়ে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিল "ধূমকেতু"কে।

"ধূমকেতু"তে জনগণের কথা একেবারেই বলা হতোনা, এটা মোটেই ঠিক কথা নয়। তবে "ধূমকেতু"র মারফতে নজরুল মূলত তার আবেদন জানাচ্ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের বরাবরে। নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের খাতিরে বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখেছিলেন। নজরুলের আবেদন আসলে পৌঁছে যাচ্ছিল তাঁদেরই নিকটে। শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে সে যখন পড়ছিল তখন শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক সেই স্কুলে নজরুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের একজন সভ্য। ফৌজ হতে ফিরে আসার পরে নজরুল আমায় বলেছিল যে শ্রীঘটকের চেষ্টায় তার ওপরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের খানিকটা প্রভাব পড়েছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সে শ্রদ্ধা করত। শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটকের ১৯৬০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যু হয়েছে।

"ধূমকেতু" জনগণের নিকটে পৌঁছাতে পারেনি। শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর ভিতরে তার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই "ধূমকেতু" খুব বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও এই শ্রেণীরই লোক। কাজেই, নজরুলের আবেদনে

তাঁরাই নূতন ক'রে চেতনা লাভ করছিলেন। এটা আমার অনুমানের কথা নয়। শুধু যে তরুণেরা নজরুলের নিকটে আসছিলেন তা নয়, সন্ত্রাসবাদী 'দাদা'রাও (নেতারা) এসে তাকে আলিঙ্গন ক'রে যাচ্ছিলেন। ১৯২৩-২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে মাথা তুলল, তাতে নজরুলের অবদান ছিল, একথা বললে বোধ হয় অন্যায় করা হবে না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দু'টি বড় বিভাগের মধ্যে 'যুগান্তর' বিভাগের সভ্যরা তো বলছিলেন যে "ধূমকেতু" তাঁদেরই কাগজ।

নজরুল যে শ্রীনিবারণ ঘটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সেকথা আগে বলেছি। কিন্তু সে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কোনো দলের সভ্য ছিল না। অতিমাত্রায় নিরুপদ্রবতা প্রচারের ফলে দেশ খানিকটা মিইয়ে গিয়েছিল। এই মিয়ানো হতে নজরুল তার লেখার ভিতর দিয়ে দেশকে খানিকটা চাঙ্গা করে তুলতে চেয়েছিল। এই করতে গিয়ে সে যে ঢেউ তুলেছিল তার দোলা লাগল গিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রাণে।

মহান উর্দু কবি ফজ্‌লুল হাসন হস্‌রৎ মোহানী আহমদাবাদে কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগের অধিবেশনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে কঠিন মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও

বাঙলার কবি নজরুল ইস্‌লাম ১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে "ধূমকেতু"তে লিখেছিল :

"প্রথম সংখ্যার "ধূমকেতু"তে 'সারথির পথের খবর' প্রবন্ধে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করেছিলাম, যা বলতে চাই, তা বেশ ফুটে ওঠেনি মনের চপলতার জন্য। আজও হয়ত নিজেকে যেমনটি চাই তেমনটি প্রকাশ করতে পারব না, তবে এই প্রকাশের পীড়ার থেকেই আমার বলতে-না-পারা বাণী অনেকেই বুঝে নেবেন—আশা করি।

* * * *

"সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

"স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেন না, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।"

অনেকে হয়তো নিজেদের বৈঠকখানায় বসে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিংবা হয়তো গোপন ইশ্‌তিহার ছেপে তার মারফতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু এমন দ্ব্যর্থহীন, চাঁছা-ছোলা ভাষায় খবরের কাগজে ঘোষণা ক'রে বাঙলা দেশে নজরুলের মতো আর কে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে তুলে ধরেছিলেন তা আমার জানা নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমি ১৯২২ সালের কথা বলছি, যখন গান্ধীজী বলেছিলেন যে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্' পেলেই তিনি 'ইউনিয়ন জ্যাক্' (ব্রিটিশ পতাকা) উড়িয়ে দিবেন! তা ছাড়া, পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী হতে উত্থিত মাওলানা হস্‌রৎ মোহানীর বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমার পরিসমাপ্তি সবেমাত্র তখন বোম্বে হাইকোর্টে হয়েছিল। ১৯২১ সালের শেষ সপ্তাহে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের ও অল-ইণ্ডিয়া মুস্‌লিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন আহ্‌মদাবাদে হয়েছিল। ১৯১৬ সালে লখ্‌নউ সমঝতার পর হতে এই দু'টি সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশন

একই সময়ে একই জায়গায় হয়ে আসছিল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির, অবশ্য ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির, তরফ হতে সর্বপ্রথম ইশ্‌তিহার বিতরিত হয়েছিল। তাতে যে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। কংগ্রেসের এই আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনেই মাওলানা হস্‌রৎ মোহানী উর্দু ভাষায় ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন *। তার আগে কংগ্রেসের মঞ্চ হতে আর কখনও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। গান্ধীজীর তীব্র বিরোধিতায় প্রস্তাবটি পাস হতে পায়নি। কিন্তু মাওলানা হস্‌রৎ মোহানীকে প্রস্তাবটি উত্থাপনের কারণে ফল ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আহ্‌মদাবাদের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (Indian Penal Code) ১২৪-এ ধারা (রাজদ্রোহ) ও ১২১ ধারা (সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা) মোকদ্দমা রুজু হল। এই সব ধারায় মোকদ্দমা করতে হলে পুলিস সোজাসুজি তা দায়ের করতে পারেনা। তার আগে প্রাদেশিক কিংবা ভারত গবর্নমেণ্টের মঞ্জুরী নিতে হয়। বুঝতে হবে যে পুলিস এই মঞ্জুরী পেয়েছিল। অল-ইণ্ডিয়া মুস্‌লিম লীগের অধিবেশনে মাওলানা হস্‌রৎ মোহানী সভাপতি ছিলেন। সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতার বিষয়ে তাঁর বক্তৃতার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারার (সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার) মোকদ্দমাটি হয়েছিল। কংগ্রেসের প্রস্তাব উত্থাপনের জন্যে যে-রাজদ্রোহের মোকদ্দমা হয়

* "The object of the Indian National Congress is the attainment of Swaraj or Complete Independence free from all foreign Control by the People of India by all legitimate and peaceful means."

আর. বেঙ্কটরামন (বোম্বে ক্রনিকল), কুমারানন্দ, ইয়াকুব আলী খান, অন্ধ্র দেশের ভি. পি. আলওয়ার সবজেক্ট কমিটিতে প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে হস্‌রৎ মোহানীর উপস্থিত হতে কিঞ্চিৎ দেরী হওয়ায় কুমিল্লার বসন্ত মজুমদা'র প্রস্তাবটিকে আপন প্রস্তাব ব'লে মেনে নিয়েছিলেন।

তাতে তাঁর দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১২১ ধারার মোকদ্দমায় জুররা মাওলানা হসরৎ মোহানীকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন। সেশন জজ তাদের সঙ্গে একমত হলেন না। এই ধারায় সর্বনিম্ন সাজা হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সর্বোচ্চ সাজা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। অন্তত সর্বনিম্ন সাজার কথা মনে রেখেই জজ জুররদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কাজেই, ধরে নিতে হবে যে সেশন জজ হসরৎ সাহেবকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজাই দিয়েছিলেন। এই রকম অবস্থায় ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের বিধানানুসারে মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাতে হয়। তাই পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেশন জজের জুরিদের সঙ্গে একমত না হওয়ার কারণ দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁর ঝোঁক ১২১ ধারার দিকেই ছিল। এই জন্যে কোন কোনো কাগজ তখন লিখেছিল যে হসরৎ সাহেবকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের জজেরা মত প্রকাশ করলেন যে শুধু বক্তৃতার জন্যে ১২১ ধারার প্রয়োগ হতে পারেনা। তাঁরা রাজদ্রোহের সাজা (দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড) বহাল রেখেছিলেন। আমি হাইকোর্টের রায় পড়িনি। সম্ভবত পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথাটা জজেরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। ১১ই জুলাই, ১৯২২, তারিখে হাইকোর্ট মোকদ্দমার রায় দিয়েছিলেন। নজরুলের ওপরে উদ্ধৃত লেখার সঙ্গে মাওলানা হসরৎ মোহানীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি তুলনীয়। মাওলানা হসরৎ মোহানীর হাইকোর্টের মোকদ্দমা সবে শেষ হয়েছিল। আগে এই ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা কোনো বৈধ কাগজে এইরূপ খোলাখুলিভাবে কেউ বলেছেন ব'লে আমার জানা নেই। গোপন ইশতিহারে অনেকেই বলে থাকতে পারেন। অনেক শক্ত বুকের পাটা ছিল বলেই নজরুল এইভাবে খোলাখুলি পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলতে পেরেছিল, এই বলার জন্যে হসরৎ মোহানীর কঠোর সাজা হওয়া সত্ত্বেও।

"ধূমকেতু"র কল্যাণে অনেক নূতন নূতন লোকের সঙ্গে

নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। অনেক সব নূতন বন্ধু নজরুল পেয়েছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সেই সময়েই হয়েছিল নজরুলের প্রথম পরিচয়। ছোট ছেলে বললেই হয়, যতটা মনে পড়ে ইন্‌টারমিডিয়েট ক্লাসে তখন সে পড়ত। কিন্তু আই. এ. ক্লাসে পড়লে কি হয়, নানান বিষয়ে নৃপেনের অনেক পড়াশুনা ছিল। যাঁর সঙ্গেই তখন তার পরিচয় হয়েছে তিনিই নৃপেনকে না ভালো-বেসে পারেন নি। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের জীবন নিয়ে নৃপেন "ধূমকেতু"তে লিখত। নিজের নাম দস্তখৎ করত ত্রিশূল। "ধূমকেতু" বা'র করতে গিয়ে নজরুল যাঁদের নূতন বন্ধুরূপে পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে নৃপেন ছিল নজরুলের একটি বড়-পাওয়া। নৃপেন আমারও স্নেহাস্পদ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। যে-অল্প সংখ্যক লোকের সঙ্গে আমি কথাবার্তায় তুমি বলতাম কিংবা এখনও বলি তাদের ভিতরে সেও ছিল একজন। সে কোনো দিন 'আপনি' কথা আমাকে উচ্চারণ করতেই দেয়নি। অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে 'টক্‌' দিতে গিয়ে যখন নজরুলের রোগের লক্ষণ দেখা দিল, তার জিহ্‌বা জড়িয়ে যেতে লাগল, তখন নৃপেনই ছিল নজরুলের পাশে। সে-ই সেদিন নজরুলকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

বাঙলা সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর আমাদের ভিতরে নেই। অকালে মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছে।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা এবং কংগ্রেসেরও নেতা শ্রীভূপতি মজুমদারও "ধূমকেতু"কে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে-ছিলেন,—অর্থ দিয়ে নয়, অন্য সব রকমে। তিনি তো, কোনো কোনো দিন "ধূমকেতু" আফিসেই রাত্রি বাস করতেন। শ্রীমজুমদারকে বাঙলা দেশে কেনা জানেন? দু'বার তিনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন।

আর একজন "ধূমকেতু"কে সাহায্য করতে এসেছিলেন কলম হাতে নিয়ে। তাঁর নাম শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কুমিল্লার

শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পুত্রের সঙ্গে তাঁকে কেউ যেন ভুল না করেন। তাঁর নাম ছিল বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তরা আসলে ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার লোক। তবে, তাঁর পরিবার স্থায়ীভাবে বাকেরগঞ্জ জিলায় বাস করতেন। তিনি "ধূমকেতু"তে লিখতেন। কোন কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগের একজন লোককে যেমন প্রতিদিন লিখতে হয় ঠিক সেই রকমই লিখতেন তিনি "ধূমকেতু"তে। পরে তিনি ফ্রি প্রেস অফ ইণ্ডিয়া এবং ইউনাইটেড্ প্রেস অফ ইণ্ডিয়াতেও কাজ করেছেন। এখন তিনি শুনেছি কোনো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন।

বলাই দেবশর্মার লেখা "ধূমকেতু"তে ছাপা হয়েছে এবং আরও অনেকের লেখা। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তেন প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। কৃতী ছাত্র ছিলেন। তাঁকেও "ধূমকেতু" আফিসে আসতে দেখেছি। তাঁর লেখাও "ধূমকেতু"তে ছাপা হয়েছে। মনে পড়ে আমিও দ্বৈপায়ন ছদ্ম নামে দু' একবার "ধূমকেতু"তে লিখেছি। কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে নজরুলের তখন পুরোপুরি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তবুও তাঁকে আমি একদিন "ধূমকেতু" আফিসে আসতে যে দেখেছি তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে সময়ে নজরুল আফিসে উপস্থিত ছিলনা। তাঁর ছাত্র শ্রীশান্তিপদ সিংহ ও আমার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেছিলেনে। নজরুল হিন্দু দেব-দেবীর কথা লিখত। "ধূমকেতু"তেও তাই লিখছিল। তার জন্যে সেদিনই মোহিতলাল বলেছিলেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" এই ব'লে তিনি আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন কিনা কে জানে?

৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট হতে "ধূমকেতু"র সাত-আট সংখ্যা বা'র হয়েছিল। শীল ভ্রাতৃদের বাড়ীর ওই অংশটা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ভাড়া নিয়েছিল। তা থেকে একখানা ঘর আফ্জালুল হক সাহেবকে সাহিত্য সমিতি সব্লেট করেছিল। এই কথা আমি

আগেও বলেছি। "ধূমকেতু"কে নিয়ে পুলিসের হাঙ্গামা হতে পারে ভেবে শীল ভ্রাতৃগণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফজালুল হক সাহেব শীলেদের ভাড়াটে ছিলেন না। এই সুযোগ নিয়ে শীলেদের যে ভাইটি উকিল ছিলেন তিনি রাগে গরগর করতে করতে একদিন এসে বললেন যে "এখান হতে আমরা 'ধূমকেতু' বা'র করতে দেবনা।" তখন আজকার মতো এমন কোনো আইন ছিল না যে যার দ্বারা ভাড়াটের ভাড়াটে কেউ হলে তাঁরও দাবী বর্তাতে পারে। আসলে কিন্তু অন্যত্র উঠে যাওয়ার জন্যে আগে হতেই নজরুল বাড়ী খুঁজছিল। সেই কথাই বাড়ীর মালিকদের জানিয়ে দেওয়া হলো। "ধূমকেতু" বিলি করার হকার-দের যিনি প্রধান ছিলেন বালিয়া জিলার সেই দুবে (তাঁর নাম কিছুতেই এখন মনে করতে পারছিনে) এর মধ্যে একটা বাড়ী বের করেও ফেলেছিলেন। দৈনিক "নবযুগ" বিলি করার কন্‌ট্রাক্টও এই দুবেকেই দেওয়া হয়েছিল। তার ভিতর দিয়ে আমার ও নজরুলের সঙ্গে তাঁর একটা ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল। আমাদের বা'র করা কাগজকে তিনি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতেন। ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের বাড়ীটি দুবেই ভাড়া ক'রে দিয়েছিলেন, দোতালায় তিনটি খুব বড় বড় ঘর। রান্না ঘরও ছিল। যতটা মনে পড়ে পায়খানা ও স্নানের জায়গা ছিল নীচে।

প্রতাপ চাটুজ্যের লেনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। মেডিক্যাল কলেজের সামনেকার এই গলিতে ঢুকে বাঁ দিককার শেষ বাড়ীটি ছিল সুবিখ্যাত সাহিত্য-স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। এটা এটা একমুখো গলি ছিল। বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীটি "ধূমকেতু" আফিসের গায়ে লাগা ছিল, না, তার একটি বাড়ী পরে ছিল তা আজ আমি মনে করতে পারছিনে। আমি অন্য সময়ে অন্য কাজে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়েছি। সেই বাড়ীতে মেয়েদের পর্দার যে-ব্যবস্থা দেখলাম তা মুসলমানদেরও হার মানিয়ে দেয়।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদলের নেতারা "ধূমকেতু"র প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের বাড়ীতেই বেশী এসেছেন। এই বাড়ীতে গিয়েই অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মিত্রের সহিত নজরুলের প্রথম পরিচয় হয়। "ধূমকেতু" আফিসের একেবারে গায়ে লাগা উত্তর দিকে ছিল অধ্যাপক মিত্রদের বাড়ী। তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইকনমিক্স্ পড়াতেন। তখন তিনি নূতন যুবক। নজরুলের চেয়ে দু'চার বছরের বড় হয়তো হবেন। পরে নজরুলের লেখা একখানা পত্রে দেখেছি সে অধ্যাপক মিত্রকে বড়দা ডাকত। শ্রীমিত্র বোধ হয় বাড়ীতে ভাই-বোনেদের বড়দা ছিলেন। তাঁর একটি ছোট বোন ছিল, এগারো বছর বয়স হবে। ওই বয়সেই সে লিখতে পারত। তার ছোট ছোট লেখা "ধূমকেতুতে" ছাপা হয়েছে। 'আনন্দময়ীর আগমনে' "ধূমকেতুর" যে সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল সেই সংখ্যায় এই মেয়েটিরও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নাম দিয়ে একটি লেখা ব'ার হয়েছিল। 'আনন্দময়ীর আগমনে'র সঙ্গে বাঙলার সরকার এই লেখাটিকেও বাজেয়াফ্‌ৎ করেছিল। এই মেয়েটির নাম আমি ভুলে গেছি। মমতা মিত্র কি?

একজন অন্তত লিখেছেন * যে "ধূমকেতু"র বা'র করা ও পরিচালনার পেছনে আমারও হাত ছিল। ওপরে আমি যা লিখেছি তা থেকে সকলে নিশ্চয় বুঝেছেন যে আমার কোনো হাত তাতে ছিল না। ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসে নজরুল আর আমি ঠিক করি যে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে এগিয়ে যাব। পড়াশুনা করব বলে সামান্য কিছু পুঁথি-পুস্তকও কিনেছিলাম। এই অবস্থাতেই ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল তার 'বিদ্রোহী' লিখেছিল। কিন্তু ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নজরুল কুমিল্লায় চলে গিয়ে অনেক দিন সেখানে থাকল। সেই সময়ে চিঠি-পত্রের ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ চটাচটিও হয়ে গেল। অবশ্য, এমন কোনো চটাচটি নয় যার জন্যে আমাদের মুখ দেখাদেখি

---

* বিপ্লবের পদচিহ্ন—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

বললেন। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তরফ হতে মানবেন্দ্রনাথ রায় তখন ভারতের চার্জে রয়েছেন। কবিকে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা তিনি আমায় লিখেছিলেন। আমি নজরুলকে সেই কথা মনে করিয়ে দিলাম। বল্‌লাম, "গা-ঢাকাই যদি দেবে তবে ইউরোপে কেন চলে যাবে না? পাঠানোর ব্যবস্থা করা খুবই শক্ত। তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।" নজরুলের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা ছিলনা। সে পুলিসের নজর হতে সাময়িক ভাবে সরে গেল বটে, আসলে কিন্তু গা-ঢাকা দিলনা। সে যখন কুমিল্লা হতে ফিরে আসছিল তখন তার সঙ্গে সকন্যা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীও এসে-ছিলেন। তাঁরা কলকাতা অতিক্রম করে সমস্তিপুরে যাচ্ছিলেন। সেখানে গিরিবালা দেবীর ভাইদের বাড়ী। নজরুল পুলিসের নজর এড়িয়ে সমস্তিপুরে চলে গেল।

এর মধ্যে "ধূমকেতু" আফিস তালাশির ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (Indian Penal Code) ১২৪-এ ধারা অনুসারে "ধূমকেতু"র সম্পাদক কাজী নজরুল ইস্‌লাম এবং তার মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফ্‌জালুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে গিরেফ্‌তারী পরওয়ানা বা'র হয়ে গিয়েছিল।

তারিখটা ১৯২২ সালের ৮ই নবেম্বর ছিল। কমরেড আবদুল হালীম আর আমি সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এক দোকানে চা খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে "ধূমকেতু" আফিসে গেলাম। আমরা তখন চাঁদনীর ৩ নম্বর গুমঘর লেনে আমার ছাত্রদের বাড়ীতে রাত্রে ঘুমাতাম। ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেনস্থিত "ধূমকেতু" আফিসে গিয়ে দেখলাম অত সকালেও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এসে "ধূমকেতু"র জন্যে লিখছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোতালায় ওঠার সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলি জুতোর শব্দ শোনা গেল। পুলিস এসেছে "ধূমকেতু" আফিসে তালাশীর পরওয়ানা ও কাজী নজরুল ইসলামের নামে গিরেফতারী পরওয়ানা নিয়ে। নজরুল তখন সমস্তিপুরে

গিয়েছিল বলে গিয়েফতার হয়নি। পুলিস আসায় মুহূর্তের ভিতরে বীরেন বাবু যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন আমরা তার কিছুই টের পেলাম না। পুলিস প্রথমে নজরুলকে খুঁজল। আমরা জানালাম যে তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও গেছেন। তখন পুলিস আমাদের গবর্নমেণ্ট অর্ডার দেখালেন যে ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখের "ধূমকেতু"তে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক একটি কবিতা ও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' (অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মিত্রের ছোট্ট বোনটির লেখা) শীর্ষক একটি ছোট প্রবন্ধ বাজেয়াফৎ হয়ে গেছে। পুলিস এই সংখ্যার কপিগুলি নিয়ে যাবেন বললেন। তারপরে বাড়ীতে তালাশি হলো। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের "ধূমকেতু"র যে কয়খানা কপি পাওয়া গেল তাই নিয়ে পুলিস চলে গেলেন। আমাকে সার্চলিস্টও দিয়ে গেলেন। পুলিস চলে যাওয়ার পরে দেখলাম বীরেন বাবু হাসতে হাসতে পূব দিককার মেডিকাল ছাত্রদের বোর্ডিং হাউস থেকে বেরিয়ে আসছেন। "ধূমকেতু" আফিসের বারান্দা ও মেডিকাল ছাত্রদের বোর্ডিং হাউসের বারান্দা কাঠের দরওয়াজার দ্বারা বিভক্ত ছিল। ছাত্রদের দিক হতেই সেটা বন্ধ হতো। বীরেন বাবু আগেই ব'লে রেখেছিলেন কি না জানিনে, পুলিসকে আসতে দেখেই ছাত্ররা দরওয়াজাটা খুলে দিয়েছিলেন এবং বীরেন বাবু চলে গিয়েছিলেন সেই বাড়ীতে।

"ধূমকেতু"র অনেক লেখা নিয়েই নজরুলের নামে মোকদ্দমা হতে পারত, কিন্তু মোকদ্দমা হলো 'আনন্দময়ীর আগমনী'কে নিয়ে! এই কবিতাটি লেখার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সে বছর প্রথম বা'র হয়েছিল। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীপ্রফুল্ল সরকার ও শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র) ছিলেন এই পত্রিকার মালিক। মৃণাল বাবু নজরুলকে ভালোবাসতেন। নজরুল তাঁর

বললেন। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তরফ হতে মানবেন্দ্রনাথ রায় তখন ভারতের চার্জে রয়েছেন। কবিকে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা তিনি আমায় লিখেছিলেন। আমি নজরুলকে সেই কথা মনে করিয়ে দিলাম। বল্‌লাম, "গা-ঢাকাই যদি দেবে তবে ইউরোপে কেন চলে যাবে না? পাঠানোর ব্যবস্থা করা খুবই শক্ত। তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।" নজরুলের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা ছিলনা। সে পুলিসের নজর হতে সাময়িক ভাবে সরে গেল বটে, আসলে কিন্তু গা-ঢাকা দিলনা। সে যখন কুমিল্লা হতে ফিরে আসছিল তখন তার সঙ্গে সকন্যা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীও এসে-ছিলেন। তাঁরা কলকাতা অতিক্রম করে সমস্তিপুরে যাচ্ছিলেন। সেখানে গিরিবালা দেবীর ভাইদের বাড়ী। নজরুল পুলিসের নজর এড়িয়ে সমস্তিপুরে চলে গেল।

এর মধ্যে "ধূমকেতু" আফিস তালাশির ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (Indian Penal Code) ১২৪-এ ধারা অনুসারে "ধূমকেতু"র সম্পাদক কাজী নজরুল ইস্‌লাম এবং তার মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফ্‌জালুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে গিরেফ্‌তারী পরওয়ানা বা'র হয়ে গিয়েছিল।

তারিখটা ১৯২২ সালের ৮ই নবেম্বর ছিল। কমরেড আবদুল হালীম আর আমি সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এক দোকানে চা খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে "ধূমকেতু" আফিসে গেলাম। আমরা তখন চাঁদনীর ৩ নম্বর গুমঘর লেনে আমার ছাত্রদের বাড়ীতে রাত্রে ঘুমাতাম। ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেনস্থিত "ধূমকেতু" আফিসে গিয়ে দেখলাম অত সকালেও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এসে "ধূমকেতু"র জন্যে লিখছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোতালায় ওঠার সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলি জুতোর শব্দ শোনা গেল। পুলিস এসেছে "ধূমকেতু" আফিসে, তালাশীর পরওয়ানা ও কাজী নজরুল ইসলামের নামে গিরেফতারী পরওয়ানা নিয়ে। নজরুল তখন সমস্তিপুরে

গিয়েছিল বলে গিয়েফতার হয়নি। পুলিস আসায় মুহূর্তের ভিতরে বীরেন বাবু যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন আমরা তার কিছুই টের পেলাম না। পুলিস প্রথমে নজরুলকে খুঁজল। আমরা জানালাম যে তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও গেছেন। তখন পুলিস আমাদের গবর্নমেণ্ট অর্ডার দেখালেন যে ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখের "ধূমকেতু"তে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক একটি কবিতা ও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' (অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মিত্রের ছোট্ট বোনটির লেখা) শীর্ষক একটি ছোট প্রবন্ধ বাজেয়াফৎ হয়ে গেছে। পুলিস এই সংখ্যার কপিগুলি নিয়ে যাবেন বললেন। তারপরে বাড়ীতে তালাশি হলো। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের "ধূমকেতু"র যে কয়খানা কপি পাওয়া গেল তাই নিয়ে পুলিস চলে গেলেন। আমাকে সার্চলিস্টও দিয়ে গেলেন। পুলিস চলে যাওয়ার পরে দেখলাম বীরেন বাবু হাসতে হাসতে পূব দিককার মেডিকাল ছাত্রদের বোর্ডিং হাউস থেকে বেরিয়ে আসছেন। "ধূমকেতু" আফিসের বারান্দা ও মেডিকাল ছাত্রদের বোর্ডিং হাউসের বারান্দা কাঠের দরওয়াজার দ্বারা বিভক্ত ছিল। ছাত্রদের দিক হতেই সেটা বন্ধ হতো। বীরেন বাবু আগেই ব'লে রেখেছিলেন কি না জানিনে, পুলিসকে আসতে দেখেই ছাত্ররা দরওয়াজাটা খুলে দিয়েছিলেন এবং বীরেন বাবু চলে গিয়েছিলেন সেই বাড়ীতে।

"ধূমকেতু"র অনেক লেখা নিয়েই নজরুলের নামে মোকদ্দমা হতে পারত, কিন্তু মোকদ্দমা হলো 'আনন্দময়ীর আগমনী'কে নিয়ে! এই কবিতাটি লেখার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সে বছর প্রথম বা'র হয়েছিল। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীপ্রফুল্ল সরকার ও শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র) ছিলেন এই পত্রিকার মালিক। মৃণাল বাবু নজরুলকে ভালোবাসতেন। নজরুল তাঁর

মারফতে একটা বিজ্ঞাপন বা অন্যকিছু, মনে হয় বিজ্ঞাপনই, পেতে চেয়েছিল। মৃণাল বাবু তা পাইয়ে দিতে স্বীকার ক'রে বলেছিলেন যে "তার আগে তুমি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা সংখ্যার জন্যে একটি আগমনী কবিতা লিখে দাও"। নজরুল তাই লিখেছিল 'আনন্দময়ীর আগমনে'। কিন্তু এই কবিতা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ছাপা না হয়ে কেন যে "ধূমকেতু"তে ছাপা হয়েছিল তার কারণ আমি জানি না। খুব সম্ভব কবিতাটি পড়ে 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র কর্তৃপক্ষ তখন তা ছাপতে রাজী হননি। তাঁদের দৈনিক পত্রিকা তখনও নূতন ছিল।

কবিতাটি সরকারে বাজেয়াফ্‌ৎ হয়ে যাওয়ায় নজরুলের কোনো পুস্তকে তা ছাপা হতে পারেনি। দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন নজরুলের সম্বিৎ ছিলনা। ১৯২২ সালে যাঁরা কবিতাটি পড়েছিলেন তার দু'দশ ছত্র তাঁদের অনেকেরই মুখস্থ ছিল। নজরুল সম্বন্ধে নানা লেখায় এই ছত্রগুলিই উদ্ধৃত হচ্ছিল। আমার লেখা "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" যখন ছাপা হচ্ছিল তখন আমি দেখতে পেলাম যে "ধূমকেতু"র সেই সংখ্যাটি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' রয়েছে। তা থেকে নিয়ে পুরো কবিতাটি আমি "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে"তে তুলে দিয়েছিলেম। এই পুস্তকেও কবিতাটি তুলে দিলাম।

আনন্দময়ীর আগমনে

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,—আসবি কখন সর্বনাশী ?
দেব-সেনা আজ টান্‌ছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে ?
বিষ্ণু নিজে বন্দী আজি ছয়-বছরী ফন্দি-কারায়,
চক্র তাঁহার চরকা বুঝি ভণ্ড-হাতে শক্তি হারায়।
মহেশ্বর আজ সিন্ধুতীরে যোগাসনে মগ্ন ধ্যানে
অরবিন্দ চিত্ত তাঁহার ফুটবে কখন কে সে জানে!
সদ্য অসুর-গ্রাসচ্যুত ব্রহ্মা চিত্তরঞ্জনে হায়
কমণ্ডলুর শান্তি-বারি সিঞ্চি যেন চাঁদ নদীয়ায়।
শান্তি শুনে তিক্ত এ মন কাঁদছে আরো ক্ষিপ্ত রবে,
মরার দেশের মড়া-শান্তি, সেত আছেই, কাজ কি তবে ;
শান্তি কোথায় ? শান্তি কোথায় কেউ জানিনা
মাগো তোর ঐ দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্তি বিনা !
দেবতারা আজ জ্যোতিহারা ধ্রুব তাঁদের যায়না জানা,
কেউ বা দৈব-অন্ধ মাগো কেউ বা ভয়ে দিনে কানা।
সুরেন্দ্র আজ মন্ত্রণা দেন দানব রাজার অত্যাচারে,
দম্ভ তাঁহার দম্ভোলি ভীম বিকিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজারে।
রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে
সে কর শুধু পশল না মা অন্ধকারার বন্ধ ঘরে।

গগন-পথে রবি-রথের সাত সারথি হাঁকায় ঘোড়া,
মর্তে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া।
বারি-ইন্দ্র বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়,
বুড়ি-গঙ্গার পুলিন বুকে বাঁধছে ঘাঁটি দস্যু রাজায়।
পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বুরুশ করায় দানব-জুতো,
মুখে ভজে আল্লা হরি, পূজে কিন্তু ডাণ্ডা-গুঁতো।
দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে,
নাইক খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এসব বন্দী-গড়ে।
'লানত' গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলমবাজে
ধর্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, 'গলিজ' মুখে কোরান ভাঁজে
তাজ-হারা যার নাঙ্গা শিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি
ধর্ম-কথা বলছে তারাই পড়ছে তারাই কেতাব পুঁথি।
উৎপীড়কে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নমি,
হিজরে ভীরুর ধর্ম-কথার ভণ্ডামিতে আসছে বমি!
টিক্‌টিকির ঐ ল্যাজুর সম দিগ্বিদিকে উড়ছে টিকি,
দেবতার আগে পূজে দানব, তাদের কাছে সত্য শিখি!
পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগ্‌লি খেয়ে ভরায় উদর
টিকটিকি হয়, বিষ্ঠা কি নাই—ছি ছি এদের খাদ্য ক্ষুধার!
আজ দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম
লাথি খায় আর চ্যাঁচায় শুধু, 'দোহাই হুজুর মলাম মলাম'।
মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।
হান্‌ তরবার, আন্‌ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ রক্ত দে মা রক্ত দেখা!
লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তোর আয় মা রেখে কমল-বনে,
বুদ্ধি-বুড়ো সিদ্ধিদাতা গণেশ-টনেশ চাই না রণে।

ঘোমটা-পরা কলা-বৌ-এর গলা ধরে দাও করে দূর,
ঐ বুঝি দেব-সেনাপতি, ময়ুর-চড়া জামাই ঠাকুর ?
দূর করে দে, দূর করে দে এসব বালাই সর্বনাশী,
চাই নাক ঐ ভাং-খাওয়া শিব, নেক নিয়ে তাঁয় গঙ্গামাসী।
তুই একা আয় পাগলী বেটী তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে,
রক্ত-তৃষায় 'ময় ভুখা হুঁ'র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধরে
'ময় ভুখা হুঁ'র রক্ত ক্ষেপী ছিন্নমস্তা আয় মা কালী,
গুরুর বাগে শিখ সেনা তোর হুঙ্কারে ঐ 'জয় আকালী'।
এখনো তোর মাটির গড়া মৃন্ময়ী ঐ মূর্তি হেরি,
দু' চোখ পুরে জল আসে মা, আর কতকাল করবি দেরী ?
মহিষাসুর বধ করে তুই ভেবেছিলি রইবি সুখে,
পারিস্‌নি তা, ত্রেতাযুগে টলল আসন রামের দুখে।
আর এলিনে রুদ্রাণী তুই জানিনে কেউ ডাকল কিনা,
রাজপুতনায় বাজল হঠাৎ 'ময় ভুখা হুঁ'র রক্ত বীণা।
বৃথাই গেল সিরাজ টিপু মীর কাসিমের প্রাণ বলিদান,
চণ্ডি ! নিলি যোগমায়া-রূপ, বলল সবাই বিধির বিধান।
হঠাৎ কখন উঠল ক্ষেপে বিদ্রোহিনী ঝান্সি-রানী,
ক্ষ্যাপা মেয়ের অভিমানেও এলিনে তুই মা ভবানী।
এমনি করে ফাঁকি দিয়ে আর কতকাল নিবি পূজা ?
পাষাণ বাপের পাষাণ মেয়ে, আয় মা এবার দশভূজা।
বছর বছর এ অভিনয়-অপমান তোর, পূজা নয় এ,
কি দিস আশিস্‌ কোটি ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে।
অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা।
দুর্বলেরে বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি পূজা
দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভুজা।

সেই দিন জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজবে বোধন-বাজনা সেদিন গাইব নব জাগরণী।
'ময় ভুখা হুঁ মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাস হতে গিরি-রানীর মা-দুলালী কন্যা অয়ি!
আয় উমা আনন্দময়ী।

('ধূমকেতু', ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২)

১৯২২ সালের ৮ই নবেম্বর তারিখে পুলিশ যে-সময়ে "ধূমকেতু" আফিসে এসেছিল ঠিক সেই সময়ে অন্য একদল পুলিস ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বাড়ীতেও হানা দিয়েছিল। সেখান থেকে "ধূমকেতু"র মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফ্‌জালুল হক সাহেব গিরেফ্‌তার হন। যতটা মনে পড়ে তিনি তিন-চার দিন কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলের হাজতে ছিলেন। তাঁর ধরা পড়ার খবর পেয়ে তাঁর জেঠতুতো বড় ভাই, কৃষ্ণনগরের উকীল মুহম্মদ আজীজুল হক সাহেব * কলকাতায় চলে আসেন। সরকারী মহলে তাঁর পরিচয় ও প্রভাব ছিল। তিনি তদবীর ক'রে আফজাল সাহেবকে জেল হতে বা'র করে আনেন। আমরা ভেবেছিলেম তাঁকে বুঝি একেবারেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শেষে দেখা গেল পুলিস জামিন দিয়ে খানিকটা বুড়ি ছুঁইয়ে রেখেছে। নজরুল যদি দীর্ঘ দিন ধরা না পড়ত তবে আফজাল সাহেবকে ছেড়েই দেওয়া হতো। নজরুল নিজেই বিচারের ভুল করেছিল। সে জানত "ধূমকেতু"র বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হবেই, জেলেও তাকে যেতে হবে। তাই, তারই একসঙ্গে মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদক হওয়া উচিত ছিল। রাজনীতিক ব্যাপারে আফ্‌জাল সাহেব যে একান্ত নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন সেটা তাঁর বন্ধুরা জানতেন, নজরুলও জানত। তবু সখ করলেন বলেই আফ্‌জাল

* পরে খান বাহাদুর মুহম্মদ আজীজুল হক, বাঙলা দেশের শিক্ষামন্ত্রী, আরও পরে সার মুহম্মদ আজীজুল হক, ভাইসৃরয়ের একজেকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর, তারও পরে ব্রিটেনে ভারতের হাই কমিশনার।

সাহেবকে মুদ্রাকর ও প্রকাশক করে দেওয়া মোটেই সুবুদ্ধির কাজ হয়নি। গভীর রাজনীতি কখনও সখের কাজ হতে পারে না।

আমি আগে বলেছি, নজরুল সমস্তিপুরে গিয়েছিল। সেখান হতে সকন্যা গিরিবালা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে সে কুমিল্লা পৌঁছিয়ে দেবে এই ছিল তার ইচ্ছা। আত্মগোপন করার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। সমস্তিপুর হতে কুমিল্লা যাওয়ার পথে এক তরুণ বন্ধুর সাহায্যে সে বেলুড়ে এক জায়গায় দু'দিন ছিল। উদ্দেশ্য ছিল যে তার পুস্তকের প্রকাশক আর্য পাবলিশিং হাউসের নিকট হতে কিছু টাকা সংগ্রহ করে নেওয়া। আমি যতটা জানি ওই পাবলিশিং হাউসের শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহের নিকট হতে কিছু টাকা সে পেয়েও ছিল। নজরুল নিরাপদে কুমিল্লা পৌঁছেছিল। সেখানে গিয়ে সে "ধূমকেতু"র স্বত্ব শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর নামে লেখা-পড়া ক'রে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কুমিল্লাতেই ধরা পড়ল নজরুল।

১৯২২ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে কুমিল্লায় গিরেফতার হওয়ার পরে তাকে বিচারার্থে পুলিস পাহারায় কলকাতা আনা হয়।

কলকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার সুইন্‌হো'র ইজলাসে নজরুলের বিচার হয়েছিল। কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে সেই সময়ে সে বিশেষ শ্রেণীর বিচারাধীন বন্দীর ব্যবহার পেয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব তখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। রাজনীতিক মোকদ্দমায় কেউ তেমন আত্মপক্ষ সমর্থন করতেন না। নজরুলের মোকদ্দমাও প্রায় সেই ভাবেই চলেছিল। একজন তরুণ উকীল মাঝে মাঝে দু'চার কথা বলছিলেন মাত্র। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা হতে জানতে পারছি তাঁর নাম শ্রীমলিন মুখোপাধ্যায় ছিল। মোকদ্দমায় নজরুলের সাজা হতোই, তবুও জোর পক্ষ-সমর্থন ও জোর সওয়াল-জওয়াব করার মতো মোকদ্দমা ছিল এটা। কবিতাটির প্রত্যেক ছত্র হতে দুটি অর্থ বার হয়ে আসে। নজরুল একটি লিখিত বিবৃতি আদালতে দাখিল

করেছিল, "রাজবন্দীর জবানবন্দী" নামে সেই বিবৃতি নানান পুস্তকে ছাপা হয়েছে। তার এই বিবৃতি বাঙলা সাহিত্যের একটি সম্পদ।

বলেছি তো আফজালুল হক সাহেবকে পুলিস বুড়ি ছুঁইয়ে রেখেছিল। মোকদ্দমাটি ছিল রাজদ্রোহের। এতে আসামীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো অর্থহীন। ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় তার প্রয়োজন হয়। তবুও পুলিস আফজালুল হক সাহেবকে মোকদ্দমায় আসামী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল। রাজসাক্ষী (approver) হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করে দিল পুলিস। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি নজরুলের ভালো বা মন্দ কোনো কিছুই করতে পারেন নি, কেবল নিজের মুক্তি কিনে নিয়েছিলেন মাত্র।

আফ্‌জালুল হক সাহেব 'ধূমকেতু'র মুদ্রাকর ও প্রকাশক হয়ে মিছামিছি নিজেকে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু যে-ভাবে তিনি মোকদ্দমা হতে বা'র হয়ে গিয়েছিলেন সেটা মোটেই গৌরবের বিষয় ছিল না। তবুও, রাজনীতিক ব্যাপারে তিনি কত যে নিরীহ তা আমি জানতাম। জানতাম বলেই আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে"তে এসব কথার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করিনি। দেশের লোক ভুলেও গিয়েছিলেন এই কথা। আশ্চর্য এই যে, ঘটনার বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর পরে তিনি নিজেই আবদুল আজীজ আল্‌-আমান সাহেবকে দিয়ে তাঁর সেই পুরানো অগৌরবের কথা খুঁচিয়ে তুলেছেন।*

১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে চীফ্‌ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার সুইন্‌হো মোকদ্দমায় রায় শোনালেন। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪-এ ধারা অনুসারে কাজী নজরুল ইস্‌লাম এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলো। তার তরুণ উকীল তখনই দাঁড়িয়ে অনুরোধ করলেন যে কবি যেন জেলে বিশেষ শ্রেণীর

* "কবি বিদ্রোহী প্রসঙ্গে": আবদুল আজীজ আল-আমান। 'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

কয়েদীর ব্যবহার পান আদালত দয়া ক'রে সেই সুপারিশ করুন। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "তার কোনো প্রয়োজন নেই। রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত বন্দী মাত্রইতো জেলে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীর ব্যবহার পেয়ে থাকেন।" সত্যই তখন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই ছিল। এই বিশেষ শ্রেণীর ব্যবহারের নিয়ম বিরাট অসহযোগ আন্দোলনের চাপে চালু হয়েছিল। এখনকার মতো দণ্ডিত বন্দীরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে এবং বিচারাধীন বন্দীরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে* সেকালে বিভক্ত হতেন না। যতটা মনে পড়ে এই নিয়ম ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হয়েছে। তার আগে রাজনীতিক বন্দীরাই শুধু বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে ব্যবহার পেতেন। কলকাতার সার্কুলার রোডের ভিতরকার বিচারাধীন রাজনীতিক বন্দীদের প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হতো। জেলের ভিতরকার ব্যবস্থা অনুসারে সাজা হওয়ার পরের দিনই তাঁদের আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সে সময়ের জেলের অবস্থা না-জানা পাঠকদের জন্যে আমি এত কথা বললাম।

হুগলী জেলে নজরুলের অনশন ধর্মঘট

১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে (৮ই জানুয়ারী ভুল তারিখ) সাজা পাওয়ার পরে নজরুল ইস্‌লাম প্রেসিডেন্সী জেলে ফিরে গেল। জেলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অনুসারে পরের দিন (১৭ই জানুয়ারী) সকাল বেলা তাকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে সে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীর ব্যবহার পেতে লাগল। বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদের বাড়ীর পোশাকের মতো পোশাক পরতে দেওয়া হতো। খাওয়া-দাওয়া উন্নত তো ছিলই। এভাবে নজরুলের ক'মাস আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে কাটল। দেশে আন্দোলন তখন ছিল না। তাই, বাঙলার প্রাদেশিক সরকারকে দুষ্ট বুদ্ধিতে পেয়ে বসল।

* বিচারাধীন দ্বিতীয় শ্রেণীর ও দণ্ডিত তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরা জেলে একই ব্যবহার পান। কেবল সাজা না হলে জাঙ্গিয়া-কুর্তা পরতে হয় না।

তারা ঠিক করল রাজনীতিক বন্দীদের দু'ভাগে ভাগ ক'রে হুগলী ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে ও বহরমপুর ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে রাখা হবে। তাঁদের বেশীর ভাগকেই সাধারণ কয়েদীর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়ে হুগলী ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে রাখা হবে, আর খুব অল্প সংখ্যককে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীরূপে রাখা হবে বহরমপুর ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে। হুগলী ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে যাঁদের পাঠানো হলো তাঁদেরও বলা হলো যে তাঁরা বহরমপুর ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে যাচ্ছেন। তাঁদের পোশাকও বদলানো হলোনা, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের 'হিস্টরিশীটে' লিখে দেওয়া হলো যে এই কয়েদীকে সাধারণ কয়েদীর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হলো। বন্দীদের নিকট কিন্তু কথাটা গোপন রাখা হলো এবং পুলিস গার্ডকেও বলে দেওয়া হলো যে নৈহাটি স্টেশনের আগে যেন তাঁরাও কোনো কথা বন্দীদের না জানান। বলা বাহুল্য, নজরুল ইস্‌লামকেও সাধারণ কয়েদীর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তাকেও ট্রেন হতে নামিয়ে ব্যাণ্ডেলের ট্রেনে চড়িয়ে হুগলীঘাট স্টেশনে নিয়ে ট্রেন হতে নামিয়ে নেওয়া হলো। হুগলীঘাট রেলওয়ে স্টেশন খুব উঁচু ব্রীজের (পুলের) ওপরে অবস্থিত। তার তলায় পাশের দিকে হুগলী ডিস্‌ট্রিক্ট জেল। হুগলীঘাট স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়ালে জেলের সেই উঁচু দেওয়ালের ওপর দিয়েও জেলের ভিতরকার অনেকখানি দেখতে পাওয়া যেত। জেলের ভিতরে জিনিস-পত্র ছুঁড়েও ফেলা যেত হুগলীঘাট স্টেশন থেকে। নজরুলদের হুগলী জেলে নিয়ে গিয়ে সাধারণ কয়েদী ক'রে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু রেলওয়ে স্টেশনের উঁচু প্লাটফর্মের কল্যাণে তাঁদের সহজেই বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। নজরুল হুগলী জেলে গিয়েছে জানতে পেয়েই বাইরের রাজনীতিক চেতনাসম্পন্ন যুবকেরা ছুটে এলেন। নজরুলদের সঙ্গে রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে এই যে বাইরের বন্ধুরা যোগাযোগ করছিলেন তা কর্তৃপক্ষ টেরে পেয়ে গিয়েছিলেন। তার পরে দেওয়ালের উপরে টিন লাগিয়ে দিয়ে সেই

জায়গাটা এত উঁচু করে দেওয়া হয়েছিল যে রেলওয়ে প্লাটফর্ম থেকে জেলের ভিতরের কোনো কিছু দেখতে পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

হুগলী জেলে নজরুলদের সাধারণ কয়েদীর পোশাক, অর্থাৎ জাঙ্গিয়া ও খাটো কুর্তা ইত্যাদি পরিয়ে দেওয়া হলো আর লোহার থালায় সাধারণ কয়েদীর খাওয়া দেওয়া হতে লাগল। তাঁদের এই যে সাধারণ কয়েদীর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হলো তারই প্রতিবাদে নজরুল তার রাজনীতিক সহবন্দীদের সঙ্গে নিয়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করে দিল। তার এই অনশনের খবর নিয়ে কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের বাড়ীর ঠিকানায় আবত্নল হালীমের নামে তারই হাতের লেখা একখানা পত্র এলো। পত্রখানা অবশ্য জেলের আফিস হতে ডাকে দেওয়া হয় নি, জেলের ভিতরের লেখা হলেও জেলের বাইরে থেকে তা ডাকে ফেলা হয়েছিল। চিঠি পেয়েই আবত্নল হালীম হুগলী চলে গেল। বাইরে থেকে যে-বন্ধুরা নজরুলকে সাহায্য করছিলেন তাঁদের সঙ্গে তো সে দেখা করলই তাঁদের মারফতে নজরুলের সঙ্গেও সে যোগাযোগ করল। নজরুলের কিছু উপদেশ নিয়ে সে কলকাতায় ফিরে এলো এবং সংবাদপত্রে কিছু প্রচারের ব্যবস্থাও করল। এটা ১৯২৩ সালের মে মাস ছিল। আমার ওপরে পুলিসের তখন খুব কড়া নজর। এই নজর এড়িয়ে আমি যে একবার হুগলী যাব সে উপায় ছিলনা।

নজরুল ইস্‌লামের অনশন চলছিল, ধরতে গেলে তার প্রথম পর্যায়েই আমিও গিরেফ্‌তার হয়ে গেলাম। পুলিসের কড়া নজরের ভিতরে থেকে আমি পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন তো হয়েই গিয়েছিলাম, ধরা পড়ে বাইরের জগৎ আমার নিকট হতে আঁধার হয়ে গেল। নজরুলদের অনশন ভাঙাবার চেষ্টা অনেকেই করতে লাগলেন, কিন্তু যে জন্যে তাঁরা অনশন করেছিলেন তা নিয়ে গবর্নমেণ্টের সঙ্গে কেউ কোনো যোগাযোগ করেছিলেন কিনা সে-খবর আমি কখনও পাইনি। যতটা আমার মনে পড়ে, আমার ধরা

পড়ার আগেই নজরুলের গর্ভধারিণী মা হুগলী এসেছিলেন। মা'র সঙ্গে নজরুলের কি একটা প্রচণ্ড মান-অভিমানের ব্যাপার ঘটেছিল। পলটন হতে ফিরে এসে সে একবার মাত্র চুরুলিয়ায় গিয়ে আর কখনও যায় নি। হয় তো সেই জন্যেই, কিংবা দেখা করলে অনশন ভাঙাবার জন্যে কান্নাকাটিই তিনি শুধু করবেন, এই জন্যও হতে পারে, মা'র সঙ্গে নজরুল দেখা করে নি। জেলখানায় বন্দীরা কিছু দাবী-দাওয়া আদায় করার জন্যেই অনশন করে থাকে। এই অবস্থায় আত্মীয়রা ও বন্ধুরা যদি সেই দাবীগুলিকে নিজেদের দাবীতে পরিণত না ক'রে অনশনকারীদের কেবল "খাও, খাও," বলতে থাকেন তা হলে কাজ কিছু হয় না, অনশনকারীরা দুর্বল হন মাত্র। অনশন যখন দীর্ঘদিন হয়ে গেছে, তখন রবীন্দ্রনাথ শিলং হতে নজরুলকে এই বলে টেলিগ্রাফ করলেন যে, "অনশন ত্যাগ কর। আমাদের সাহিত্য তোমায় দাবী করে (give up hunger strike, our literature claims you)।" দুর্ভাগ্য যে টেলিগ্রামটি তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলের ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন। সেই জেলের কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেই, আইনে মানাও ছিলনা, টেলিগ্রামটি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। তাঁরা টেলিগ্রাম পিওনকে ব'লে দিলেন যে প্রাপক তাঁদের জেলে নেই। তাই টেলিগ্রামের খামের ওপরে ওই কথা লিখেই পিওন টেলিগ্রামটি ফেরৎ দিল। রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রামটি হাতে পেলে নজরুল অনশন ত্যাগ করত বলেই আমার বিশ্বাস। অনশনের ৩৯ দিন যখন কেটে গেল তখন কুমিল্লা হতে শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী এসে নজরুলের অনশন ভাঙালেন। ভারতের - ব্রিটিশ সরকারের প্রেস্টিজ—আত্মসম্মান বেঁচে গেল। এর পরে বঙ্গীয় সরকারের দফ্‌তর হতে পত্র এলো যে সরকার বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে জানতে পেয়েছেন যে কাজী নজরুল ইস্‌লামের কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই। তবে তিনি একজন কবি ও গ্রন্থকার হওয়ার কারণে সরকার তার ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা ক'রে তাঁকে

বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীর তালিকাভুক্ত করলেন। এই খবরটি জেল দফ্তর হতে পরে আমার জানার সুযোগ ঘটেছিল।

আবার বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হয়ে নজরুল বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে বদলী হলো।

আমি ১৮১৮ সালের বেঙ্গল স্টেট প্রিজনার্স এক্ট (১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন) অনুসারে আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেলে স্টেট প্রিজনার ছিলাম। উঁচু দেওয়াল ঘেরা একটি বাড়ীতে আমি একা থাকতাম। এই বাড়ীটিতে আগে মেয়ে কয়েদীরা থাকত। অন্য দু'টি সেলুলার বাড়ীতে আন্দামান ফেরৎ ১৬ জন দীর্ঘ মেয়াদী রাজনীতিক বন্দীরা ছিলেন। তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন। আমি স্টেট প্রিজনার হওয়ার কারণে আমার জন্যে একটা বিশেষ রান্নাঘর করে দিয়ে আমার খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করতে চেয়েছিলেন। জেলের কোনো অভিজ্ঞতাই আগে আমার ছিলনা। তবুও একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছিল যে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা যদি বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদের সঙ্গে হয় তা হলে জেলের ভিতরে অন্তত কিছু লোকের সঙ্গে আমার সংযোগ থাকবে। যদিও ২৪ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার লজ্ (পরে আসামের চীফ্ জস্টিস্) আমায় বারে বারে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে ওঁদের ওখানকার খাওয়ায় আমার কি করে চলবে এবং বারে বারেই আমি উত্তর দিচ্ছিলাম যে আমার কোনো রকমে চলে যাবে। এই রকমই ছিল অবস্থা। বোধ হয় জুলাই মাসের শেষ ভাগে হবে, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত কোনো কাজের উপলক্ষে কয়েকদিনের জন্যে বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল হতে আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেলে এলেন। তিনি নজরুলের নিকট হতে আমার জন্যে গোপনে একখানা পত্র নিয়ে এসেছিলেন। একজন কয়েদী ওভারসীয়ার ওঁদের ওখান থেকে আমার খাওয়ার নিয়ে আসত। সেদিন সকালেও ট্রেতে আমার চা এসেছে। সেই কয়েদী ওভারসীয়ারটি আমায় বলল যে

টি-পটের তলাটা একবার দেখে নিবেন। টি-পট্‌টা তুলতেই দেখতে পেলাম যে একখানা পত্র চাপা আছে,—নজরুলের পত্র। লিখেছে, আমার কথা সে সব শুনেছে। আমি বহরমপুর বদলী হতে পারি না? তার পরে লিখেছে তার সময় ভালোই কাটছে। শ্রীপূর্ণ দাস (মাদারীপুরের) একখানা নাটক লিখে দেওয়ার জন্যে তাকে অনুরোধ করেছেন। তাই লিখছে সে তখন। শ্রীপূর্ণ দাস বাইরে গিয়ে একটি চারণ দল গঠন করবেন। সেই চারণ দলের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন নাটকখানার। নজরুলের এই নাটক লিখিত হয়েছিল, তার পাণ্ডুলিপি জেল হতে বাইরে নিরাপদে পৌঁছেও গিয়েছিল, কিন্তু তার পরে নাকি পাণ্ডুলিপিখানা হারিয়ে যায়। নজরুল ইস্‌লামের একটা সৃষ্টি এইভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কেউ কেউ লিখেছেন, এক বছর সাজা পুরো হওয়ার আগেই কাজী নজরুল ইস্‌লাম জেল হতে মুক্তি পেয়েছিল। জেলখানার কায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নন বলেই তাঁদের মনে এই ধারণা হয়ে থাকবে। প্রিজন এক্টের কায়দা অনুসারে দণ্ডিত বন্দীরা প্রতি মাসে চারদিন হিসাবে এখন রিমিশন পান। কিন্তু নজরুলের যখন সাজা হয়েছিল তখন প্রতিমাসে তাঁরা তিন দিন হিসাবে রিমিশন পেতেন। সাজা হওয়ার মাসে ও মুক্তি পাওয়ার মাসে কয়েদীরা কেনো রিমিশন পান না। কাজেই, দশ মাসে নজরুল নিশ্চয় ত্রিশ দিনের রিমিশন পেয়েছিল। তবে, ছাড়া পাওয়ার আগে প্রিজন এক্ট ভাঙার অপরাধে নজরুলের নামে আদালতে একটি মোকদ্দমা হয়েছিল। ১৯২৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের "অমৃতবাজার পত্রিকা" হতে জানতে পারা যায় যে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নজরুল ইস্‌লামকে বহরমপুরের সব-ডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীএন. কে. সেনের আদালতে হাজির করা হয়েছিল। শহরের বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলমান উকীলেরা বাবু ব্রজভূষণ গুপ্তের নেতৃত্বে কবির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিসের অনুরোধে ম্যাজিস্ট্রেট ১৪ই ডিসেম্বর (১৯২৩) তারিখে মোকদ্দমার

দিন ফেলেন। "অমৃতবাজার পত্রিকা'র রিপোর্ট হতে এও জানা যায় যে নূতন করে সাজা না পেলে কবি ১৫ই ডিসেম্বর (১৯২৩) তারিখে বহরমপুর (মুরশিদাবাদ) ডিস্ট্রিক্ট জেল হতে মুক্তি পাবেন। দশ মাসে ত্রিশ দিন রিমিশন পেলে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখেই নজরুলের মুক্তি পাওয়ার কথা। আমি নিজে ওই তারিখে ঢাকা সেন্‌ট্রাল জেলে রাজবন্দী ছিলেম। বাইরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আমার ছিল না। তবে, আমার মনে হয় প্রিজন এক্টের মোকদ্দমা শেষ পর্যন্ত গবর্নমেণ্ট চালায় নি এবং নজরুল ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে জেল হতে মুক্তি পেয়েছিল। আর, ১৫ই ডিসেম্বর (১৯২৩) তারিখে যদি সে মুক্তি পেয়ে থাকে তবে সে ঠিক সময়েই মুক্তি পেয়েছিল, দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়ার আগে মুক্তি পায় নি। ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের ১৫ই অক্টোবর (১৯২৩) তারিখে নজরুলের মুক্তি পাওয়ার তথ্য সম্পূর্ণরূপে ভুল।

কোনো কোনো লেখা হতে অনেকের মনে এই ধারণা জন্মানো সম্ভব যে নজরুল যখন হুগলী জেলে ছিল রবীন্দ্রনাথ তখনই তাঁর 'বসন্ত' নামক নাটক তাকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই রকম ধারণা ভুল ধারণা হবে। এই উৎসর্গের সময় সে আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেলে ছিল। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় যে বসন্তোৎসব করেছিলেন তাতেই এই নাটকখানি অভিনীত হয়েছিল।

লেখার স্বত্ব বিক্রয় ও প্রথম পুস্তক প্রকাশ

লেখার স্বত্ব বিক্রয় কাজী নজরুল ইস্‌লামের জীবনে একটি বেদনাদায়ক ব্যাপার। যে-কোনো লেখকের পক্ষেই এই ব্যাপারটি বেদনাদায়ক, তবে নজরুলের জীবনে শেষ পর্যন্ত এটা অভিশাপের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। একবার যে এই কাজটা শুরু হলো তা আর থামল না কোনো দিন। এখনও আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই যে প্রথম কেন সে এই পথে পা বাড়াল? ব্যাপারটি যেন কি রকম একটা হাসি-তামাসার ভিতর দিয়ে ঘটে গেল। প্রথম স্বত্ব বিক্রয় করার সময়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে এতটুকুও ভাবল না। যে-লেখা-গুলিকে পসরা করে সে প্রথম স্বত্ব বিক্রয়ের বাজারে হাজির হয়েছিল সেগুলিই 'ব্যথার দান' নাম নিয়ে পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ৩ নম্বর কলেজ স্কোয়ার স্থিত মোসলেম পাব্‌লিশিং হাউসের অন্যতর মালিক আফ্‌জালুল হক সাহেব নজরুলের লেখার স্বত্বের প্রথম খরিদ্দার। আফ্‌জাল সাহেব অনেক আগে হতে আমাদের পরিচিত ও বন্ধু। নজরুল ফৌজ হতে ফিরে আসার পরে তারও তিনি বন্ধু। তিনিই প্রথম কিনলেন নজরুলের লেখার স্বত্ব এবং নগদ মূল্য দিলেন একশ' টাকা। ঘটনা ঘটার তেতাল্লিশ বছর পরে এখন তিনি বলছেন যে এক শ' নয়, তিনি দু' শ' টাকা দিয়েছিলেন। "ব্যথার দানে"র স্বত্ব কেনার পক্ষে দু' শ' টাকাই কি খুব বেশী টাকা?

আমার যতটা মনে পড়ে নজরুল আর আফ্‌জাল সাহেবের মধ্যে এই বেচা-কেনাটা হয়েছিল ১৯২১ সালে, জুলাই মাসে নজরুল যে আমার সঙ্গে কুমিল্লা হতে ফিরে এসেছিল তার পরে। আবদুল আজীজ আল্‌-আমানের মারফতে আফ্‌জাল সাহেব যে-হিসাব হালে দাখিল করেছেন * তাতে এই দাঁড়ায় যে বেচা-কেনাটা ১৯২০ সালে হয়েছিল। তিনি বলেছেন—" 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'অতৃপ্ত কামনা' প্রভৃতি গল্পগুলি ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হতেই কবি ঐ লেখাগুলির পাণ্ডুলিপি নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশকের নিকট কয়েকদিন ধরে যাতায়াত করেন। টাকার বিশেষ প্রয়োজন অথচ 'ব্যথার দান' প্রকাশে কেউ সম্মত নন। নজরুলের মুখে এই বিবরণ শুনে আফ্‌জাল সাহেব 'ব্যথার দান' ছাপতে রাজী হলেন।" সঙ্গে সঙ্গেই কবি দু' শ' টাকার বিনিময়ে 'কপি রাইট' লিখে দিলেন। এই দু' শ' টাকার কথা কে প্রথম বলেছিলেন তার কোনো উল্লেখ নেই। আমি নজরুল সম্বন্ধে আমার 'স্মৃতিকথা' লিখছি। নজরুল আর আফ্‌জাল সাহেবের মধ্যে বেচা-কেনার সময়ে আমি সশরীরে উপস্থিত ছিলেম। আমি এই সাক্ষ্য দেব যে নজরুলের এই গল্পগুলি নিয়ে প্রকাশকদের বাড়ীতে ঘোরাঘুরির কথা ঠিক নয়। কপি রাইট আফ্‌জাল সাহেবই চেয়েছিলেন আর নজরুল তাতে সম্মত হয়েছিল। আফ্‌জাল সাহেব নগদ এক শ' টাকা নজরুলকে দিয়েছিলেন। আমার সামনে কোনো লেখা-পড়া হয়নি। পরেও যে লেখা-পড়া হয়েছে সে বিশ্বাস আমার নেই। তবে, আফ্‌জাল সাহেব যদি নজরুলের হাতের লেখায় দু' শ' টাকার দলীল হাজির করেন আমি তা মেনে নেব এবং স্বীকার করব যে আমার ঘাট হয়েছে। গল্পগুলির স্বত্ব যে আফ্‌জাল সাহেবকে দিয়ে দেওয়া হলো তা আমার ভালো লাগেনি। আফ্‌জাল সাহেব সামান্য 'রয়ালিটি'

* কবি বিদ্রোহী প্রসঙ্গে, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১।

দিয়েও বইখানা প্রকাশ করতে পারতেন। তাঁর পাবলিশিং হাউস ছিল। তাই যদি তিনি করতেন তাঁর পক্ষে সেটাই হতো প্রকৃত বন্ধুর কাজ এবং শোভন কাজও। বন্ধু হিসাবে কোনো টাকা না নিয়ে নজরুল যদি 'কপি রাইট' আফ্‌জাল সাহেবকে অমনি দিয়ে দিত সেটা বরঞ্চ দেখতে অনেক ভালো হতো। সে যে তার সৃষ্টির মূল্য হিসাবে হাত পেতে এক শ'টি টাকা মাত্র নিয়েছিল সেটা আমার নিকটে বিশ্রী লেগেছিল।

তারপরে ওই প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, 'ব্যথার দানে'র পাণ্ডুলিপি প্রেসে কম্পোজ হওয়ার পরে দেখা গেল যে পাইকা টাইপে মাত্র ষাট পৃষ্ঠা হয়েছে। এত ছোট গল্পের বই বা'র করা যায় না। তাই কবি 'বাদল বরিষণে' লিখে দিল। তারপরে ২৮ পৃষ্ঠার গল্প 'রাজবন্দী'র চিঠি' কখন লিখে দেওয়া হলো তা বলা হয়নি। পুস্তকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'অতৃপ্ত কামনা' ও 'ঘুমের ঘোরে' একত্র ক'রে ৯৭ পৃষ্ঠা হয়েছিল, ৬০ পৃষ্ঠা নয়। 'বাদল বরিষণে' মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার গল্প আর "তিনি (নজরুল) 'রাজবন্দীর চিঠি' এর পরে রচনা করেছিলেন" হচ্ছে ২৮ পৃষ্ঠার একটি গল্প। সব নিয়ে এখন দেখতে পাচ্ছি "ব্যথার দান" ১৫০ পৃষ্ঠার পুস্তক। আবতুল আজীজ সাহেব যা লিখেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে কবি পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের বাড়ীতে ঘোরাঘুরি করেছিল ১৩২৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের অনেক আগে। শ্রাবণ মাসের আগে 'ব্যথার দানে'র ৬০ পৃষ্ঠা কম্পোজ হয়ে গিয়েছিল যদিও তা কোনো হিসাবে মিলছে না। একেবারে চটি বই হয়ে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে নজরুল 'বাদল বরিষণে' ১৬ পৃষ্ঠার গল্প লিখে দিয়েছিল। এবং এই 'বাদল বরিষণে' আবার ছাপা হয়েছিল ১৩২৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'মোসলেম ভারতে'। 'অতৃপ্ত কামনা'ও প্রথম ছাপা হয়েছিল ওই শ্রাবণ মাসেরই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়। তার পাণ্ডুলিপি নিয়েও কবির প্রকাশকদের

বাড়ীতে ঘোরাঘুরি করা সম্ভব ছিল না। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস হচ্ছে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাস।

'ব্যথার দান' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। যে-পুস্তক ১৯২০ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে কম্পোজ হয়ে গিয়েছিল সে পুস্তক ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? কাজেই, আমি যা বলছি সেই কথাই ঠিক। আফ্‌জালুল হক সাহেব 'ব্যথার দানে'র স্বত্ব কিনেছিলেন ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে, তার আগে নয়। যে-কয়টি গল্প প্রথম বেচা-কেনার অন্তর্ভুক্ত ছিল তার ওপরে তিনি পরে একটি কিংবা দু'টি গল্প ফাউ নিয়েছিলেন। আবদুল আজীজ সাহেবকে দিয়ে তিনি যা লিখিয়েছেন তা থেকেও এই অনুমান করা যায়।

এই তো গেল প্রথম দফায় স্বত্ব বিক্রয়ের কথা। দ্বিতীয় দফায় নজরুল তার লেখার স্বত্ব বিক্রয় করেছিল ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে। আমরা তখনও এক সঙ্গেই থাকি। অবশ্য, 'ব্যথার দানে'র বেচাকেনার সময়েও এক সঙ্গেই থাকতাম। দ্বিতীয় বারের বেচাকেনাটা নজরুল আমায় না জানিয়ে করেছিল। এবারে সে বিক্রয় করেছিল 'রিক্তের বেদন' ও অন্য দু'টি পুস্তকের স্বত্ব মাত্র চার শ' টাকায়। দ্বিতীয় দফায় ক্রেতা ছিল ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড। এই কোম্পানী বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সম্পাদক মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব প্রভৃতির উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল। পরে এই কোম্পানী যখন উঠে গিয়েছিল তখন নজরুলের বইগুলি ভিন্ন হাতে চলে যায়।

ওপরে লেখা দুই দফায় নজরুল যে তার লেখাগুলির স্বত্ব বিক্রয় করেছিল সেই দু'টি বেচাকেনা হতে পাওয়া টাকা সে কিন্তু নিজের ভরণ-পোষণের জন্যে খরচ করে নি। আজ শুনে অনেকেই আশ্চর্য হবেন যে এই টাকাগুলি সে বন্ধুকৃত্য পালনে ব্যয় করেছিল।

এইবারে আমি নজরুল ইস্‌লামের প্রথম পুস্তক প্রকাশের কথা

বলি। পুস্তক প্রকাশের সঠিক তারিখ বা সময় গবর্নমেণ্টের কাগজ-পত্র হতে পাওয়া যায়। তখনকার দিনে আইন ছিল যে কোনো পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ার ত্রিশ দিনের ভিতর প্রেসের মালিককে সেই পুস্তক সরকারী দফ্‌তরে পাঠাতে হতো। প্রেসের মালিকের পক্ষে এটা ছিল বাধ্যতামূলক। কাজেই, পুস্তক ছাপা হওয়ার পরে দফ্‌তরীর বাড়ী হতে বাঁধাই হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসের মালিক তার কপি সরকারের দফ্‌তরে পাঠিয়ে দিতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো প্রেসের মালিক ত্রিশ দিন অপেক্ষা করে থাকতেন না। কারণ, ত্রিশ দিনের ভিতরে পুস্তক সরকারী দফ্‌তরে না পাঠালে প্রেসের মালিকের বিরুদ্ধে মকোদ্দমা হতো। এই জন্যে তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে রাখতেন। এই রকম কড়াকড়ি ব্যবস্থা ছিল বলেই আমরা আগেকার দিনের পুস্তক প্রকাশের সময়টা পেয়ে যাই।

আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে"তে ঠিকই লিখেছিলাম যে ১৯২২ সালের আগে কাজী নজরুল ইস্‌লামের কোনো পুস্তক প্রকাশিত হয় নি। অসাবধানতা বশত আমি "ব্যথার দানে"র নামোল্লেখ করি নি। এই "ব্যথার দান"ই নজরুলের প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তক।

নজরুলের প্রথম পুস্তক প্রকাশ

প্রকাশিত হওয়ার পরে তা সরকারী দফ্‌তরে প্রথম রেজিস্টারভুক্ত হয়েছিল ১৯২২ সালের ১লা মার্চ তারিখে। কাজেই, পুস্তকখানা ফেব্রুয়ারী মাসেই প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার মেট্‌কাফ প্রেসে প্রথম বারে এই পুস্তকের ১১০০ কপি ছাপা হয়েছিল। দাম ধার্য করা হয়েছিল দেড় টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৪৭। এটা মনে রাখার বিষয় যে নজরুল ইস্‌লাম তার জীবনে প্রথম গ্রন্থকার হয়েছিল এমন একখানা পুস্তকের যে-পুস্তকে তার কোন স্বত্ব ছিল না।

নজরুলের 'অগ্নি-বীণা' ও 'যুগবাণী' এক সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'অগ্নি-বীণা' প্রকাশিত হওয়ার পরে সরকারী দফ্‌তরে

পৌঁছেছিল ১৯২২ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে। প্রথম বারেই ২২০০ কপি ছাপা হয়েছিল কলকাতার মেট্‌কাফ প্রেসে। দাম রাখা হয়েছিল এক টাকা মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২+৬৬।

. প্রথম মুদ্রণে "যুগবাণী" ৯২ পৃষ্ঠার পুস্তক ছিল। তার দাম রাখা হয়েছিল একটাকা মাত্র। পুস্তকখানা প্রথমবারে কত কপি ছাপা হয়েছিল তা দুর্ভাগ্য বশত লিখে আনা হয় নি।

এখানে এই দু'খানা পুস্তকের প্রকাশন সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া আবশ্যক। 'সেবকে'র কাজ নিয়ে নজরুল যখন কুমিল্লা হতে ফিরে এসেছিল তখন খুব সম্ভবত ওল্ড ক্লাবে শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহের সঙ্গে তার দেখা হয়। শ্রীগুহের সঙ্গে আগে হতে নজরুলের পরিচয় ছিল, না, ওল্ড ক্লাবেই প্রথম তাঁদের পরিচয় হয়েছিল সেকথা আমি বলতে পারব না। ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও বৌবাজার স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে দোতালায় ওল্ড ক্লাবের আফিস ছিল। তারই নিকটে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে কোনো এক বাড়ীতে ছিল শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের "আর্য পাবলিশিং হাউস"। শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ ছিলেন এই পাবলিশিং হাউসের পরিচালক। শুনেছি আগে তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্রবে ডেটেনিউ ছিলেন, তবে কোন্ দলের লোক তিনি ছিলেন তা আমার জানা নেই। ১৯২২ সালে তিনি নিশ্চয় শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ছিলেন। তা না হ'লে তাঁর পাবলিশিং হাউসের পরিচালক তিনি হতে যাবেন কেন? পরে প্রতিষ্ঠিত বর্মন পাবলিশিং হাউসের মালিক, তখন সতেরো-আঠারো বছরের যুবক, শ্রীব্রজবিহারী বর্মন আর্য পাবলিশিং হাউসে চাকরী করতেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহই প্রস্তাব করলেন যে আর্য পাবলিশিং হাউস হতে তিনি নজরুলের লেখা ছাপাতে চান। নজরুল তাতে রাজী হলো এবং প্রথমে 'নবযুগে' প্রকাশিত লেখাগুলি 'যুগবাণী' নাম দিয়ে সে শরৎ বাবুকে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই এই লেখাগুলি প্রেসে চলে গিয়েছিল। 'অগ্নি-বীণা' প্রকাশের ভারও আর্য পাবলিশিং হাউসকেই দেওয়া হয়েছিল,

কিন্তু বেশ কিছু দিন পরে। 'ধূমকেতু' বা'র করার অনেক আগে নজরুল 'যুগবাণী'র পাণ্ডুলিপি শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহকে দিয়েছিল। আর, 'অগ্নি-বীণা'তে 'ধূমকেতু'তেই প্রথম মুদ্রিত কবিতাও আছে। এখন সরকারী রেকর্ডে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে 'অগ্নি-বীণা' ও 'যুগবাণী' এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল, বরঞ্চ 'যুগবাণী' সরকারী দফ্‌তরে পৌঁছেছিল 'অগ্নি-বীণা'র একদিন পরে। প্রকাশকদের এই বিলম্ব হয়তো ইচ্ছাকৃত। তাঁরা হয়তো 'অগ্নি-বীণা'কেই প্রথম বাজারে বা'র করতে চেয়েছিলেন। 'যুগবাণী'ই যে প্রথম প্রেসে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। 'অগ্নি-বীণা' ও 'যুগবাণী'র প্রথম প্রকাশক আর্য পাবলিশিং হাউস হলেও প্রথম মুদ্রণের সময়ে তাঁরা প্রকাশক হিসাবে নিজেদের নাম ছাপান নি। মামলা-মোকদ্দমা হয়ে যেতে পারে এই ভয় তাঁদের মনে ছিল। কাজেই, প্রথম বারে কলকাতা, ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেন হতে কাজী নজরুল ইস্‌লাম নিজেই বাহ্যত পুস্তক দু'খানার প্রকাশকও হয়েছিল। যতটা মনে পড়ে ইতোমধ্যে আর্য পাবলিশিং হাউসের দোকান ওয়েলিংটন স্ট্রীট হতে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতালায় উঠে গিয়েছিল। 'অগ্নি-বীণা'র প্রথম মুদ্রণের সময়ে মহান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মলাটের জন্যে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন।

'অগ্নি-বীণা' প্রথম বা'র হওয়ার পরে এক বছর পুরো হওয়ার আগেই তার দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়েছিল। দ্বিতীয় মুদ্রণে লেখা আছে—

প্রথম সংস্করণ—কাতিক ১৩২৯—দু' হাজার

দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৩০—দু' হাজার

দাম পাঁচ সিকা

শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ বি এ কর্তৃক প্রকাশিত

আর্য পাবলিশিং হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট্ (দোতালায়) কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস, ২২, সুকিয়া স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত

এই দ্বিতীয় মুদ্রণ যখন হয়েছিল কাজী নজরুল ইস্‌লাম তখনও জেলে। তবে, তার ছাড়া পাওয়ার তারিখ ঘনিয়ে আসছিল। এখানে প্রথম সংস্করণ দু' হাজার ছাপা হওয়ার কথা লেখা আছে। কিন্তু গবর্নমেণ্টের দফ্‌তরে রেজিস্টারভুক্ত হওয়ার সময়ে প্রথম মুদ্রণ সংখ্যা দেওয়া হয়েছে দু' হাজার দু'শ। ভুল তথ্য সরবরাহ করা প্রেসের পক্ষে ভয়ের কারণ ছিল। প্রকাশকরা সাধারণত এক হাজার বই ছাপানোর কথা হলে এগারো শ' ছাপেন, আর দু' হাজার ছাপানোর কথা হলে ছাপেন দু' হাজার দু'শ'। তাঁদের কিছু কিছু বই উপহার দিতে হয়।

নজরুলের দু'খানা কবিতার বই—'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান'—বঙ্গীয় সরকারের দ্বারা বাজেয়াফ্‌ৎ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সব ছাপানো পুস্তক তো এক সঙ্গে বাঁধানো হয় না, অন্তত আগেকার দিনে হতোনা। ছাপানো ফর্মাগুলি কোনো দফতরীর গুদামে ক'টন কাগজের তলায় চাপা পড়ে থাকত তা জানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ছাপানো ফর্মাগুলি এইভাবে থেকে যাওয়ায় নজরুলের অনেক উপকার হয়েছিল। ১৯২৩ সালের মে মাসে আমি যে গিরেফ্‌তার হয়েছিলেম তার পরে বর্তমান উত্তর প্রদেশের নানান জেল ঘু'রে এবং স্বাস্থ্যের কারণে ক'মাস আলমোড়ায় বাস করার পরে আমি কলকাতায় ফিরেছিলেম ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসের ২রা তারিখে। এসে জানতে পেলাম যে নজরুলের নিষিদ্ধ পুস্তক দু'খানা সংগ্রহের জন্যে অনেকের, বিশেষ করে যুবকদের আগ্রহের অন্ত নেই। আমি তো কত যুবককে এই পুস্তক দু'খানার জন্যে আবদুল হালীমের নিকটে আসতে দেখেছি। নিষিদ্ধ জিনিসের জন্যে মানুষের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ হয়। আবদুল হালীম জানত কোন্ দফ্‌তরীর নিকটে নিষিদ্ধ পুস্তক দু'খানার ফর্মাগুলি আছে। আরও অনেক যুবক নিষিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়ের ব্যাপারে নজরুলকে সাহায্য করেছেন। হুগলীর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে

একজন। দুর্দিনে এই পুস্তক দু'খানা হতে নজরুলের পরিবারের অনেক সাহায্য হয়েছে।

পুস্তক বিক্রয়ের আয় হতেই নজরুল ইস্‌লামের পরিবারের ভরণ-পোষণ হতো। তার নিজের টাকা ছিল না যে সে নিজেই পুস্তকগুলি প্রকাশ করবে। প্রকাশকরা ঠিক মতো টাকা না দিলে এই পরিবার উপোস করার অবস্থায় পৌঁছে যেত। শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের সহিত আমার এই বিষয়ে আলাপ হওয়ার পরে জানতে পেলাম যে তিনি নজরুলের পুস্তক প্রকাশের একটা ব্যবস্থা ডি. এম. লাইব্রেরীর সঙ্গে করেছেন। মনে পড়ে আমার প্রথম গিরেফ্‌তার হওয়ার আগে আমি যেন দে-মজুমদারের ছোট্ট পুস্তকের বিজ্ঞাপন 'বিজলী'তে পড়েছি। সেই দে-মজুমদারই ডি. এম. লাইব্রেরী হয়েছে জানতে পেলাম। দে বোধ হয় তখন আর ছিলেন না। ১৯২৬ সালে আমি তো শ্রীগোপালদাস মজুমদারকেই ডি. এম. লাইব্রেরীর একমাত্র মালিক হিসাবে দেখেছি, অন্তত আমার মনে সেই ধারণাই তখন জন্মেছিল। তাঁর সঙ্গে ১৯২৬ সালে আমার যখন প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন তিনি আমায় বলেছিলেন যে নজরুলের সব লেখার প্রকাশক তিনিই হবেন। অন্যদের যেন কোন বই না দেওয়া হয়। টাকা তো তিনি দিয়ে যাবেনই। সব লেখা না হলেও ডি. এম. লাইব্রেরীই তার খুব বেশীর ভাগ লেখা প্রকাশ করছিল। দারুণ অভাবের ভিতর দিয়েই নজরুলের পরিবারের দিন চলছিল। এর মধ্যে কবে যে তার আর ডি. এম. লাইব্রেরীর মধ্যে লেখার স্বত্ব বেচাকেনার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল সে খবর আমি জানিনে। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে আমি আবার জেলে চলে গিয়েছিলেম। ১৯৩১ সালের শেষভাগে মাসী-মা (নজরুলের শাশুড়ী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী) আমায় জানিয়েছিলেন যে অনেক দিন ডি. এম. লাইব্রেরীর সঙ্গে নজরুলের হিসাব হচ্ছিল না। ডি. এম. লাইব্রেরীরই নাকি হিসাবের আগ্রহ ছিল না। এই কথা নজরুল

বিখ্যাত সলিসিটর শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রকে জানানোতে তিনি নাকি তাঁর আফিস হতে ডি. এম. লাইব্রেরীকে একখানা চিঠি পাঠান। এর পরে ডি. এম. লাইব্রেরীর সঙ্গে নজরুলের হিসাব-কিতাব নাকি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে ডি. এম. লাইব্রেরীকে কিংবা ডি. এম. লাইব্রেরীর মারফতে নজরুল দু' হাজার টাকায় তার 'অগ্নি-বীণা'র স্বত্ব বিক্রয় করে দিয়েছে। নজরুল ভেবেছিল, হিসাব-কিতাব করে সে ডি. এম. লাইব্রেরীর নিকট হতে কিছু টাকা পেয়ে যাবে, হয়তো কিছু টাকা সে পেয়েওছিল, কিন্তু সে হারিয়ে এলো অগ্নি-বীণার স্বত্ব। এতে তার যে ক্ষতি হয়েছে তা কোনো দিন 'পূরণ' হওয়ার নয়। এই দুই হাজার টাকায় নজরুল এই সময়ে মোটর গাড়ী কিনেছিল।

'অগ্নি-বীণা' খুললেই দেখতে পাওয়া যায় তাতে লেখা আছে যে

শ্রীমতী বিজলী দেবী কর্তৃক
ভাট্টা, পুর্ণিয়া হইতে প্রকাশিত।
[গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশিকার]

ডি. এম. লাইব্রেরীর নামও অবশ্য 'অগ্নি-বীণা'র টাইটেল পেজে লেখা আছে। শুনেছি শ্রীমতী বিজলী দেবী শ্রীগোপালদাস মজুমদারের বন্ধুপত্নী। সকল কবিতা পুস্তকের মধ্যে 'অগ্নি-বীণার' বিক্রয় সর্বাধিক কিনা তা যাচাই না করে বলা আমার পক্ষে কঠিন। তবে নজরুলের পুস্তকগুলির মধ্যে 'অগ্নি-বীণা'র বিক্রয় যে সর্বাধক তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রথম মুদ্রণ হতেই প্রতি মুদ্রণে দু' হাজার দুই শতের কম ছাপা হয় নি। স্বত্ব বিক্রয়ের পরে বেশীও হয়তো ছাপা হয়েছে। আমি যতটা জানতে পেরেছি, এখন 'অগ্নি-বীণা'র সপ্তদশ সংস্করণ চলছে।

আমার নিকটে কোনো সঠিক হিসাব যদিও নেই তবুও এটা বলতে বোধ হয় কোনো বাধা নেই যে নজরুলের বিশিষ্ট পুস্তকগুলির স্বত্বের মালিক ডি. এম. লাইব্রেরী। স্বত্বের মালিক ডি. এম.

লাইব্রেরীই হো'ন কিংবা অন্যরাই হোন, এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে লাভের সম্ভাবনা কমে গেলে প্রকাশকরা অনেক পুস্তকেরই প্রকাশন বন্ধ ক'রে দিবেন। তাতে নজরুলের লেখা ধীরে ধীরে বিলোপ পেয়ে যাওয়ার একটা ভয় থাকবে। নজরুল যখন আজ বেঁচে থেকেও জীবন্মৃত হয়ে আছে তখন তার লেখার সংরক্ষণের কথাও দেশকে ভাবতে হবে।

শুধু স্বত্ববিক্রয় নয়, অন্য কারণেও নজরুলের কিছু কিছু লেখার, বিশেষ করে তার গানগুলির প্রচার বাধা পেয়েছে। এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যে ১৯৩৯ সালে সে দারুণ অর্থকষ্টে পড়েছিল। সে ছোট ছোট দেনা অনেক করেছিল। তাতে বেশী সুদের দেনাও ছিল। এই সময়ে সে কয়েকবারে কলকাতার নামজাদা সলিসিটর শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকট হতে চার হাজার টাকা ধার নেয়। এই ধার পেয়ে নজরুলের নিশ্চয় উপকার হয়েছিল, সে ছোট ছোট পাওনাদারদের টাকার তাকিদের যন্ত্রণা হতে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীদত্ত বিনা শর্তে নজরুলকে টাকা ধার দেননি, কেউই দেন না। ১৯৩৩ সালের ১লা আগস্ট তারিখে গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেডের সঙ্গে নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে একটি লিখিত কনট্রাক্ট নীচে দেওয়া শর্তে হয়েছিল যে

(১) হিজ্ মাস্টার্স ভয়স্-এর রেকর্ডে নজরুলের রচিত যে গান উঠবে তার খুচরা বিক্রয়ের ওপরে সে শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে রয়ালটি পাবে। আরও পরিষ্কার করলে বলতে হবে যে প্রতি রেকর্ডের প্রত্যেক পিঠের গানের জন্যে সে পাবে শতকরা আড়াই টাকা রয়ালটি। দু' পিঠ মিলিয়ে পাঁচ টাকা হয়।

(২) রেকর্ডের এ-পিঠে ও-পিঠে গাওয়া নজরুল রচিত প্রত্যেক গানের জন্যে সে পাবে এক কালীন বিশ টাকা।

টাকা ধার নেওয়ার সময়ে কাজী নজরুল ইস্‌লাম ও শ্রীঅসীমকৃষ্ণ

দত্তের মধ্যে যে দলীল সম্পাদিত হয়েছে তাতে এই ক্ষমতাও শ্রীদত্তকে দেওয়া হয়েছে যে সুদে-আসলে তাঁর সমস্ত টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেডের নিকট হতে নজরুলের পাওনা সমস্ত টাকা সোজাসুজি তিনিই নিবেন। দলীলে শুধু এটাই একমাত্র শর্ত নয়, নজরুলের ৩৭ খানা পুস্তকও এই ঋণের জন্যে শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত বন্ধক রেখেছেন। এই কারণে কিছু সংখ্যক পুস্তকের ছাপানো বন্ধ হয়ে গেছে। নজরুলের বহু সংখ্যক গান লোক-চক্ষুর আড়ালে চলে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেও বলা যায়। এমন বহু গান নজরুলের ছিল যে-গুলি কখনও পুস্তকে ছাপা হয়নি, ছাপা হয়েছিল শুধু গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে। সেই রেকর্ডগুলি এখন আর পাওয়া যায় না।

শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের সঙ্গে দলীল সম্পাদনের কিছুকাল পরে নজরুল কঠোর মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সে জ্ঞান হারিয়েছে, কথা বলার শক্তিও তার নেই। কিন্তু দেশের লোকেরা আজও জানতে পেলেন না যে নজরুলের চার হাজার টাকার দেনা শোধ হয়েছে কিনা, কত টাকা শ্রীদত্ত সব নিয়ে নজরুলের বাবতে গ্রামোফোন কোম্পানীর নিকট হতে পেয়েছেন। নজরুল শুধু শ্রীদত্তের একজন মামুলী খাতক নয়, সে আমাদের দেশের জাতীয় কবিও বটে। তার সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়ার দাবী দেশের লোকেরা নিশ্চয় করতে পারেন। টাকা শোধ হয়ে গিয়ে থাকলে দলীল খানা নজরুলের স্ত্রীর নিকটে ফেরৎ পাঠানো কি শ্রীদত্তের উচিত ছিল না?

কলকাতার কালিকা টাইপ ফাউন্‌ড্রির মালিক শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তীর অনুরোধে কিংবা তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে নজরুল ইস্‌লাম কিছু লেখা তৈয়ার করেছিল। এইসব লেখার মুদ্রণ-স্বত্ব ছিল শ্রীচক্রবর্তীর। অন্ততঃ, "মরু-ভাস্করে"র, মুদ্রণ-স্বত্ব যে তাঁরই ছিল একথা প্রমীলার লেখা হতে জানা যায়। আমার সঙ্গে

শ্রীচক্রবর্তীর বিশেষ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও আমি কোনো দিন নজরুলের লেখা সম্বন্ধে তাঁকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিনি। এটা সহজেই বোঝা যায় যে তিনি যখন তার লেখার স্বত্বের মালিক হয়েছিলেন তখন টাকাও তিনি তাকে নিশ্চয় দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তার পরিবারের দুর্দিনে এই স্বত্বও তিনি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই থেকে তাঁর দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

নজরুলের লেখার স্বত্ব-ক্রেতা আর স্বত্ব-ক্রেতাতেও যে পার্থক্য আছে, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

উনিশ শ' ত্রিশের দশকে নজরুল ইস্‌লাম তার জীবনে সবচেয়ে বেশী টাকা রোজগার করেছে। এই দশকেই সে তার পুস্তকের স্বত্বও বিক্রয় করেছে সবচেয়ে বেশী। আবার এই দশকেরই শেষাশেষিতে সে শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকট হতে কঠোর শর্তে চার হাজার টাকা ঋণও গ্রহণ করেছে।

প্রমীলা ও নজরুলের বিবাহ

আগেই আমি বলেছি যে ১৯২২ সালে নজরুল ইস্‌লাম কুমিল্লায় গিয়ে এক সঙ্গে তিন-চার মাস সেখানে ছিল। এই সময়েই কুমারী প্রমীলা সেনগুপ্তার সহিত তার বিয়ে স্থির হয়। অর্থাৎ, চৌদ্দ বছর বয়স্কা প্রমীলা ও তেইশ বছর বয়স্ক নজরুলের মধ্যে বোঝাপড়া তো হয়ে গেলই, প্রমীলার মা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীও এই ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সম্মতি দিলেন। মা-ই ছিলেন বাপ-মরা মেয়ের অভিভাবিকা। ত্রিপুরা রাজ্যের নায়েব বসন্তকুমার সেনগুপ্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন গিরিবালা দেবী। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর একমাত্র সন্তান প্রমীলাকে নিয়ে দেবর শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের নিকটে চলে আসেন। আর কোথাও তাঁর যাওয়ার স্থান ছিল না।

বিয়ের প্রধান তিন পক্ষ মা, মেয়ে ও নজরুলের মধ্যে বোঝাপড়ায় কোনো ত্রুটি ছিল না, কিন্তু আমার মনে হয় শুরুতে শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীকে ব্যাপারটি জানানো হয়নি। তবে, শ্রীসেনগুপ্ত কিছু বুঝুন আর না বুঝুন, ব্যাপারটি কি শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী ও তাঁদের পুত্র-বধুর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পেরেছিল? আমার বিশ্বাস হয় না যে পেরেছিল। এসব ব্যাপারে মেয়েদের দৃষ্টি বড় প্রখর।

'মোসলেম ভারতে' ছাপাবার জন্যে নজরুলের নিকট হতে

একদিন ডাকে একটি গান এলো। গানটি আফ্‌জালুল হক সাহেব আমায় পড়তে দিলেন এবং বললেন, গিরিবালা দেবীর মেয়ের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

আমি বললাম, কবি লিখেছে একটি গান। তার ভিতর থেকে আপনি আবার বিয়ে খুঁজে বা'র করছেন কেন? তা'ছাড়া দুলি তো (প্রমীলার ডাক নাম) ছোট মেয়ে।

আফ্‌জাল সাহেব বললেন, আপনার যেমন বুদ্ধি! আমি চুপ ক'রে গেলাম এই ভেবে যে হয়তো আমার বুদ্ধি কিছু কমই।

আমার ছোট বেলা মেয়েদের বিয়ের পক্ষে চৌদ্দ বছর অনেক বয়স ছিল। কিন্তু ১৯২২ সালে নজর বদলে গিয়েছিল। যা'ক, পুরো গানটিই আমি নীচে তুলে দিলাম।

হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমরজয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার-মানা হার পরাই তোমার কেশে॥
ওগো জীবন-দেবী!
আমায় দেখে কখন তুমি ফেল্‌লে চোখের জল,
আজ বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল!
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত রথের চূড়ে,
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে॥

'ধূমকেতু'র মোকদ্দমায় নজরুলের সাজা হওয়ার আগে আমি

খানিকটা বুঝতে পেরেছিলেম যে আফ্‌জালুল হক সাহেব অকারণে আমার বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। যা'ক, গানটি 'মোস্‌লেম ভারতে' ছাপা তো হয়েছিলই, আর নজরুল ইস্‌লামের 'ছায়ানট' নামক পুস্তকেও 'বিজয়িনী' শিরোনামে তা স্থান পেয়েছিল। এই 'ছায়ানট' পুস্তকখানাকে আবার আমার জেলে থাকার সময়ে আমার নামে ও আমাদের বন্ধু কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে নজরুলের যখন সাজা হয়েছিল (এটাই তার সাজার সঠিক তারিখ, ৮ই জানুয়ারী নয়) তার আগে হতেই বিচারাধীন বন্দীরূপে সে জেলে ছিল। ১৯২২ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে সে কুমিল্লায় গিরেফ্‌তার হয়ে পুলিসের প্রহরায় কলকাতায় আনীত হয়। ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে তার সাজা হওয়ার ক'মাসের ভিতরে আমাকেও জেলে চলে যেতে হয়েছিল। আমাদের ক'জনের বিরুদ্ধে কানপুরে ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে যে মোকদ্দমা * শুরু হয়েছিল এপ্রিল মাসেও তা চলছিল। এপ্রিল (১৯২৪) মাসে আবদুল হালীম কলকাতা হতে আমাদের দেখতে কানপুরে যায়। তখন তার মুখে জানতে পারি যে প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের বিয়ে হতে যাচ্ছে। আফ্‌জাল সাহেব ঠিকই বুঝেছিলেন। নজরুল এ কথাও আবদুল হালীমকে জানিয়েছে যে বিয়ের পথে তখনও অনেক বাধা রয়েছে।

বাধা সত্যিই অনেক ছিল। কলকাতায় ফিরে এসে আমি যা শুনেছিলেম, অবশ্য গিরিবালা দেবী, প্রমীলা কিংবা নজরুল ইস্‌লামের মুখে নয়, তাতে গিরিবালা দেবীর মনের দৃঢ়তার জন্যেই নজরুল আর প্রমীলার বিয়ে হতে পেরেছিল। তিনি তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চলে এসেছিলেন। কাউকে কোনো কথা

* কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা। ভারত গবর্নমেণ্টের তরফ হতে এ মোকদ্দমাকে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাও বলা হয়েছে।

জিজ্ঞাসা না করেও আমি ধারণা করতে পেরেছিলেম যে শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী উভয় সঙ্কটে পড়েছিলেন। নজরুলকে তিনি যে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন তাঁতে কোনো খাদ মিশানো ছিল না। উদার-প্রশস্ত মন ছিল তাঁর। তবুও তাঁর সামনে হিমালয়ের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের একান্ত রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার ভিতরে থেকেই তাঁকে ভবিষ্যতে তাঁর দু'টি মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। তাঁর স্বামী শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত এ-বিয়েতে রাজী ছিলেন না। ১৯২৬ সালে কলকাতায় শ্রীবীরেন্দ্র-কুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে ১৯২৩ সালের পরে আমার প্রথম যখন দেখা হয়েছিল তখন আমি তাঁর কথা হতে বুঝেছিলেম যে তিনিও বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। তার আগে আমার মনে কি রকম একটা ধারণা ছিল যে তিনি অন্তত বিরুদ্ধে ছিলেন না। এই অবস্থায় বিয়ের আগে শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী কলকাতায় এসে শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী ও তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও চেয়েছিলেন। তাঁরা যান নি। বলেইছি তো গিরিবালা দেবীর মনের জোর ছিল।

কন্যা পক্ষের অমত

বিয়েতে কন্যা পক্ষের যে অমত ছিল সে কথা বলেছি, কিন্তু বরের পক্ষেও কিঞ্চিৎ অসুবিধা ছিল। নজরুলের উপন্যাসের নায়ক ছিল বাঁধন-হারা। নিজের জীবনেও সে বাঁধন মানত না,—ধর্মের নয়, সমাজেরও নয়। তবুও সে যে বিয়ের বাঁধনে ধরা দিতে যাচ্ছে তাকে তো সমাজের কোনো একটা কাঠামোর সঙ্গে বাঁধতে হবে। তা না হলে বিয়ে আইন সম্মত হয় না। কিন্তু প্রমীলাকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়ে, অর্থাৎ ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত ক'রে বিয়ে করার কথা নজরুল চিন্তাও করতে পারত না। গিরিবালা দেবী আর প্রমীলাও বা তাতে রাজী হবেন কেন? তখন বিয়ে রেজিস্ট্রী করার জন্যে ১৮৭২ সালের ৩ নম্বর আইন প্রচলিত ছিল। এই আইন অনুসারে বিয়ে রেজিস্ট্রী করানোর সময়ে বর ও ক'নেকে

ঘোষণা করতে হতো যে তারা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, জৈন বা পারসী (জোরাস্তারিয়ান) নয়। আইনটি ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের আন্দোলনের ফলে পাস হয়েছিল। তাই ঘোষণায় কোথাও বলা হতো না যে বর ও কনে ব্রাহ্ম নয়। আইন পাস হওয়ার সময়ে ব্রাহ্মরা নিজেদের হিন্দু মনে করতেন না। এই আইনকে সিবিল ম্যারিজ এক্ট, ১৮৭২, বলা হতো। সাধারণত ১৮৭২ সালের তিন নম্বর আইন নামেই তা পরিচিত ছিল। তবুও যাঁরা এই তিন নম্বর আইন অনুসারে বিয়ে রেজিস্ট্রী করতে চাইতেন তাঁরা এই নেতি-বাচক ঘোষণাটিকে বিশেষ কোনো আমল দিতেন না,— তাঁরা ভাবতেন বিয়েটা আইন সিদ্ধ হলেই তাঁদের কাজ সিদ্ধ হবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাধা ছিল। প্রমীলার বয়স তখন (১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে) ছিল মাত্র ষোল বছর। ষোল বছর বয়সের মেয়ে বা ছেলেদের বিয়ে রেজিস্ট্রী হওয়া বারণ ছিল। কোনো মেয়ের বয়স আঠারো বছর হলে এবং মেয়ের কোনো অভিভাবক বিয়েতে সাক্ষী হলে বিয়ে রেজিস্ট্রী হতে পারত। আর, একুশ কিংবা তার বেশী বয়সের বর-ক'নেরা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াও বিয়ে রেজিস্ট্রী করতে পারতেন। এখন বিয়ের আইনে পরিবর্তন হয়েছে। নেতি-বাচক ঘোষণা আর করতে হয়না। তা ছাড়া, মেয়ের বয়স আঠারো বছর হলেই সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াও বিয়ে রেজিস্ট্রী করতে পারে।

মোট কথা, প্রমীলার বিয়ে ১৮৭২ সালের ৩ নম্বর আইন অনুসারে রেজিস্ট্রী করানোর উপায় ছিল না। কিন্তু উপায় তো একটা বা'র করতে হবে। যাঁরা 'আহ্‌লুল কিতাব' অর্থাৎ কিতাব-ওয়ালা তাঁদের মেয়েদের মুসলমানরা ধর্মান্তর গ্রহণ না করিয়ে, অর্থাৎ ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত না ক'রে বিয়ে করতে পারেন। স্ত্রীরা আপন আপন ধর্ম পালন করতে থাকবেন। স্ত্রীরা যদি গির্জায় যেতে চান তবে স্বামীদের কর্তব্য হবে তাঁদের গির্জায় পৌঁছিয়ে দেওয়া

এবং গির্জা হতে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানরা শুধু য়ুহুদী, খ্রীস্টান ও মুসলমানকে কিতাবওয়ালা মনে করেন,—মনে করেন, তাঁদের মতে এই তিন জনের নিকটেই শুধু পরে পরে আল্লার কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। যাঁরা গোঁড়া নন তাঁরা বলেন ভারতবর্ষ এত বড় একটি দেশ, তার ওপরে আবার প্রাচীন সভ্যতার দেশ, এই দেশে আল্লার কোনো কিতাব অবতীর্ণ হলো না, এটা কি ক'রে সম্ভব? মুস্‌লিম মুঘল সম্রাটগণের হিন্দু বেগমেরা ছিলেন। তাঁরা তো কোনো দিন মুসলমান হননি। অন্দর মহলে আপন ধর্ম-কর্ম তাঁরা পালন করেছেন, পূজা করেছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর যা যা করা উচিত তার সবই করেছেন। সুতরাং, হিন্দুরাও 'আহ্‌লুল কিতাব' (কিতাবওয়ালা), এই মত অনুসারেই কাজী নজরুল ইস্‌লাম ও ও কুমারী প্রমীলা সেনগুপ্তার বিয়ে হয়েছিল কলকাতার ৬ নম্বর হাজী লেনের বাড়ীতে ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে। আমাদের বন্ধু মঈন উদ্দীন হুসয়ন সাহেব বিয়ের কন্‌ট্রাক্ট (আক্‌দ্‌) করিয়েছিলেন। এই সময়ে প্রমীলার আশালতা সেন নামও প্রচারিত হয়েছিল। অনেকের লেখাতেই তা দেখতে পাই। প্রমীলার দু'টি নাম ছিল কি না, কিংবা বিয়ের সময়ে তার একটি নূতন নামকরণ হয়েছিল কিনা, তার কিছুই আমি জানিনে। তবে, ১৯২১ সালের প্রথম পরিচয়ের সময় হতে তাকে প্রমীলা বলেই তো জানি। তাদের কুমিল্লা কান্দির পাড়ের বাসায় তাকে 'দুলি' নামে ডাকতে শুনেছি, 'দুলু' ও 'দোলন' সম্ভবত বাইরের লোকেরা আদর করে ডাকতেন। তাকে নিয়ে নজরুল অনেক কবিতা লিখেছে। তা নিয়ে আমি আলোচনা করব না।

প্রমীলা ও নজরুলের বিয়ে নিয়ে বিরোধিতা কম হয় নি। আমার মনে হয় ব্রাহ্মরা বিরোধিতা করেছিলেন সব চেয়ে বেশী। 'প্রবাসী' গোষ্ঠীর ব্রাহ্মরাই ছিলেন এই ব্যাপারে অগ্রণী। তাঁরাই বা'র করেছিলেন 'শনিবারের চিঠি'। 'প্রবাসী'তে কবিতা ছাপালে

বাম হইতে দক্ষিণে (১) আয়া (২) শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী
(৩) পুত্র বুলবুলকে কোলে নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় নজরুল ইস্‌লাম
(৪) প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম।

কৃষ্ণনগরের "গ্রেস কটেজে" (বর্তমানে ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার হাউস) তোলা।

কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধর সৌজন্যে

নজরুলকে টাকা দেওয়া হতো। সেই 'প্রবাসীতে' তার কবিতা ছাপানো একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মরা পরম হিন্দু হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্ম ছাড়া অন্য হিন্দুরাও কিছু কিছু বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৬ সালের শুরুতে আমি কলকাতায় ফিরে এসে দেখেছি যে হিন্দুদের ভিতরে নজরুলের জনপ্রিয়তা কমে নি। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় অবশ্য অন্য গোষ্ঠীর ব্রাহ্ম ছিলেন। হিন্দু মেয়ে বিয়ে করার জন্যে তিনি নজরুলের সঙ্গে কখনো খারাব ব্যবহার করেছেন এমন কথা আমি শুনিনি।

সময় মানুষের মনের ক্ষত ধীরে ধীরে শুকিয়ে দেয়, মানুষের মন হতে মুছে দেয় যত সব গ্লানি, আর শান্ত করে দেয় তাদের অন্তরের সমস্ত বিক্ষোভ। ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন এলো। দেখা গেল যে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বিরোধিতা আর নেই, তিনি যাতায়াত শুরু করেছেন নজরুলের বাড়ীতে যেমন লোকে যাতায়াত করেন বোনের বাড়ীতে। তাঁর সহোদরা বোনদের সঙ্গেও সেই রকম সম্পর্কই স্থাপিত হলো। শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী কলকাতায় থাকতেন না। তাঁদের সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক আর স্থাপিত হয়নি। বিরজাসুন্দরী দেবী নজরুলকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। এই স্নেহের টানেই তিনি হুগলী জেলে এসে তার অনশন ভাঙিয়েছিলেন। নজরুল যে প্রমীলাকে ভালোবেসেছিল একথা তিনি নিশ্চয় তখন বুঝেছিলেন। তবুও তিনি কুমিল্লা হতে হুগলী পর্যন্ত এসেছিলেন তার প্রতি স্নেহের আকর্ষণে। সেই বিরজাসুন্দরী দেবী এত দরাজ মন নিয়েও কি ক'রে নজরুল ও প্রমীলার প্রতি বিমুখ হয়ে থাকলেন তা জানিনে। আশ্চর্য নয় যে তাঁর স্বামীর ইচ্ছা তাঁকে মেনে চলতে হয়েছে। অন্তত, নজরুলদের সঙ্গে পুনঃ সম্পর্ক স্থাপনে তিনি তাঁর সন্তানদের বাধা দেননি।

বিরজাসুন্দরী দেবীকে নজরুল অশেষ শ্রদ্ধা করত। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ কেটে যাওয়ার কারণে নজরুলের মনেও একটা গভীর

ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। তার 'সর্বহারা' নামক কবিতা পুস্তক তাঁর নামে উৎসর্গ করতে গিয়ে যে কবিতা সে লিখেছে তা থেকে তার মনোবেদনা আমরা বুঝতে পারি। এই কবিতাটির কয়েকটি ছত্র আমি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার।
তুমি কোনো দিন কারো করনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিধির
কূলে বসে কাঁদ মৌন কন্যা ধরণীর
একাকিনী।

*　　　*　　　*

দূর দূরান্তর হতে আসে ছেলে মেয়ে,
ভুলে যায় খেলা তারা তব মুখ চেয়ে!
বলে 'তুমি মা হবে আমার?' ভেবে কী যে!
তুমি বুকে চেপে ধর, চক্ষু ওঠে ভিজে
জননীর করুণায়।

*　　　*　　　*

হয়ত ভুলেছ মাগো, কোনো একদিন
এমনি চলিতে পথে মরু-বেদুঈন-
শিশু এক এসেছিল। শ্রান্ত কণ্ঠে তার
বলেছিল গলা ধরে—'মা হবে আমার'?
হয়ত আসিয়াছিল, যদি পড়ে মনে,
অথবা সে আসে নাই—না এলে স্মরণে!
যে-দুরন্ত গেছে চ'লে আসিবে না আর,
হয়ত তোমার বুকে গোরস্থান তার
জাগিতেছে আজো মৌন, অথবা সে নাই!
এমন ত কত পাই—কত সে হারাই!······

সর্বসহা কন্যা মোর !   সর্বহারা মাতা !
শূন্য নাহি রহে কভু মাতা ও বিধাতা ।
হারা-বুকে আজ তব ফিরিয়াছে যারা—
হয়ত তাদেরি স্মৃতি এই "সর্বহারা" ।

এই কবিতা আমাদের বুঝিয়ে দেয় শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর জন্যে নজরুলের বেদনার পরিমাণ কত বেশী ছিল ।

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত লিখেছেন :—

......"এর আগে নজরুল যখন ১৯২১ সালে কুমিল্লায় যান, তখন সেখানে বীরেন্দ্র সেনগুপ্তের বিধবা জেঠীমা গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলার (ডাক নাম দুলি) সঙ্গে তার প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু বিবাহের কোনো পাকাপাকি ব্যবস্থা তখন হয়ে ওঠে না। এই সময় নজরুল আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলৎপুর গমন করেন এবং সেখানে তাঁর ভাগ্নীর সঙ্গে নজরুলের বিবাহ-চুক্তি হলেও তিনি চিরকালের মতো তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। নজরুলের প্রথম বিবাহের ব্যর্থতা এবং প্রমীলার সঙ্গে প্রণয়-ব্যাপারের সংশয় ও অনিশ্চয়তা তাঁর কবিসত্তাকে বিচলিত ও উদ্বেলিত করে। 'দোলন-চাঁপা'র মধ্যে কবির প্রেম সম্পর্কিত অস্থির মানসিকতা ধরা পড়েছে। প্রেমিকের বিচিত্র প্রণয়লীলা ও ও তার মান অভিমান, অনুরাগবিরাগ, দ্বন্দ্ব সংশয় প্রভৃতি সব রকম ভাবই 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।" (নজরুল-চরিত মানস, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ভারতী সংস্করণ, ১৯১ পৃষ্ঠা।)

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের ভুল তথ্য

ডক্টর গুপ্তের লেখার ওপরে তুলে দেওয়া অংশে কিঞ্চিৎ অসাবধানতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা লিখেছেন তা ঘটা একেবারেই অসম্ভব ছিল। ১৯২১ সালে নজরুল দু'বার কুমিল্লা

গিয়েছিল। তিনি এখানে প্রথম বারের কথাই লিখেছেন। এই প্রথম বারে দৌলৎপুর গ্রামে আলী আকবর খানদের বাড়ী যাওয়ার পথে নজরুল কুমিল্লা-কান্দির পাড়ে শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় উঠেছিল এবং মাত্র ৪/৫ দিন সে বাসায় সে ছিল। এ কথা আমি আগে বিস্তৃতভাবে লিখেছি। ডক্টর গুপ্ত লিখেছেন এই অল্প সময়ের ভিতরে "প্রমীলার সঙ্গে তার (নজরুলের) প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু বিবাহের কোনো পাকাপাকি ব্যবস্থা তখন হয়ে ওঠে না।" এই 'তখন হয়ে ওঠে না' হতে কি এই বোঝা যায় না যে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছিল, কেবল তার ব্যবস্থা হতে পারেনি? মাত্র ৪/৫ দিনের পরিচয়ের ভিতর দিয়ে এতটা এগুনো কি সম্ভব? যদি ধ'রেও নেওয়া যায় যে 'প্রণয়-সম্পর্ক'টা বিয়ের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তবে দৌলৎপুর গ্রামে গিয়ে নজরুল আবার কি ক'রে আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ীর এমন প্রেমে পড়ল যে যার ফলে তার সঙ্গে বিয়ের দিন-তারিখ পর্যন্ত স্থির হয়ে গেল? শুধু তাও নয়, এই বিয়ের উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্যে কুমিল্লা হতে শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসার সকলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী তো ছিলেনই, ছিল তাঁর মেয়ে প্রমীলাও। এত অগ্রসর 'প্রণয়-সম্পর্ক'কে যে লোকটি বাতিল ক'রে দিয়ে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করতে গেল তার সেই বিয়ের উৎসবে প্রমীলার যোগ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব কথা। ডক্টর গুপ্ত যা লিখেছেন তাতে কি তিনি নজরুলের ছবিকে একটি বিয়ে-পাগলা যুবকের ছবিতে দাঁড় করান নি?

১৯২২ সালের মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে লিখিত নজরুলের 'বিজয়িনী' কবিতাই প্রমীলা সেনগুপ্তার সহিত তার প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপনের প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা। ১৯২১ সালের দুর্গা পূজার সময়েও সে কুমিল্লা গিয়েছিল। সেবারে সে অনেক দিন, প্রায় এক মাসের কাছাকাছি, সেখানে ছিল। তারপরে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী

মাসে কুমিল্লায় গিয়ে তো সে প্রায় চার মাস সেখানে ছিল। 'প্রণয়-সম্পর্ক' ইত্যাদি স্থাপনের ব্যাপার ঘটেছে এই শেষের দুই বারে। প্রথমবারে দৌলৎপুর যাওয়ার পথে যে ৪/৫ দিন নজরুল ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় ছিল তখন প্রমীলার সঙ্গে কোনো 'প্রণয়-সম্পর্কের' কথাই ওঠে নি। ডক্টর গুপ্তকে কে এই খবর সরবরাহ করেছেন জানি নে। যিনিই করুন না কেন, তিনি নজরুলের একজন ছদ্ম বন্ধু। তিনি নজরুলকে একজন বিয়ে-পাগলা যুবকরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, কথাটা লেখার আগে ডক্টর গুপ্তের একবার হিসাবটা খতিয়ে দেখা কি উচিত ছিল না? নজরুলের জেলে যাওয়ার পরে তার কবিতায় যে 'দ্বন্দ্ব সংশয়ের' পরিচয় তিনি পেয়েছেন তা কি এই কারণে যে 'প্রমীলা' তাকে ছেড়ে আর একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছিল? সমাজের অচলায়তনের কথা কেন তাঁর মনে একবারও উদয় হলো না? ধার্মিক ও সামাজিক বন্ধন নজরুলের যতই কম থাকুক না কেন, মত ও পথের দিক থেকে যতই উদার সে হো'ক না কেন, তবুও সে ছিল একজন মুসলমানের ছেলে। তাকে স্নেহ করা যায়, ভালোবাসা যায়, বাড়ীতে স্থান দেওয়া যায়, কিন্তু তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কি ক'রে দেওয়া চলে? সেখানে রক্ষণশীল সমাজের হাতে যে প্রচণ্ড মার খাওয়ার ভয়। শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবার অনেক হিন্দু পরিবারের চেয়ে উদার ছিল। এই পরিবারের পক্ষেও কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের ভয় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখানেই ছিল নজরুলের ভয়। তার অনুপস্থিতিতে প্রমীলাকে অন্য কোথাও জোর ক'রে বিয়ে দেওয়া অসম্ভব ছিল না। গুরুজনের আদেশ অমান্য করার মতো বয়স তখনও প্রমীলার হয় নি। নজরুলের 'সংশয়' ও 'অস্থির মানসিকতা' প্রভৃতির কারণ ডক্টর গুপ্তকে এখানেই খুঁজতে হবে।

হুগলীতে বাসা বাঁধা এবং ওয়ার্কার্স্ এণ্ড পেজাণ্ট্স্ পার্টি স্থাপন

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কোনো এক লেখাতে পড়েছিলেম যে বিয়ের পরে নজরুল কয়েকদিন তার স্ত্রী ও শাশুড়ী সহ 'বিজলী' অফিসের বাড়ীতে ছিল। তার পরে সে হুগলীতে বাস করতে যায়। অনেকে লিখেছেন যে শ্রীভূপতি মজুমদার নজরুলকে হুগলী নিয়ে গিয়েছিলেন। এটা কিছুতেই সত্য ঘটনা হতে পারে না। কারণ, ১৯২৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীমজুমদার ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে গিরেফ্তার হয়ে রাজবন্দী (স্টেট্ প্রিজনার) হয়েছিলেন, আর ছাড়া পেয়েছিলেন ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে 'ধূমকেতু' কাগজ বা'র করার পরে শ্রীভূপতি মজুমদারের মারফতে হুগলীর কয়েকজন যুবকের সহিত নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। তার পরে হুগলী জেলে তার অনশন ধর্মঘটের সময়ে সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠতর ও ব্যাপকতর হয়। হুগলীর এই যুবকদের উপলক্ষ করেই নজরুল সেখানে বাসা বাঁধতে গিয়েছিল। জেল হতে ফিরে আসার পরে এই রকম খবরই আমি পেয়েছিলেম এবং এটাই সঠিক খবর। ১৯২৬ সালের ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত নজরুল হুগলীতে ছিল।

যদিও নজরুল ইস্‌লাম তার 'বিজয়িনী' শীর্ষক গানে লিখেছে যে

"আমার সমরজয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,
এখন এভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার-মানা হার পরাই তোমার কেশে"

তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিয়ে করার পরে সে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করল। এই সময়েই বাঙলা দেশের নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে রাজনীতিক সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ ক'রেছিল। তার গতিবিধি কেবল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সভা-সমিতিতে আর সীমাবদ্ধ থাকল না। ১৯২৬ সালে সে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিল। কখন প্রথম সে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য হয়েছিল সে খবর আমি নিইনি।

সক্রিয় রাজনীতিতে নজরুল

১৯২৪ সালে হুগলীতেই প্রথম গান্ধীজীর সঙ্গে নজরুলের মুখোমুখী পরিচয় হয়েছিল। তাঁর আগমন উপলক্ষে সে গান ও কবিতা রচনা করেছিল। পরে তার মুখে শুনেছি যে গান্ধীজী এই গান ও কবিতার আবৃত্তি শুনে খুবই খুশী হয়েছিলেন। তিনি নাকি তাকে বলেছিলেন যে রাত্রে তিনি কবিকে স্বপ্নেও দেখেছেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচয়

গান্ধীজীর আগমনে যদিও নজরুল চর্‌খার কবিতা লিখেছিল তবুও সে স্থির নিশ্চিত হয়েছিল যে চর্‌খা ও খদ্দরের মারফতে দেশে স্বাধীনতা কোনো দিন আসবে না। তাই তার মন জনগণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই বিষয়টি নিয়ে সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে, বিশেষ ক'রে কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ, হেমন্তকুমার সরকার ও শাম্‌সুদ্দীন হুসয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। স্থির হয় যে তাঁদের চারজন উদ্যোক্তা

হয়ে একটি দল গঠন করবেন। ১৯২৫ সালের নবেম্বর মাসে এই দলটি কলকাতায় গঠিত হয়। প্রথমে তার নাম হয়—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবর স্বরাজ পার্টি—(The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress). এই দলের প্রথম ইশ্‌তিহার কাজী নজরুল ইস্‌লামের দস্তখতে প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলের সাহিত্যিক চরিতকাররা নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে এই কাজটি সে আমার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করেনি। আসলে আমি তখনও কলকাতায় ফিরেই আসিনি। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে এই প্রথম ইশ্‌তিহারখানা এই পুস্তকে ছেপে দিব। দুর্ভাগ্যবশত আমার জেলে বন্দী হওয়ার কারণে তার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে। এখান থেকে চিঠি-পত্র লিখে দলীলখানার অনুসন্ধান করানো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এই পার্টি গঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখপত্ররূপে 'লাঙল' নাম দিয়ে সাপ্তাহিক কাগজ বা'র হয়েছিল। ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে "লাঙল"-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'লেবর স্বরাজ পার্টি'র আফিসের জন্যে কলকাতা ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডের দোতালায় দু'খানা কামরা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এই ঠিকানা হ'তেই 'লাঙল'-এরও প্রকাশ আরম্ভ হয়। লাঙলের প্রধান পরিচালক হিসাবে কাজী নজরুল ইস্‌লামের নাম লেখা হতো, আর সম্পাদকরূপে নাম ছাপা হতো মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের। তিনি ছিলেন নজরুলের বাঙালী পল্টনের বন্ধু। তবে পল্টন ভাঙার অনেক আগেই তিনি নাম কাটিয়ে রেলওয়েতে চাকরী নিয়েছিলেন। নজরুলের সঙ্গে যখন তিনি হুগলীতে এসে জুটেছিলেন তখন তাঁর রেলওয়ের চাকরীও আর ছিল না। দরাজ গলায় গান গাইতে পারতেন। মণিভূষণের পরিবার মধ্য প্রদেশে বসতি-নেওয়া বাঙালী। তিনি এখন স্বামী বিরূপাক্ষানন্দ নাম নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন।

'লাঙলে'র প্রথম সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়েছিল। নানা উপশিরোনামে বিভক্ত এটি একটি বিরাট

কবিতা। 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'বারাঙ্গনা' 'নারী' ও 'কুলি-মজুর' এই কবিতার উপশিরোনাম (সব্-হেডিং) মাত্র। অনেকে ভুল ক'রে এই সব্-হেডিংগুলিকে আলাদা আলাদা কবিতা মনে করেন। শুনেছি (চোখে দেখিনি) 'সাম্যবাদী' তখন রুশ ভাষায় তর্জমা হয়েছিল।

'লাঙলে'র দ্বিতীয় সংখ্যা বা'র হয়েছিল ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে। তাতে তার বিখ্যাত 'কৃষকের গান' প্রকাশিত হয়। এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে। এই সংখ্যাতেই নজরুলের বিখ্যাত 'সব্যসাচী' শীর্ষক কবিতা ছাপা হয়েছিল।

নজরুলের বহু বিখ্যাত গান ও কবিতার রচনাস্থল হুগলী। গান্ধীজীর আগমন উপলক্ষে রচিত 'চর্‌খা'র কবিতা ও গান হুগলীতেই রচিত হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর বিষয়ে যে-সকল গান ও কবিতা নজরুল লিখেছিল তার সব ক'টিরই রচনাস্থল হুগলী। তার সুবিখ্যাত 'ঝড়' কবিতাও হুগলীতেই রচিত হয়েছিল। আরও বহু সংখ্যক কবিতা হুগলীতে থাকার সময়ে সে রচনা করেছে। তার সবগুলির খবর আমার জানা নেই। 'লাঙলে'র প্রথম তিন সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি কবিতা—'সাম্যবাদী', 'কৃষকের গান' ও 'সব্যসাচী' নজরুল হুগলীতেই রচনা করেছিল। আমার বিশ্বাস এই কবিতাগুলিই তার হুগলীর শেষ রচনা।

আমি যতটা খবর পেয়েছিলেম তাতে হুগলীতে মনের দিক থেকে নজরুল খুব সুখী ছিল না। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক হ'তে আমরা জানতে পারি যে বাড়ী ভাড়া পেতেও তাকে সেখানে বেগ পেতে হয়েছিল। বাঙলা দেশের সেই পুরানো অসুবিধা। মুস্‌লিম নামধারীদের হিন্দুরা সহজে বাড়ী ভাড়া দিতে চান না? আর্থিক কষ্টের কোনো শেষ ছিল না। তার ওপরে আবার ছিল অতিথির চাপ। কয়েক আনা পয়সা খরচ করলেই কলকাতা হতে হুগলী যেতে পারা যেতো। তাই, অনেকেই দেখা করতে আসতেন।

আসলেই তাঁদের খাওয়াতেও হতো। ১৯২৫ সালের শেষার্ধে আবার হুগলীতেই নজরুল দারুণ অসুখে পড়ল, এমন কঠোর অসুখ যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে লাগল। অসুখের কারণটা মনে হয় হুগলীতে ঘটেনি। আমাদের বন্ধু কুত্‌বুদ্দীন সাহেব বশিরহাট এলাকায় একটা উপ-নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর নির্বাচনের কাজ করার জন্যে আবদুল হালীম আর নজরুল ইস্‌লাম বশিরহাটে গিয়েছিল। সেখানে ক'দিন তারা ডাক বাংলোতেই ছিল। ভালো জায়গা। ক'দিন আগে শাম্‌সুদ্দীন হুসায়ন সাহেবও (আবদুল হালীমের বড় ভাই) সেখানে থেকে এসেছিলেন। কিন্তু অসুখে ধরল নজরুল ইস্‌লামকে। সেই অসুখে ধরেছিল আবদুল হালীমকেও, কিন্তু নজরুলের মতো প্রচণ্ডরূপে নয়। এই অসুখ সম্বন্ধে আমি আবদুল হালিমের একখানা পত্রের অংশবিশেষ নীচে তুলে দিলাম।

> "১৯২৫ সালে কুত্‌বুদ্দীন সাহেবের নির্বাচনে নজরুল ও আমি নির্বাচনের কাজের জন্য বশিরহাট গিয়েছিলাম এবং ১০/১২ দিন সেখানে ছিলাম। আমরা কয়েকদিন ডাক বাংলোতে ছিলাম। আমার বড় ভাই শাম্‌সুদ্দীন সাহেবও সেখানে কয়েক দিন ছিলেন। বশিরহাট থেকে ফিরেই নজরুল সাংঘাতিকভাবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। তিনি রক্ত বমন করতে থাকেন। পায়খানার পথেও তাঁর রক্তস্রাব হতে থাকে। বাঁচার আশা কম ছিল। আমি রোজ রাত্রের গাড়ীতে নৈহাটী হ'য়ে হুগলী যেতাম বরফ ও ডাব নিয়ে। কুত্‌বুদ্দীন সাহেব ও আমাদের চেষ্টায় সেযাত্রা নজরুল প্রাণে বেঁচে যান। হুগলীতে থাকাকালীন আগে থেকে তাঁকে ম্যালেরিয়ায় ধরেনি। বশিরহাট থেকে ফিরেই তিনি রোগাক্রান্ত হন। মাসীমার সাথে তখন আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। নজরুল যে বেঁচে উঠলেন তাতে তাঁরও ঐকান্তিক সেবাযত্ন ছিল। তার কিছুকাল পরে নজরুল কৃষ্ণনগরে চলে যান।"
> মাসীমা হচ্ছেন নজরুলের শাশুড়ী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী।

কৃষ্ণনগরে নজরুল ইস্‌লাম

বিভিন্ন রাজনীতিক সম্মেলন
কলকাতায় দাঙ্গা

আমি যতটা হিসাব করতে পারছি তাতে ১৯২৬ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে নজরুল ইস্‌লাম হুগলী ছেড়েছিল এবং সেই দিনই অল্প ক'ঘণ্টার ভিতরে সে কৃষ্ণনগরে পৌঁছে গিয়েছিল। হুগলী হতে কৃষ্ণনগরের দূরত্ব রেল পথে ৫০ মাইলের বেশী নয়।

১৯২৬ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে আড়াই বছরেরও কিছু বেশী দিন পরে যে আমি কলকাতায় ফিরেছিলেম একথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। নজরুলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সেদিনই সন্ধ্যা বেলায় আমি হুগলী যেতে চেয়েছিলেম। তাতে বাধা দিলেন কুত্‌বুদ্দীন সাহেব। বললেন, পরের দিন (৩রা জানুয়ারী) হুগলীর বাসা তুলে দিয়ে নজরুলরা কৃষ্ণনগরে বাসা করতে যাচ্ছেন। সে রাত্রে তাঁরা জিনিসপত্রের বাঁধাছাঁদা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। আমার হুগলী যাওয়াতে আমার ও নজরুলদের সমান অসুবিধা হবে। কাজেই ২রা জানুয়ারী দিন গত রাত্রে আমি আর হুগলী গেলাম না। ভাবলাম কৃষ্ণনগরেই যাব একদিন।

হুগলীতে নজরুলের নানান রকম অসুবিধা ঘটছিল। দেনার

দায়েও সে জড়িয়ে পড়ছিল। তাছাড়া, সে যে কঠোর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল তার জ্বের তখনও চলছিল। আর সব কথা বাদ দিলেও স্বাস্থ্যের কারণেও তার পক্ষে স্থান পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। প্রশ্ন দাঁড়ালো যে সে যাবে কোথায়?

এই সময়ে শ্রীহেমন্তকুমার সরকার সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন। তিনি নজরুলের কৃষ্ণনগরে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন এবং সেই প্রস্তাব সে গ্রহণ করল। তার রাজনীতির বন্ধুরাও এই ব্যাপারে সম্মতি দিলেন। কৃষ্ণনগরে গিয়ে নজরুল সে যাত্রার মতো অনেক বিষয়ে বেঁচে গেল, স্বাস্থ্যের দিক হতে তো বটেই। কৃষ্ণনগরে প্রথম যে বাড়ীতে নজরুলের ওঠার ব্যবস্থা শ্রীহেমন্তকুমার সরকার করেছিলেন সেটা ছিল গোলাপটি মহল্লায় মদন সরকারের গলিতে। মদন সরকার হেমন্তবাবুর বাবার নাম। এটা হেমন্তবাবুদের পুরানো বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীরই দেওয়াল ঘেঁসে নূতন বাড়ী ক'রে তাঁরা তাতে উঠে গিয়েছিলেন। আমি আগেই বলেছি যে নজরুলের সেই প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার জ্বের তখনও চলছিল। কৃষ্ণনগরে তার চিকিৎসার ভার নিলেন ডাক্তার জে. এন. দে। তিনি একজন ইংল্যাণ্ডে পাসকরা ডাক্তার ছিলেন এবং জাতিতে ছিলেন খ্রীস্টান। অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তিনি চিকিৎসা ক'রে নজরুলকে নিরাময় ক'রে তুলেছিলেন।

কৃষ্ণনগরে ছাত্ররাও নজরুলকে নানাভাবে সাহায্য করছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীগোবিন্দ দত্ত, শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত ও আরও অনেককে আমি দেখেছি।

এখানে একটি কথা আমার বিশেষভাবে বলা দরকার। নজরুলের কৃষ্ণনগর যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কোনো কোনো লেখক, বিশেষ ক'রে আজহার উদ্দীন খান ও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের ওপরে বড় অবিচার করেছেন। আজহার উদ্দীন সাহেব লিখেছেন :—

> "হুগলীতে থেকে নজরুল ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন 'লাঙল' আফিসে ঋণের কথা তুলতেই হেমন্তকুমার সরকার কবিকে কৃষ্ণনগরে যাবার প্রস্তাব করেন। হেমন্ত বাবু তখন নদীয়া থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হবার তোড়জোড় করছিলেন। নিজের কাজের সুবিধার জন্যে কবিকে সপরিবারে কৃষ্ণনগরে নিয়ে এলেন।" ('বাংলা সাহিত্যে নজরুল' চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ৪০)।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও সেই একই কথা অনেক বাড়াবাড়ি করে লিখেছে এবং যা ঘটনা নয় তাও লিখেছে। হেমন্তবাবু নাকি নজরুলকে বলেছেন, "তোমার লেখার ভাবনা, সংসারের ভাবনা ভাবতে হবে না, সে ভাবনা আমার।" এমন ওয়াদা হেমন্তবাবু যে করেছিলেন সে কথা নজরুল আমায় কোনদিন বলেনি। সে হয়তো মনের দুঃখ মনে চেপে রাখতে পারে, কিন্তু শামসুদ্দীন হুসয়ন সাহেব ও কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব তো বলতে পারতেন। তাদের সঙ্গে নজরুলের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে অনেক দিন অনেক কথা হয়েছে। তারপরে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় আরও লিখেছে :—

> "হেমন্তবাবু যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই হ'ল। মুসলমান প্রধান কৃষকদের মধ্যে নির্বাচনে তিনি জয়ী হলেন।"

১৯২৩ সালের নির্বাচনে শ্রীহেমন্তকুমার সরকার স্বরাজ পার্টির তরফ হতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২৬ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে নজরুল যখন কৃষ্ণনগরে গেল তখনও হেমন্তবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য। তখনকার দিনে তিন বছর পরে ১৯২৬ সালের শেষভাগে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে হেমন্তবাবুর দাঁড়াবার ইচ্ছা ছিল, হয়তো তিনি একথাও ভেবে থাকতে পারেন যে নজরুলের উপস্থিতিতে তাঁর নির্বাচনে কিঞ্চিৎ সুবিধাও হতে পারে। কিন্তু মুসলমান প্রধান কৃষকদের মধ্যে

হেমন্তবাবু নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন একথা একেবারেই সত্য নয়। আসলে তিনি সেবারে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করেন নি। তা ছাড়া, মুসলমানরা তখন শুধু মুসলমান প্রার্থীকেই তাঁদের জন্যে সংরক্ষিত আসনে ভোট দিতে পারতেন। ভোট দেওয়ার ক্ষমতাও তখন সীমাবদ্ধ ছিল, আজকার মতো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোট দেওয়ার অধিকার তখন ছিলনা।

হেমন্ত সরকারের প্রতি অবিচার

নজরুলের দুর্দিনে শ্রীহেমন্তকুমার সরকার তাকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে গিয়ে তার অশেষ উপকার করেছিলেন। আসল ঘটনা কিছুই না জেনে যাঁরা তার এই উপকারকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রচার করেছেন তাঁরা সত্যই তাঁর ওপরে অবিচার করেছেন। আমি জানি, নজরুলের কৃষ্ণনগর যাওয়ায় তার কোনো কোনো বন্ধু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরে গিয়ে তার সঙ্গে আড্ডা জমানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। হুগলী পর্যন্ত তাঁরা কোনো রকমে যেতে পারতেন। কবির এই জাতীয় বন্ধুরা নিজেদের চিত্ত-বিনোদনের ব্যাপারটি বুঝতে পারতেন, কিন্তু তার জীবনের সমস্যা-গুলি তাঁরা কখনো বুঝতে চাননি। অথচ এই বন্ধুদের জীবনেও সমস্যার অন্ত ছিল না।

আমি আগেই বলেছি যে আমার কলকাতায় ফেরার আগেই লেবর স্বরাজ পার্টি অফ্‌ দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল। তার প্রধান উদ্যোগ গ্রহণকারীরা যে কাজী নজরুল ইস্‌লাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ ও শাম্‌সুদ্দীন হুসয়ন সাহেব ছিলেন সে কথাও আগে বলেছি। শামসুদ্দীন হুসয়ন সাহেব ছিলেন আবদুল হালীমের বড় ভাই। শ্রীহেমন্তকুমার সরকার কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত স্বরাজ পার্টির সভ্য ছিলেন, এবং স্বরাজ পার্টির তরফ হতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও তিনি ছিলেন। তাঁরই প্রভাবে সম্ভবত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল

কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবর স্বরাজ পার্টি নামটি হয়েছিল। কিন্তু 'লাঙলে'র ওপরে লেখা হতো "শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের মুখপত্র।" আমি কলকাতায় ফিরে এসেই (২রা জানুয়ারী, ১৯২৬) নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে দেখা করার জন্যে হুগলী যেতে চেয়েছিলেম। পরের দিন সকালে সে সপরিবারে কৃষ্ণনগরে চলে যাচ্ছে জানতে পেয়ে আর যাইনি। তারপরে যখন কৃষ্ণনগরে যেতে চাইলাম তখন বাধা দিলেন শ্রীহেমন্তকুমার সরকার। তিনি বললেন, "৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হবে। তখন আপনি কৃষ্ণনগরে যাবেন, তার আগে নয়।" এই সম্মেলন সম্বন্ধে যে-ইশ্‌তিহার 'লাঙলে' ছাপা হয়েছিল তা আমি নীচে তুলে দিচ্ছি।

নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলন

দ্বিতীয় অধিবেশন

কৃষ্ণনগর, নদীয়া

নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ১৯২৫ অব্দের ৭ই-৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বগুড়া শহরে হয়। ঐ সম্মিলনে সমগ্র বঙ্গের জন্য একটি স্থায়ী প্রজা সংঘ ও নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের গঠন প্রণালী ও নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের গত ফরিদপুর অধিবেশনের সময় বগুড়া প্রজা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত ললিতমোহন সান্যাল মহাশয়ের নেতৃত্বে উক্ত কমিটি নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। বগুড়াতেই স্থির হয় নিখিল বঙ্গীয় অধিবেশন নদীয়াতে হইবে। তদনুসারে মৌলবী শামস্সুদ্দীন আহ্‌মদকে সভাপতি ও নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে সম্পাদক করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য জিলার প্রজা সমিতিসমূহ এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন যে, বঙ্গীয় লাট কাউন্সিলের ফেব্রুয়ারী মাসে অধিবেশনের পূর্বেই বঙ্গীয়

প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে প্রজা পক্ষের মতামত স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

এজন্য আগামী ৬ই-৭ই ফেব্রুয়ারী, বাং ২৩শে-২৪শে মাঘ, কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশন স্থির হইয়াছে। বাংলা দেশের প্রত্যেক মহকুমা হইতে অন্তত একজন করিয়া প্রতিনিধি হইবেন। প্রতিনিধিগণের ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের ২৲ টাকা করিয়া ফি ধার্য হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণেরও স্থানীয় প্রজা সমিতির প্রতিনিধি-রূপে নির্বাচিত হওয়া চাই। অন্যান্য জিলার প্রজা সমিতিসমূহ অবিলম্বে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাঁহাদের নাম ধাম সম্মিলনীর অধিবেশনের অন্ততঃ ৩ দিন পূর্বে যেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকটে পাঠান—অন্যথা অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদের আহারাদি বা বাসস্থানের জন্য দায়ী হইবেন না। প্রতিনিধিগণ সঙ্গে বিছানাপত্র মশারি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র লইয়া আসিবেন। কলিকাতা এবং মফস্বলের বহু নেতা সম্মিলনীতে যোগদান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। সঠিক সময় ও স্থান পরে জানানো হইবে। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধান হইবে :—

(১) বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল গঠন
(২) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন
(৩) কাউন্সিল নির্বাচন

কৃষ্ণনগর
২৫শে জানুয়ারী
১৯২৬

ইতি
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি

(১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৪ই মাঘ তারিখের ষষ্ঠ সংখ্যক ‘লাঙল’ হতে উদ্ধৃতি)

শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী
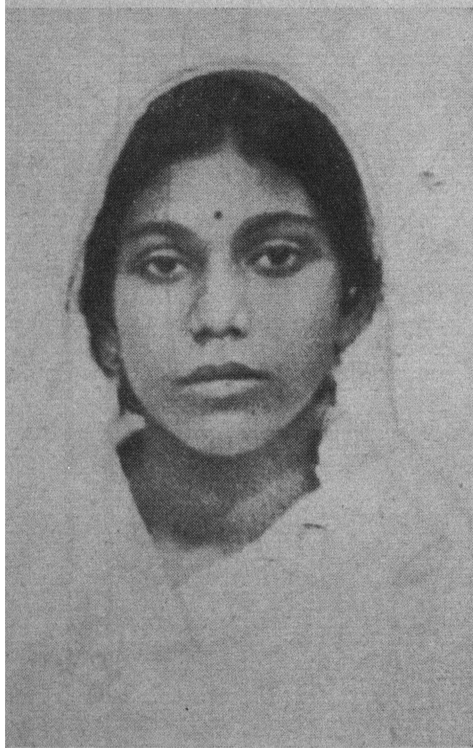
শ্রীমতী প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম

১৯২৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই সম্মেলন উপলক্ষে সকাল বেলার একটি ট্রেনে শিয়ালদা স্টেশন হতে রওয়ানা হয়ে আমরা কৃষ্ণনগর পৌঁছেছিলেম। আমরা মানে আমি, আবদুল হালীম, কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ ও শাম্‌সুদ্দীন হুসয়ন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেদিন আমাদের সঙ্গেই গিয়েছিলেন। শাম্‌সুদ্দীন হুসয়ন এক সময়ে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছিলেন ব'লে তাঁর সঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগেও পরিচয় ছিল। আমার ও অন্যদের সঙ্গে সে দিনই তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল। কৃষ্ণনগর রেলওয়ে স্টেশনে নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা হলো তিন বছরের পরে। তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল ১৩২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টের লক্‌আপে। সে দিনই সে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। এই ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬, তারিখে নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা ও শাশুড়ী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীর সঙ্গে আবার আমার নূতন করে পরিচয় হলো। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে আমি যখন নজরুলকে আনার জন্যে কুমিল্লা গিয়েছিলেম তখন তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

মে মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে অনেকগুলি সম্মেলন হয়েছিল। তার প্রথমটি ছিল নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন। শাম্‌সুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি তখন ছিলেন কৃষ্ণনগরের উকীল। পরে মন্ত্রীও হয়েছিলেন। কেউ যেন তাঁকে শামসুদ্দীন হুসয়নের সঙ্গে ভুল করে ফেলবেন না। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের নামজাদা এডভোকেট শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তও সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের দু'জনার সঙ্গেই সেখানেই আমার প্রথম দেখা ও পরিচয় হয়েছিল। নজরুল ইস্‌লামের 'শ্রমিকের গান' এই সম্মেলনেরই উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে রচিত হয়েছিল। সে

নিজেই সম্মেলনে গানটি গেয়েছিল গানটি এইভাবে শুরু হয়েছিল :

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রী-দল !
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙব চল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে
পাহাড় টলে তুষার গ'লে
মরুভূমে সোনার ফসল ফলেরে।
মোরা সিন্ধু মথে এনে সুধা
পাইনা ক্ষুধার বিন্দু জল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি
কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি
হীরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তুলিরে !
আজ মানব কুলের কালি মেখে
আমরা কালো কুলির দল
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

* * * *

নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের একটি আলোচ্য বিষয় ছিল "কৃষক শ্রমিক দল গঠন"। সম্মিলনে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলো এবং "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" (The Bengal Peasants' and Workers' Party) গঠন করা স্থির হলো।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন

আগে যে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবর স্বরাজ পার্টি" নাম হয়েছিল সে নাম আর থাকল না। অর্থাৎ, সম্পূর্ণরূপে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের

বাইরেই পার্টি গঠিত হলো। সম্মিলনে চেষ্টা করা হয়েছিল যে পার্টির নাম "বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল" করা হোক। কিন্তু মূলত কৃষক প্রতিনিধিদের সম্মেলনে তা সম্ভব হয় নি। পরে অবশ্য, ইংরেজিতে দলের ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টি (The Workers' and Peasants' Party of Bengal) নাম হয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর উনিশ শ' বিশের দশকে যে ভারতের নানা প্রদেশে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টিসমূহ গড়ে উঠেছিল তার শুরু হয়েছিল বাঙলায়। পরে বাঙলার দেখাদেখি বোম্বে, পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশেও (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) পার্টিসমূহ গড়ে উঠেছিল। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় সারা-ভারত মজুর ও কৃষক দলসমূহের যুক্ত সম্মেলন হয় এবং এই সম্মেলনে সারা-ভারত মজুর ও কৃষক দল (The All-India Workers' and Peasants' Party) গঠিত হয়ে যায়। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ভারত গবর্নমেণ্ট প্রমাণ করতে চেয়েছে যে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্ট্স্ পার্টি ছদ্মাবরণে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তো ছিলই। তাই, মোকদ্দমার আসামীরা তা মেনে নেন নি। কিন্তু দায়রা জজ গবর্নমেণ্টের কথাই মেনে নিয়েছিলেন।

১৯২৬ সালে আমি দেখেছি যে নজরুল ইস্‌লাম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সভ্য। আমি অবশ্য ওই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসেই প্রথম কংগ্রেসের চার আনার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হই। কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়ে গেল তার কর্মকর্তাদের একজন যে নজরুল ইস্‌লামও ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। মে মাসে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলন (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন) হবে স্থির হয়েছিল। সেই সময়ে কৃষ্ণনগরে যুব সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলনও হতে যাচ্ছিল। এই সবের প্রস্তুতি চলছিল। নজরুলের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই।

কিন্তু এপ্রিল মাসে শুরু হয়ে গেল কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতার সঙ্গে নজরুলের নিত্য যোগাযোগ। জীবনে সে কখনও এই রকম দাঙ্গা দেখে নি। তাই, কলকাতার দাঙ্গা তাকে অত্যন্ত বিচলিত ক'রে তুলল। তার তখনকার লেখা হতে তা বোঝা যায়। এই দাঙ্গা প্রথমে ক'দিন হয়ে মাঝে ক'দিন বন্ধ থাকল। তার পরে আবার ক'দিন হয়ে আবার ক'দিন বন্ধ থেকে তৃতীয় বার শুরু হলো। তৃতীয় বার ক'দিন চলার পরে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। পরম সৌভাগ্য এই ছিল যে গ্রামের দিকে কিংবা অন্য কোনো শহরে এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু কলকাতায় বাস ক'রে আমাদের মনে হয়েছিল যে এই নগরের লোকেরা অতি-মুসলমান কিংবা অতি-হিন্দু হয়ে গেছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলি প্রতিদিন সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছিল। মৌলবী মনীরুজ্জমান ইস্‌লাম আবাদী সেই কয়জন মুসলমানের একজন যাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি উদার ও অসাম্প্রদায়িক লোকরূপে পরিচিত ছিলেন। এক সময়ে "সোলতান" নামে তাঁর একখানা বাঙলা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল এবং বহুকাল আগে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দাঙ্গার সময়ে হঠাৎ এক সকালে এই কাগজের ছোট্ট একটি দৈনিক সংস্করণ বা'র হয়ে গেল এবং বা'র করলেন আলী আহ্‌মদ ওলী নামে তাঁর একজন স্নেহাস্পদ ব্যক্তি। কী সাম্প্রদায়িক বিষই না ছড়িয়েছিল এই "সোলতান"। দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা"র তখন বাঁচা-নাবাঁচার ধুকপুক চলেছিল। দাঙ্গার দৌলতে কাগজখানা দাঁড়িয়ে গেল। এই দাঙ্গা ছড়ানোর অপরাধে দু'একখানা কাগজের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও হচ্ছিল। "সোলতানে"র আলী আহ্‌মদ ওলীর ও হিন্দী সাপ্তাহিক "মাৎওয়ালা"র সম্পাদকের পনের দিনের, না, এক মাসের (ঠিক মনে নেই) সশ্রম কারাদণ্ড হলো। জেলখানায় তাঁদের দু'জনকেই যখন ঘানিতে জুড়ে

কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

দেওয়া হলো তখন দু'জনই সেখানে এক হয়ে জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। মোটের ওপরে, আমাদের তখন মনে হয়েছিল যে ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডের দোতলার উত্তর-পশ্চিম কোণের দু'খানা কামরার বাশিন্দা 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের' আমরা ক'টি হিন্দু-মুসলমান নামধারী লোক ছাড়া বুঝি কলকাতায় অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির লোক আর নেই। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটা কুলিয়েছিল আমরা দাঙ্গার বিরুদ্ধে যুঝেছিলেম। আমাদের কাগজে দাঙ্গার বিরুদ্ধে আমরা তো লিখছিলামই, তা ছাড়া উর্দুতে ইশ্‌তিহার ছাপিয়ে উর্দুভাষী লোকেদের ভিতরে তা ছড়িয়েছিলেম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতে ইংরেজি ইশ্‌তিহারও আমরা বেঁটেছিলেম। এই ইশ্‌তিহারখানা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে ছাপানো হয়েছিল। তা প'ড়ে প্রেসের মালিক এবং আনন্দবাজার পত্রিকারও অন্যতম মালিক শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার সুরে আমায় বলেছিলেন, "আপনারা মশায় মহাপ্রাণ ব্যক্তি, আর আমরা হলাম অল্পপ্রাণ লোক!" শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সভ্য ছিলেন। দাঙ্গার বিরুদ্ধে তিনিও আমাদের সঙ্গে খেটেছিলেন। পাড়ার গরীব মুসলমানদের তাঁদের, অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ীর ভিতরে আশ্রয় দেওয়ায় তাঁদের বাড়ীও হিন্দুরা আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস ও ফৌজ এসে গিয়েছিল।

সাম্প্রদায়িকতার এই বিশ্রী আবহাওয়ায় কৃষ্ণনগরে তিনটি সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। নজরুলের দিনগুলি কাজে ভরা। এতটুকুও অবকাশ নেই তার। সে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলছিল, অন্য অনেক কাজও তাকে করতে হচ্ছিল। তিনটি সম্মেলন ছিল যথাক্রমে :

(১) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, অর্থাৎ প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন ; (২) ছাত্র সম্মেলন ; (৩) যুব সম্মেলন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন কলকাতা

হাইকোর্টের ব্যারিস্টার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল। ছাত্র সম্মেলনের সভাপতির কাজ করতে রাজী হয়েছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তিনি সে বছর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসেরও সভাপতি ছিলেন। আর, যুব সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন মানিকতলা বোমার মামলার শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন ইংরেজি দৈনিক "ফরওয়ার্ডে"র এসিস্ট্যাণ্ট এডিটর। সেই সময়কার দৈনিক পত্রিকা হতে জানতে পারা যায় যে এই তিনটি সম্মেলন ছাড়া, আরও একটি সম্মেলন কৃষ্ণনগরে হয়েছিল—কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন। এর সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন উত্তরপাড়ার শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু খবরের কাগজের রিপোর্ট হতে জানতে পারা যায় যে তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অমরবাবুর উল্টো মতের লোক।

একথা বলাই বাহুল্য যে প্রাদেশিক সম্মেলনই ছিল মোক্ষম সম্মেলন। অন্য সম্মেলনগুলি এই প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষেই হয়েছিল। নজরুল ইস্‌লামকে এই সকল সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্যে এত বেশী কাজ করতে হচ্ছিল যে তার কোনো অবকাশই ছিল না। তবুও সে প্রথম তিনটি সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত শুধু রচনা করেনি, সেই সঙ্গীতগুলিতে সুর দিয়েছিল এবং সম্মেলনগুলিতে গানগুলি সে গেয়েওছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্যে সে লিখেছিল "কাণ্ডারী হুশিয়ার"। বাঙলা ভাষার এই অপূর্ব কোরাস্ সঙ্গীতটি এই ভাবে শুরু হয়েছিল :

কোরাস্ :—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার !

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?

কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ,
কাণ্ডারী আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!
'হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম'? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

* * * *

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তাঁর "সঙ্গীতে কাজী নজরুল ইস্‌লাম" শীর্ষক প্রবন্ধে এই গান সম্বন্ধে লিখেছেন, "গানের সত্যিই তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। এটি বাংলা দেশের একটি অত্যুৎকৃষ্ট কোরাস্‌ সঙ্গীত।" কিন্তু তিনি যে লিখেছেন, "সুভাষ বসুর দ্বারা উপরুদ্ধ হয়ে" নজরুল গানটি লিখেছিল এটা ঠিক কথা নয়। কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল ১৯২৬ সালের ২২শে ও ২৩শে মে তারিখে। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু তখন বার্মার জেলে বন্দী ছিলেন। তার প্রায় এক বছর পরে ১৯২৭ সালের ১৬ই মে তারিখে বাঙলা সরকার তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তি দেন। কাজেই, "কাণ্ডারী হুশিয়ার" রচনার জন্যে নজরুল তাঁর দ্বারা 'উপরুদ্ধ' হতেই পারে না। হিন্দু সংগঠন ও মুস্‌লিম তন্‌জীমের (তন্‌জীম মানেও সংগঠন) কাজ-কর্মের ভিতর দিয়েও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছিল। "কংগ্রেস কর্মী-সঙ্ঘ" হতেও সাম্প্রদায়িকতার কম ইন্ধন জোগানো হচ্ছিল না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এই সঙ্ঘ

গড়েছিলেন। এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী হতে তাঁরা সি. আর. দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টকে বাতিল করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারেরই সহায়ক হয়েছিল। এই জঘন্য আবহাওয়াকে ও সত্যকার দাঙ্গাকে সামনে রেখেই নজরুল ইস্‌লাম তার "কাণ্ডারী হুশিয়ার" রচনা করেছিল। এই গানে তার গভীর অনুভূতি ও অদ্ভুত শব্দ চয়ন ও বিন্যাস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে নজরুল রচনা করেছিল তার "ছাত্র দলের গান" :

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান,
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।
আমরা ছাত্রদল।

* * * *

কৃষ্ণনগর যুব সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত নজরুলের "চল্ চল্ চল্" গানটি শুরু হয়েছে এইভাবে :—

কোরাস্ :— চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

* * * *

ঢাকা হতে একটি দাবী আছে যে "১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা মুস্লিম সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। কবি নজরুল ইস্লাম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন; সেই উপলক্ষেই 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি রচনা করেন।" (নজরুল রচনা-সম্ভার, ১৮৭ পৃষ্ঠা)। এই দাবী যদি সত্য হয় তবে ১৯২৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনগর যুব-সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে নজরুল কোন্ গানটি রচনা করেছিল? এতটুকুও সন্দেহ নেই যে এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতও নজরুলই রচনা করেছিল। কৃষ্ণনগরের সেই সময়ের যুবক ও ওপরের ক্লাসের কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা আজও বেঁচে আছেন তাঁদের দৃঢ় মত এই যে "চল্ চল্ চল্" কৃষ্ণনগর যুব সম্মেলনেরই উদ্বোধন সঙ্গীত। ১৯২৬ সাল আর ১৯২৮ সালের মধ্যে তফাৎ বড় বেশী। এটা কেন হতে পারে না যে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় মুস্লিম সাহিত্য-সমাজের সম্মেলনেও নজরুল "চল্ চল্ চল্"ই গেয়েছিল! এমন তো কত ঘটেছে। আমার নিজের দিক থেকে অসুবিধা এই ছিল যে আমি শুধু সেই সময়ে কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনেই গিয়েছি, অন্য সম্মেলনগুলিতে যাইনি। যদিও নজরুলের বাড়ীতেই আমি ছিলেম তবুও কোন্ সময়ে সে বাড়ীতে আসত, আর কখন সে বা'র হয়ে যেতো তার খবর আমি রাখতাম না। তার ফুরসৎ মোটেই ছিলনা। কিন্তু কৃষ্ণনগরে ১৯২৬ সালে যাঁরা যুবক ছিলেন তাঁদের কথাই আমি বিশ্বাস করি যে সেখানকার যুব সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে "চল্ চল্ চল" গানটিই নজরুল লিখেছিল। সুলেখক ও গ্রন্থকার শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তও আমায় এই খবর পাঠিয়েছেন। তিনি কৃষ্ণনগরের লোক, কৃষ্ণনগর কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে ছাত্র ও যুব সম্মেলনগুলির সঙ্গে তিনি তখন যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া, নজরুলের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন সম্মেলন উপলক্ষে, বিশেষ করে প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে নজরুল ইস্‌লাম ভলান্‌টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলেছিল। তাকে সাহায্য করার জন্যে শ্রীহেমন্তকুমার সরকার (প্রাদেশিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী) তার (নজরুলের) বন্ধু মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়কেও কৃষ্ণনগরে নিয়ে গিয়েছিলেন। পুরনো দিনের "অমৃতবাজার পত্রিকা" হতে জানা যায় যে প্রাদেশিক সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার আগের দিন (২১শে মে, ১৯২৬) "কাজী নজরুল ইস্‌লাম ফিল্ড মার্শালের পোশাক পরে ভলান্‌টিয়ার বাহিনীর পরিচালনা করেছিলেন।" কিন্তু এই সবই তো হচ্ছিল, গোলমাল ছিল আসল ব্যাপারে। প্রাদেশিক সম্মেলন হওয়া সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। কংগ্রেসের ভিতরে গঠিত স্বরাজ পার্টি চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তিন বছর আগে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনে হিন্দু-মুস্‌লিম প্যাক্ট বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস করেছিল। এই প্রস্তাবে মুসলমানদের মধ্যে একটি বড় সংখ্যা খুশী হয়েছিলেন। এই প্যাক্টকে ঠাট্টা করে পরে নজরুল কিন্তু কবিতা লিখেছিল।

> বদ্‌না-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্‌টের আশনাই
> মুসলমানদের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥

তার বিবেচনায় এই প্যাক্ট ছিল অবাস্তব ব্যাপার। প্যাক্টে মুসলমানদের বেশী চাকরী পাওয়া ও আরও কি কি অধিকার পাওয়ার কথা ছিল। এই জিনিসটা হিন্দুদের খুব বেশীর ভাগ লোক গ্রহণ করতে পারেন নি। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা "কংগ্রেস কর্মী-সঙ্ঘ" নাম দিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। প্যাক্টের বিরুদ্ধে তাঁরা যে প্রচার করছিলেন সেটা যে সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিল সে কথা আগে বলেছি। আবার, বাঙলা দেশে বড় বড় কংগ্রেস নেতারা যে নেতা হয়েছিলেন তা এই কর্মীদেরই কল্যাণে! সব নিয়ে ব্যাপারটি বড় ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-সংগঠন ও মুস্‌লিম তন্‌জীমের

কথাও আমি আগে উল্লেখ করেছি। কৃষ্ণনগর সম্মেলনের আগেই এপ্রিল মাসের শুরুতে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। দাঙ্গা থেমে থেমে হচ্ছিল। সম্মেলনের পরেও দাঙ্গা অনেকদিন চলেছিল।

কংগ্রেসের ভিতরে যাঁরা স্বরাজ পার্টির সভ্য ছিলেন তাঁরা হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একান্তভাবে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্মী-সঙ্ঘসহ বেশীর ভাগ হিন্দু প্যাক্টকে নাকচ করার জন্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এর মধ্যে প্রাদেশিক সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। তিনি তাঁর লিখিত অভিভাষণে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের তীব্র সমালোচনা করলেন। তিনি যদি তাঁদের ত্যাগ ও দেশপ্রেমের কথা স্বীকার ক'রে তাঁদের কর্মপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করতেন তা হলে তাঁর অভিভাষণ নিয়ে তত গোলমাল হয়তো হতোনা। তা না ক'রে তিনি তাঁদের একেবারেই নস্যাৎ ক'রে দিয়েছিলেন। কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নাকি মেদিনীপুরে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর নিকট হতে টাকা চেয়েছিলেন। টাকা না দেওয়ায় তাঁকে ভয় দেখিয়ে নাকি তাঁর নিকটে পত্রও লিখেছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় ভালো কথাও তিনি বলেছিলেন। বিপ্লবের ভিতর দিয়েই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ সম্ভব একথাও বলেছিলেন তিনি। অবশ্য, বিপ্লবের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেননি। কন্‌ফারেন্সে এই নিয়ে ভীষণ গোলমাল শুরু হয়ে গেলো। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কৃষ্ণনগরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সে বছর সারা-ভারত কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি সম্মেলনে একটি ভাবগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে সকলকে খানিকটা শান্ত করলেন। শাসমল চলে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি এসে আবার তাঁর আসনে বসলেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা হতে গোলমাল আবারও শুরু হলো। এবারে শাসমল সাহেব একেবারেই চলে গেলেন। তখন সকলের অনুরোধে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সভাপতির আসনে বসে

বক্তৃতার পর বক্তৃতাই কেবল শুনে গেলেন। তার পরে তিনিও চলে গেলেন সভা ভেঙে দিয়ে। তা সত্ত্বেও ব্যারিস্টার মিস্টার জে. চৌধুরীকে সভাপতি করে বক্তৃতা চলতে লাগল। হিন্দু-মুস্‌লিম প্যাক্টকে নাকচ করে প্রস্তাবও পাস হলো। মুস্‌লিম প্রতিনিধিরা, বিশেষ ক'রে কুমিল্লার আশরাফ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী প্যাক্টকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ বক্তৃতা করেছিলেন। কিন্তু মুস্‌লিম প্রতিনিধিরা এটা বুঝলেন না যে প্যাক্ট আগেই বানের জলে ভেসে গিয়েছিল। সেটা কাগজে-পত্রে যদি থেকেও যেতো তার কোনো মূল্য থাকত না।

সম্মেলনে প্যাক্ট নাকচ করার জন্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি দৈনিক "ফরওয়ার্ডের"র এসিস্ট্যান্ট এডিটর ছিলেন ব'লে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অভিভাষণের কপি আগেই পেয়েছিলেন। কাজেই, তিনি কলকাতা হতে তৈয়ার হয়েই গিয়েছিলেন যে দরকার হলে কৃষ্ণনগরের সম্মেলন ভেঙে দিবেন। সি. আর. দাশের হিন্দু-মুস্‌লিম প্যাক্ট নাকচ ক'রে দেওয়ার জন্যে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা বদ্ধপরিকর তো ছিলেনই, তার ওপরে বীরেন শাসমল তাঁর অভিভাষণে লিখে বসলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য। এই শাসমল ছিলেন আবার স্বরাজ দলভুক্ত লোক যাঁরা প্যাক্টকে জীইয়ে রাখতে চান!

সম্মেলনে প্যাক্টকে নাকচ করে প্রস্তাব পাস হওয়া মাত্রই আমি একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেম। আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীমাখন সেন এসে উপেন বাবুকে জড়িয়ে ধ'রে তাঁর মুখে চুমো খেলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলভুক্তির দিক থেকে তাঁরা পরস্পর বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন।

নজরুল ইস্‌লাম এত ক'রে তার 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' সম্মেলনে গাইল বটে, কিন্তু তার আবেদন সকলের হৃদয়ে পৌঁছালনা। দেখতে পেলাম সম্মেলনে একখানা ছোট্ট ইশ্‌তিহার হাতে হাতে

বাঁটা হচ্ছে। আবদুল হালীম আর আমি দাঁড়িয়েছিলেম। আমাদেরও তার একখানা দেওয়া হলো। জঘন্য ধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ভরা ছিল সেই ইশ্‌তিহারখানা,—যে-হিন্দু-মুস্‌লিম দাঙ্গা তখনও কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল তাকে কলকাতার বাইরেও ছড়িয়ে দেওয়ার আবেদন ছিল তাতে। পড়েই আমি বুঝলাম কোথা থেকে এই ইশ্‌তিহারের উৎপত্তি হয়েছে। কলকাতায় একজন যুবককে প্রায়ই রাস্তায় দেখতাম। এক পথেই তাঁকে বরাবর যেতে দেখতাম। কে তিনি, কোথায় থাকেন, কি নাম তাঁর তার কিছুই আমি জানতাম না। তবুও তাঁর মুখ আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণনগরে হাই স্ট্রীট ধ'রে যখন আমরা রাজবাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেম (রাজবাড়ীতেই সম্মেলনের অধিবেশন হচ্ছিল) তখন দেখলাম সেই যুবক একটা প্রেসের সামনে ধীরে ধীরে পায়চারি করছেন। কলকাতার একজন যুবককে সম্মেলন উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে এসে একটা ছোট ছাপাখানার সামনে পায়চারি করতে দেখে আমাদের মনে সন্দেহ হলো। ব্যাপারটি বোঝার জন্যে দূরে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। দেখলাম তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রেসের ভিতরে ঢু'কে পড়লেন। এই প্রেসটি ছিল হাই স্ট্রীট আর কোর্টের রাস্তার সঙ্গম স্থলে। সম্ভবত প্রেসের নাম ছিল ভাগবৎ প্রেস, আর শুনেছি মায়াপুরের সাধুরা ছিলেন তার মালিক। হাই স্ট্রীটের নাম এখন হয়েছে ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড এবং কোর্টের দিকের রাস্তার নাম হয়েছে মনোমোহন ঘোষ স্ট্রীট। সম্মেলনে ইশ্‌তিহারখানা হাতে পেয়ে আমার মনে আর কোনো সন্দেহই থাকল না যে তার পেছনে রয়েছেন কলকাতায় সেই যুবক। কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর সম্বন্ধে খবর নিয়ে ও তাঁর অন্য সব কাজের ওপরে নজর রেখে আমাদের সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

পরে কার্যসূত্রে সেই যুবকের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সাময়িক উত্তেজনার ফলে অনেকেরই মাথা খারাব হয়ে যায়। তাঁরও তাই হয়েছিল। রাজনীতির দিক হতে যদিও তিনি

আমার মত মানেন না, তবুও তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। এখনও তিনি আমার বন্ধু, যদিও আমার বার্ধক্যের কারণে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ আর তেমন হয় না। কলকাতার সমাজে আজ তিনি একজন সুপরিচিত মান্যগণ্য ব্যক্তি।

কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মেলনে যা ঘটে গেল তার আঘাত এসে কলকাতায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতেও লাগল। প্রাদেশিক কমিটি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। যে-পক্ষ আলাদা হলেন তার সেক্রেটারী হলেন ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্ত। হ্যারিসন রোডের মাধব ভবনে স্থাপিত হলো তার আফিস। ক'মাস পরে মাওলানা আকরম খানের সালিসির ফলে ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন হলে একটি সভা হয়ে দু'টি কমিটি আবার এক এক হয়ে গিয়েছিল।

সম্মেলন ইত্যাদির ঝামেলা মিটে যাওয়ার পরে নজরুল ইস্‌লাম কৃষ্ণনগরে একটি ভালো বাড়ী পেয়ে সেই বাড়ীতে উঠে গেল। বাড়ীটি ছিল স্টেশন রোডের ধারে। একতলা ছোট বাড়ী হলেও খুব চৌড়া ছিল তার বারান্দা। পাশে আমের বাগান ছিল এবং এত বেশী খোলা ময়দান ছিল যে তাকে বাগান বাড়ীও বলা যায়। বাড়ীর মালিক ছিলেন একজন খ্রীস্টান মহিলা। নিকটেই ছিল "দত্ত-নিবাস"—বিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্তের বাড়ী। এই জায়গাটা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ সড়ক ইলাকা। শ্রমজীবী খ্রীস্টান ও মুস্‌লিমদের বাস এই ইলাকায়। নজরুলের উপন্যাস "মৃত্যুক্ষুধা" এই পরিবেশেই লেখা হয়েছিল। তার পুত্র বুলবুল ১৯২৬ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে এই বাড়ীতেই জন্মেছিল।

১৯২৬ সালে এই বাড়ীতে আসার পরে নজরুল ইস্‌লাম আরও একটি কাজ করে বসল। সে প্রার্থী হলো কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে। তার জীবনে অনেক অবিবেচনার কাজের মধ্যে এটাও ছিল একটি। সমস্ত ঢাকা বিভাগ (ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জিলাকে নিয়ে ছিল এই বিভাগ) হতে কেন্দ্রীয় আইন-

সভায় মুসলমানদের জন্যে দুইটি আসন রক্ষিত ছিল। শুধু মুসলিম ভোটাররা ভোট দেওয়ার অধিকারী। প্রত্যেক ভোটার দুইটি করে ভোট দিতে পারতেন। ভোটারের মোট সংখ্যা ছিল ১৮,১১৬ জন। সম্পত্তির ভিত্তিতেই তখন শুধু লোক ভোটার হতে পারতেন। এই

কেন্দ্রীয় আইন-সভায় নির্বাচন-প্রার্থী নজরুল

জাতীয় সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের, অর্থাৎ স্বরাজ পার্টির তেমন মন ছিল না। তবুও তাঁরা তাদের তরফের নাম এই সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কাঁঠাল ভাঙলেন কাজী নজরুল ইস্‌লামের মাথায়। মোট প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন পাঁচ জন:

(১) মুহম্মদ ইস্‌মাইল চৌধুরী (বরিশালের জমীদার)
(২) আবদুল হালীম গজনবী (তখনও নাইট হননি)
(৩) আবদুল করীম (স্কুলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর)
(৪) কাজী নজরুল ইস্‌লাম
(৫) মফীজ উদ্দীন আহ্‌মদ

১৯২৬ সালের ২৮ শে অক্টোবর তারিখে কৃষ্ণনগর হতে নজরুল ইস্‌লাম কলকাতায় এলো। তার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা করা। সে আর কার কার সঙ্গে দেখা করেছিল তা জানিনে, তবে পুরো বিকাল বেলাটা সে কাটাল ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে। সন্ধ্যার সময় তিনি তাকে তিন শ' কয়েক টাকা দিলেন সম্ভবত তাঁর সে অপরাহ্নে-পাওয়া পুরো ফিসের টাকাটা। এই টাকাটা নিয়ে সে ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডে আমাদের আস্তানায় এলো এবং সেই রাত্রি আমাদের সঙ্গে থাকল। আমি তাকে বোঝালাম যে প্রার্থী হওয়ার সময়ে সে আমার মতো লোকেদের মত নেওয়া দরকার মনে করেনি। সে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, এখন যেন সে আর না এগোয়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন, কয়েকটি জিলা নিয়ে আসন, হাজার হাজার টাকা খরচ করা আবশ্যক। ডক্টর রায় তাকে দিয়েছেন মাত্র তিনশ' ক' টাকা।

এই টাকা নিয়ে কোনো পাগলও নির্বাচনে লড়ার কথা ভাবতে পারে না। আমি তাকে আরও বোঝালাম যে দেশে তার মান সম্মান আছে। এই ভাবে খালি হাতে নির্বাচনের লড়াই লড়তে গিয়ে সে কেন দেশের সামনে খেলো হবে। অবশ্য, কংগ্রেস যদি টাকা জোগাত তা হলে তরুণ সম্প্রদায়ের সাহায্য নিয়ে নজরুল একবার নির্বাচনে লড়ে দেখতে পারত, যদিও ভোটের দিক থেকে তরুণরা ছিলেন নিঃস্ব, ভোটের আসল অধিকারী ছিলেন তাঁদের বাবারা। নজরুল তখন রাজী হলো যে আর সে এগুবে না।

আবদুল হালীমের (গজনবী সাহেব নন, আমাদের কমরেড) স্বাস্থ্য খারাব হয়ে গিয়েছিল। আমারও বারে বারে জ্বর হচ্ছিল। রাত্রে নজরুল বলল, "আমি তো আর এখন কৃষ্ণনগর হতে বাইরে যাচ্ছি না। তোমরা দু'জন কাল সকালে আমার সঙ্গে চল ক'দিন থেকে আসবে সেখানে।"

শাম্‌সুদ্দীন হুসয়নের মৃত্যু

২৯শে অক্টোবরের ভোরে হালীম আর আমি নজরুলের সঙ্গে কৃষ্ণনগরে গেলাম। সারা দিন সেখানে কাটালাম। রাত্রে কলকাতা হতে টেলিগ্রাম পেলাম যে শাম্‌সুদ্দীন হুসয়ন মৃত্যু-শয্যায়, আমরা যেন কলকাতা ফিরে যাই। সে-রাত্রে আর ট্রেন ছিল না। ভোরের দিকে প্রথম যে ট্রেন পাওয়া গেল তাতেই আমরা কলকাতা ফিরে এলাম। এসে দেখলাম যে খবর পেয়ে কুত্‌বুদ্দীন সাহেব আমাদের আফিসে এসেছেন, হালীমের ছোট ভাই আবুল কাসেমও সেখানে উপস্থিত। একটি কাজের উপলক্ষে শাম্‌সুদ্দীন হুসয়ন সাহেব চুঁচুড়া গিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগর যাওয়ার সময়ে তাই আমরা জেনে গিয়েছিলেম। এসে শুনলাম চুঁচুড়া হতে তিনি একটি গ্রামে তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে এমন কঠোর অসুখে পড়েছেন যে তাঁকে আর কোথাও সরানো যাচ্ছে না। হালীম আর কাসেম সেই মুহূর্তেই হাওড়া স্টেশনে রওয়ানা হচ্ছিল, তখনই টেলিগ্রাম এলো যে শাম্‌সুদ্দীন

হুসয়ন সাহেব মারা গেছেন, মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্যে তাঁদের গ্রামে (বীরভূম জিলার কীর্নাহারের নিকটে শরভাঙ্গা গ্রামে) আনা হচ্ছে। নিশ্চিত খবর পেয়ে ওরা দু'ভাই তখন কীর্নাহার যাওয়ার জন্যেই হাওড়া স্টেশনে গেল। হালীম কীর্নাহারের সরকার-জমীদারদের বাড়ীতে পাঠানোর জন্যে একখানা টেলিগ্রাম এই মর্মে লিখে দিল যে তারা ওমুক ট্রেনে পৌঁছাচ্ছে। ততক্ষণ যেন মৃতদেহ কবর না দেওয়া হয়। এই টেলিগ্রামটি পাঠাবার জন্যে আমিও তাদের সঙ্গে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গেলাম। কীর্নাহারে তখন পোস্টাল টেলিগ্রামের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, রেলওয়ের টেলিগ্রাম ছিল। রেলওয়ের টেলিগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন হতে পাঠালে তাড়াতাড়ি যায়। সরকার জমীদারদের বাড়ী রেলওয়ে স্টেশনের খুবই নিকটে ছিল।

যে-গ্রামে শাম্‌সুদ্দীন সাহেব মারা গেলেন তার ত্রিসীমায় কোনো ডাক্তার ছিলেন না। অবস্থা এমন খারাব হয়েছিল যে তাঁকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারও কোনো উপায় ছিল না। অতএব তিনি কোনো অস্ত্র চিকিৎসকের সাহায্য (তাই তাঁর প্রয়োজন ছিল) না পেয়েই বিঘোরে মারা গেলেন। রোগের বিবরণ শুনে এই ধারণাই হয়েছিল যে তাঁর এপেণ্ডিক্সে ফোড়া হয়ে তা পেকে গিয়েছিল এবং সেই ফোড়া ফেটে যাওয়ার কারণেই তিনি মারা গেলেন। নজরুলের কলকাতা আসার ও তার সঙ্গে আমাদের (হালীম ও আমার) কৃষ্ণনগরে যাওয়ার সঠিক তারিখ এখানে দিতে পারলাম এই কারণে যে শাম্‌সুদ্দীন সাহেবের মৃত্যুর ঠিক লাগালাগি আগে এই আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটেছিল। একজন সহকর্মীর হঠাৎ মরার খবর পেয়ে নজরুল মর্মাহত হয়েছিল। সে হালীমকে যে সুদীর্ঘ ভাবপ্রবণ পত্র লিখেছিল তা থেকেই তার মনের অবস্থা বোঝা গিয়েছিল।

শাম্‌সুদ্দীন হুসয়ন সাহেবের অকাল মৃত্যুতে আমাদের আন্দোলনের অশেষ ক্ষতি হয়েছিল। তিনি আগে কয়েকটি হাইস্কুলে

শিক্ষকতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনেও তিনি শিক্ষকতা করেছিলেন। ছোট ভাই আবদুল হালীমের রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে তিনি আমাদের আন্দোলনে এসেছিলেন।

আমার সঙ্গে নজরুলের পাকা কথাই হয়ে গিয়েছিল যে ওই রকম খালি হাতে সে কিছুতেই আর নির্বাচনের লড়াইয়ে এগিয়ে যাবে না। কিন্তু দু' চার দিন যেতে না যেতেই কা'রা পূর্ববঙ্গ হতে টেলিগ্রাম করলেন যে তাকে নির্বাচনের কাজে এগিয়ে যেতেই হবে। না গেলে নাকি মান বাঁচবে না। নজরুল গেল এবং নিজেকে কিছু দেনায় জড়িয়ে কৃষ্ণনগরে ফিরে এল। মুহম্মদ ইস্‌মাইল চৌধুরী ও আবদুল হালীম গজনবী জিতেছিলেন। নজরুল ও মফীজউদ্দীন জামিনের টাকাও হারিয়েছিলেন।

১৯২৬ সালে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে নজরুল ইস্‌লামকে একান্তভাবে বিচলিত করেছিল তার কথা আগে বলেছি। এই দাঙ্গা উপলক্ষে যে-সব কবিতা ও প্রবন্ধ সে লিখেছিল সে-সবের উল্লেখ আমি এখানে করব।

হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ

শিরোনাম দিয়ে সে লিখেছিল :

মাভৈঃ মাভৈঃ এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান!
ছিল যারা চির মরণ আহত
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা-জাগ্রত,
খালেদ আবার ধরিয়াছে অসি, অর্জুন ছোড়ে বাণ!
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান।

* * * *

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শক্র-দুর্গ গুঁড়া!
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,
চিনিবে শক্র, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে তো তবু—বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া!

পথের দিশা শীর্ষক কবিতাও এই দাঙ্গা উপলক্ষে লেখা। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় নামে যশোহরের একটি কিশোর অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে স্কুল হতে বের হয়ে এসেছিল। সে-ই কিছু বড় হয়ে "অগ্রদূত" নামক একখানা কাগজ বা'র করেছিল। নজরুলের 'পথের দিশা' এই কাগজের জন্যে লেখা।

চার দিকে এই গুণ্ডা এবং বদ্‌মায়েশির আখড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চলতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?
পারবি যেতে ভেদ ক'রে এই চক্র-পথের চক্রব্যূহ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু কোন্ অভিযান করবি, শুনি?

১৯২৬ সালে ইংল্যাণ্ডের জেনেরেল ধর্মঘট উপলক্ষেও নজরুল ইস্‌লাম **'যা শক্র পরে পরে'** নাম দিয়ে কবিতা লিখেছিল। এই কবিতার ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিক ভ্রাত্রীয়তা ফুটে না উঠে তাতে প্রকাশ পেয়েছে শুধু জাতীয়তাবাদ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথাকে বাদ দিয়ে সে এই কবিতাটিও লিখতে পারে নি। কবিতাটি প্রথমে বর্ধমানের "শক্তি" পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল (আশ্বিন, ১৩৩৩)। তা থেকে ১৯২৬ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখের "গণবাণী"তে তা উদ্ধৃত হয়েছিল। এখানে তার খানিকটা তুলে দিলাম:

ঘরে সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুসলেমিন !
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবেনা, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন।

ধর্ম কলহ রাখ দুদিন !
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডুষ ফের করিবি কাঁচিয়া
আসিবে না ফিরে এই সুদিন।
বদনা গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি,
কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ
সিংহ যখন পঙ্কলীন !

*　　*　　*　　*

দাঙ্গা উপলক্ষে নজরুল শুধু কবিতাই লেখেনি, লিখেছিল প্রবন্ধও। তার 'মন্দির ও মস্‌জিদ' শীর্ষক লেখাটি ১৯২৬ সালের ২৬শে আগস্ট তারিখের "গণবাণী"তে ছাপা হয়েছিল। আর, তার 'হিন্দু-মুসলমান' লেখাটি ছাপা হয়েছিল তার পরের সপ্তাহের "গণবাণী"তে, অর্থাৎ ১৯২৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে। এই লেখা দু'টি এখানে তুলে দিতে পারতাম বটে, কিন্তু আমার এই স্মৃতিকথা বড় হয়ে যাচ্ছে বলে সেই লোভ সংবরণ করলাম।

কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়ক এলাকায় উঠে আসার পরে শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের সহযোগে নজরুল একটি শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। খবর পেলাম এই বিদ্যালয়টি নাকি এখনও আছে। তবে, তার নাম নাকি তারকদাস বানার্জি বিদ্যালয়, না, বিদ্যাপীঠ হয়েছে !

শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয়

নজরুল যে বাড়ীতে থাকত তার সংলগ্ন সমস্ত খোলা জায়গা (বাড়ীটি সহ) বি. এন. এলিয়াস কোম্পানী কিনে নিয়ে ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস তৈয়ার করেছেন। বাড়ীটি এখনও সেই রকমই আছে।

এই বাড়ীতে থাকার সময়েই নজরুল ১৯২৭ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে বুলবুলের মুখে ভাত দিয়েছিল। এই উপলক্ষে সে কলকাতার ও স্থানীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিল। হঠাৎ ১৪ই মার্চ তারিখে দিল্লীতে আমার একটা মিটিং পড়ে গিয়েছিল বলে আমি নজরুলের নিমন্ত্রণে যেতে পারিনি।

পুরো ১৯২৬ সাল, পুরো ১৯২৭ সাল এবং ১৯২৮ সালের শেষ দিকে কোন্ মাস পর্যন্ত তা ঠিক মনে নেই নজরুলরা কৃষ্ণনগরে ছিল। তার পরে তারা কলকাতায় চলে এসেছিল। আগে হতে বাড়ী ঠিক করে তারা কলকাতায় আসে নি। আমার যতটা মনে পড়ে প্রথমে এসে তারা শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের বাসায় (জেলিয়া টোলা স্ট্রীটে ?) উঠেছিল। সেখানে অসুবিধা হওয়ায় তারা উঠে এসেছিল ১১, ওয়েলেস্‌লী স্ট্রীটের নীচের তালায়। এটা ছিল মাসিক পত্রিকা "সওগাতের" আফিস ও ছাপাখানা। এখানে তাঁদের অসুবিধা হচ্ছিল। বিশেষ ক'রে প্রমীলা তখন সন্তানসম্ভবা ছিল। নজরুল বিপদেই পড়েছিল। এই বিপদ হতে উদ্ধার করল শ্রীমান শান্তিপদ সিংহ,—আমাদের তখনকার স্নেহাস্পদ বন্ধু, নজরুলের "ধূমকেতু"র ম্যানেজার। তার সঙ্গেই নজরুলরা উঠে গেলেন ইটালী ইলাকার ৮/১, পানবাগান লেনে। দোতালা বাড়ী ছিল। উপরের তালায় নজরুলরা থাকলেন, আর নীচের তালায় থাকলেন শান্তিপদ সিংহের পরিবার। কেউ কেউ লিখেছেন আমার চেষ্টাতেই নজরুল এই বাড়ী পেয়েছিল। এটা ঠিক কথা নয়। এই বাড়ী যে নজরুলরা পেলেন তার জন্যে সকল প্রশংসা প্রাপ্য শ্রীশান্তিপদ সিংহের। এই বাড়ীতেই নজরুলের পুত্র সব্যসাচী জন্মেছিল। আমাদের ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টির আফিস ১৯২৭ সালের নবেম্বর মাসে ২/১ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে উঠে এসেছিল। নজরুলদের পানবাগান লেনের বাড়ী হতে নিকটেই বলতে হবে। কাজেই, তাদের বাড়ীতে আমাদের আসা-যাওয়া অপেক্ষাকৃত বেড়ে গেল।

নব-দিগন্ত

৮/১, পানবাগান লেনের বাড়ীতে আসার পরে কাজী নজরুল ইস্‌লামের সামনে একটি নূতন দিগন্ত খুলে গেল,—সুর ও সঙ্গীতের দিগন্ত। আমরা যতটা খবর জানতে পেরেছি শিশুকাল হতেই সে ছিল গানের পাগল। সেই রকম একটি পরিবেশই সে পেয়েছিল। তাদের বাড়ীর অঞ্চলে সাধারণ মানুষের ভিতরে গানের ও নাচের দল ছিল। সেই সকল দলের প্রভাবে সে পড়েছিল। সে নিজে এই রকম দলে যোগও দিয়েছিল। এইভাবে তার সঙ্গীত চর্চার আরম্ভ। জীবনে কোনো সময়ে সে এই চর্চা ছেড়ে দেয় নি। এম. আবদুর রহমান সংগৃহীত তথ্য * হতে জানা যায় যে শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময়ে নজরুল ইস্‌লাম তার সঙ্গীতের জ্ঞানকে উন্নততর করার সুযোগ পেয়েছিল। এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীসতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল একজন সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। নজরুলের সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় পেয়ে তিনি তাকে মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। কোনো কোনো সময়ে তিনি নিজের বাড়ীতেও নজরুলকে এই জন্যে ডেকে নিয়ে যেতেন। এই মাস্টার মশায়ের নিকট হতে সে সঙ্গীত বিদ্যায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়েছিল।

* কিশোর নজরুল : এম. আবদুর রহমান প্রণীত।

জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র হতে আমরা জানতে পারি যে পল্টনের ব্যারাকেও নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চা কোনো দিন থামে নি। সেখানে ভালো ভালো বাদ্যযন্ত্র পেয়ে সে বাজানোটাও বিশেষভাবে আয়ত্ত ক'রে নিতে পেরেছিল। সেখানেও সে সাহায্য করার লোক পেয়ে গিয়েছিল। যেমন জমাদার শম্ভু রায় হুগলী শহরের হাবিলদার নিত্যানন্দ দে'র নাম করেছেন। তিনি নজরুলকে অরগ্যান বাজানো শিখিয়েছেন। সৈনিক ব্যারাকে গানের মজলিস আবার বসত নজরুলের ঘরের সামনে। তাতে সৈনিকেরা "চালাও পানসী বেলঘরিয়া", "ঘি চপ্ চপ্ কাবলী মটর" ও "দে গরুর গা ধুইয়ে" প্রভৃতি বুলি উচ্চারণ ক'রে আনন্দে ফেটে পড়তেন।

পল্টন হতে ফিরে আসার পরেও নজরুল তার গানের চর্চা অবিরাম চালিয়ে গেছে। শুধু বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহলে জনপ্রিয় না হয়ে সে যে জনসাধারণের ভিতরেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার গানই তার প্রধান কারণ। শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তা একজন বয়স্কা ব্রাহ্ম মহিলা ছিলেন। তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের দু'একটি কবিতায় সুর দিয়ে তার স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। সে সময়ে বহু পত্রিকায় শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার স্বরলিপি ছাপা হতো। আমি নজরুলের ফৌজ হতে ফিরে আসার দু'তিন মাসের ভিতরকার কথা বলছি। একদিন শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার নিকট হতে নজরুল একখানা পত্র পেল। তাতে তিনি তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে সে যেন গানের কায়দা-কানুনের কাঠামোর ভিতরে গান লেখে। অর্থাৎ, গানকে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি ভাগে ভাগ ক'রে গান রচনা করার কথা তিনি তাকে বলেন। এইভাবে গান রচনা করলে সেই গানের সুরারোপে ও স্বরলিপি তৈয়ার করায় সুবিধা হয়, এই কথাও তিনি পত্রে লিখেছিলেন। তখনও তাঁর সঙ্গে নজরুলের মুখোমুখী পরিচয় হয়নি। সে যখন সত্যকার গান রচনা শুরু করেছিল তখন সম্ভবত শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার

উপদেশ সে মেনে চলেছিল। সম্ভবত বলছি এই কারণে যে সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো বিদ্যা নেই।

৮/১, পানবাগান লেনের বাড়ীতে নজরুল যখন বাস করতে এলো (১৯২৮ সালের শেষাশেষি হবে, মাসটা মনে করতে পারছিনে) তখন সে সঙ্গীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার রচিত গান তারই দেওয়া সুরে সুর-শিল্পীরা তখন সর্বত্র গাইছেন। বিশেষ করে, তার নূতন রচিত গজল গানগুলির জনপ্রিয়তা তখন অত্যন্ত বেশী। কিন্তু, সঙ্গীতে নজরুল ইস্‌লাম যতই প্রতিষ্ঠিত হো'ক না কেন, ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানীর নিকটে সে ছিল সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। যে-ব্যক্তি রাজনীতিতে (রাজনীতি মানেই তখন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম) যোগ দিয়েছে, তার জন্যে জেল খেটেছে, তার সঙ্গে কি করে একটা ব্রিটিশ কোম্পানী যোগ স্থাপন করতে পারে?

কিন্তু দেশের আব-হাওয়া বদলে গিয়েছিল। গ্রামোফোন কোম্পানীও ছিল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীর নিকটে চার দিক হতে জিজ্ঞাসা আসতে লাগল যে তাঁদের রেকর্ডে কাজী নজরুল ইস্‌লামের গান নেই কেন? এই রকম জিজ্ঞাসা আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সুর-শিল্পীরা যাঁর গান দেশের সব জায়গায় গেয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর গান গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে উঠবে না এটা কেমন কথা? কোম্পানীর টনক নড়ল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে কাজী নজরুল ইস্‌লামকে আরও এড়িয়ে চলার মানেই হবে ব্যবসায়ের দিক হতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। কোম্পানীর কর্মকর্তারা এই অবস্থায় যখন নজরুলের ঠিকানা জোগাড় করতে যাচ্ছিলেন তখনই তাঁরা খবর পেলেন যে তাঁদের রেকর্ডের দু'টি গান তার লেখা। সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ নজরুলের দু'টি কবিতার অংশ বিশেষে সুর দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গেয়েছিলেন। তখন তিনি কোম্পানীকে জানতে দেন নি যে এই দু'টি গানের রচয়িতা কে? জানতে দিলে কোম্পানীর কর্তারা

গান দু'টি তাঁকে গাইতে দিতেন না। এখন কিন্তু খবরটি জানতে পেয়ে কোম্পানীর কর্তারা খুশীই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতার পাওনা রয়ালটির হিসাব ক'রে দেখা গেল যে নজরুলের কয়েক শ' টাকা (কত টাকা আমার মনে নেই) পাওনা হয়েছে। এই টাকাটা তাঁরা লোক মারফতে সোজাসুজি নজরুলের নিকটে তার ৮/১ পানবাগান লেনের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন। কোম্পানীর দ্বারা সে আমন্ত্রিতও হলো যে তার গান যেন গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাইতে দেওয়া হয়। এই ভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানীর সহিত স্থাপিত হয়েছিল নজরুলের প্রথম সম্পর্ক। আর, সেই সঙ্গে খুলে গেল তার চোখের সামনে একটি নূতন দিগন্ত। নজরুল বরাবর গান গেয়েছে। গান সে লিখেও যাচ্ছিল। যতটা মনে করতে পারছি তার গানের পুস্তক "বুলবুল" তখন ছাপা হয়ে গিয়েছিল। বই হ'তে কম হোক, বেশী হোক, টাকা সে পাচ্ছিল, কিন্তু গান হতে সে টাকা পেল এই প্রথম। তার সামনে একটা নূতন দিগন্ত খুলে গেল বই কি!

ক্রমশ একান্তভাবে সুরের রাজ্যে নজরুল তো প্রবেশ করছিলই, গ্রামোফোন কোম্পানীর নিমন্ত্রণে তার প্রেরণা আরও বেড়ে গেল। তখনই তার মনে এসেছিল যে উস্তাদী গানের বিদ্যাটা সে আরও ঝালিয়ে নেবে। এই সময়েই উস্তাদ জমীরুদ্দীন খানকে তার বাড়ীতে দেখা গেল। একদিন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও নজরুল করিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নামে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন (খ্রীঃ ১৬ই কিংবা ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) তারিখে গানের পুস্তক "বন-গীতি" উৎসর্গ করতে গিয়ে নজরুল লিখেছে :

"ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাবিদ্
আমার গানের ওস্তাদ
জমীর উদ্দীন খান সাহেবের দস্ত্ মোবারকে"।

এর সঙ্গে সে যে-কবিতাটি লিখেছে তার শেষ তু' ছত্রও আমি এখানে তুলে দিলাম :

"সুর শা'জাদীর প্রেমিকপাগল হে গুণী তুমি
মোর "বনগীতি" নজরানা দিয়া দস্ত চুমি।"

'মোবারক' আরবী ভাষার শব্দ। তার মানে শুভ। 'দস্ত্‌' পারসী ভাষার কথা, মানে হাত। নজরুল যখন ১৯২৯ সালের শুরুতে উস্তাদ জমীরুদ্দীন খানের নিকট হতে গানের শিক্ষা নিচ্ছিল তখন তিনি আবার গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গীতের 'ট্রেনার'ও ছিলেন।

১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখে ধরা প'ড়ে আমি যখন আবার জেলে গেলাম তখন দেখে গেলাম যে কাজী নজরুল ইস্‌লাম সম্পূর্ণরূপে সুরের রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

নজরুল ইস্‌লাম একসঙ্গে গায়ক, সঙ্গীতের রচয়িতা ও সুর সংযোজনকারী। এই তিন গুণের সমন্বয়ে উনিশ শ'-ত্রিশের দশকে আমাদের দেশকে সে অপূর্ব অবদান দিয়ে গেছে। সুরের সৃষ্টিতে সে অভূতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সঙ্গীত রচনায় তার তুলনা নেই। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন যে নজরুল ইস্‌লাম রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা তিন হাজার। ১৯৬৪ সালে একজন বন্ধু শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট হতে শুনে এসে আমায় বলেছিলেন যে নজরুল রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজার নয়, চার হাজার। আমার যতটা মনে পড়ে নজরুল নিজেও একদিন তার গানের সংখ্যা আমায় তিন হাজার বলেছিল। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষিতে কিংবা ১৯৩৭ সালের শুরুতে নজরুল আর আমি তার বাড়ীতে একদিন একসঙ্গে খেতে বসেছিলেম। বহু বৎসর কলকাতা হ'তে আমায় অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিল ব'লে আমি অনেক কিছুই জানতাম না। সেই

জন্যে খেতে ব'সে আমি নজরুলকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে "তোমার লেখা গানের সংখ্যা কত? এক হাজার-দেড় হাজার হবে?" নজরুল উত্তরে বলেছিল যে "প্রায় তিন হাজার।" শুনে আশ্চর্য হয়ে আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেম, "বলছ কি তুমি? রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী?" সে জওয়াব দিয়েছিল যে "হাঁ"। আমি কোথাও রবীন্দ্রনাথের লেখায় পড়েছিলেম যে তাঁর লেখা গানের সংখ্যা আড়াই হাজার। যদি আমি ভুলে না গিয়ে থাকি তবে এই সময়ে নজরুল ইস্‌লাম গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের 'ট্রেনার' ও 'হেড্ কম্পোজার' ছিল। উস্তাদ জমীরুদ্দীন খানের মৃত্যু হওয়ার পরে সে-ই এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল।

সুরের রাজ্যে নজরুলের বিরাট কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে যোগ্য ব্যক্তিরা নিশ্চয় সুবিস্তৃত আলোচনা করবেন। আমার সে অধিকার নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে পরিশ্রম ক'রে তার সঙ্গীতগুলি এখন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। যে সকল সঙ্গীত কখনও কোনো পুস্তকে মুদ্রিত হয়নি সেই সঙ্গীতগুলি কোথায়? জনাব আজহার উদ্দীন খান পনের-ষোল শ' গানের প্রথম পংক্তি বিভিন্ন কোম্পানীর গ্রামোফোন রেকর্ড হতে সংগ্রহ করে ছেপেছেন। রেকর্ডে নজরুলের আরও অনেক গান আছে। আজহার উদ্দীন সাহেব সেগুলি সংগ্রহ করতে পারেন নি। পুস্তকে ছাপা হয়নি, অথচ কোনো না কোনো রেকর্ডে গাওয়া হয়েছে, এমন সব গান একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হয় তো ইতোমধ্যে নজরুলের বহু গান নিশ্চিহ্ন হয়েও গেছে। রেকর্ড যদি বাজারে চালু না থাকে তবে সেগুলি কোম্পানী নিশ্চয় নষ্ট করে দেবে। আমার বিশ্বাস এর মধ্যে অনেক রেকর্ড নষ্ট করা হয়েছে। একটি বিশেষ রেকর্ড আমি কেনার চেষ্টা ক'রে পাইনি। কোম্পানী জানিয়েছে যে তা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আজহার উদ্দীন সাহেব যে সব গানের প্রথম পংক্তি সংগ্রহ করেছেন সে-সব গানের পুরো কথাই বা কোথায়? আমরা যে বলছি নজরুল তিন-চার হাজার গান লিখেছে সেই বলার কোনো সার্থকতাই নেই যদি না সেই গানগুলি সংগৃহীত হয়। এই বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানে কি হচ্ছে তা আমি জানিনে, তবে পশ্চিম বাঙলায় এই নিয়ে কেউ যে কোনো কাজ করছেন সে খবর আমি অন্তত পাইনি। নজরুলের পুত্ররা ঢাকা হতে খবর পেয়েছে যে রাষ্ট্রের সাহায্যে পরিচালিত সেখানকার বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড (The Bengali Development Board) স্থির করেছেন যে কাজী নজরুল ইস্‌লামের সমস্ত লেখা তাঁরা চার খণ্ডে প্রকাশ করবেন। এই চার খণ্ডের ভিতরে তার গানগুলিও আছে কিনা তা জানতে পারা যায়নি। আমার মনে হয় কবির গানগুলি প্রস্তাবিত চার খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। পাকিস্তানের বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের তরফ হতে কেউ কলকাতায় কবির গানগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন ব'লে শুনিনি। এই রকম একটা প্রচেষ্টা কলকাতায় চললে কারুর না কারুর মুখে খবর পেতাম।

১৯৩৯ সালে নজরুল ইস্‌লাম তার অন্যান্য পুস্তকসহ গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাওয়া তার সমস্ত গানের রয়ালটি কলকাতা হাই কোর্টের এটর্নি শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকটে চার হাজার টাকার জন্যে বন্ধক রেখেছিল। তারপর হতে নজরুলের প্রাপ্য রয়ালটির টাকা কোম্পানী শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তকে দিয়েছেন। শ্রীদত্তের টাকা নিশ্চয় সুদে-আসলে শোধ হয়ে গেছে। কিন্তু এই বন্ধকী ব্যাপার হতে নজরুলের গানের প্রচারে কোম্পানীর বোধ হয় সমস্ত উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য, ভিতরের খবর আমি কিছুই জানি না, আমার জানার সুযোগও নেই। কিন্তু একথা সত্য যে নজরুলের গানগুলি ডুবে যাচ্ছে।

বিচ্ছিন্ন কবিতা ও গান

কামাল পাশা

"কামাল পাশা" কাজী নজরুল ইস্‌লামের একটি অভুতপূর্ব সৃষ্টি। বাঙলা ভাষায় এর কোনো তুলনা তো নেই-ই, ভারতের আর কোনো ভাষায় আছে বলেও আমি শুনিনি। কিন্তু এই কবিতায় কবির একটি অন্তত স্বেচ্ছাকৃত বিচ্যুতি আছে। আমি ঠিক জানিনা, কাব্য-রচনার সময়ে কবিদের হয় তো ঘটনা হতে বিচ্যুত হওয়ার অধিকার আছে। তবে, যে-ঘটনা কবিতা লেখার সময়ে ঘটছে সে-ঘটনা হতেও কবিরা কি বিচ্যুত হতে পারেন? সমস্ত জগতের মুস্‌লিম যুবকদের মনে তুর্কি বীর আন্‌ওয়ার পাশা একটি বীরের আসন অধিকার ক'রে ছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে নজরুলের মনেও তাঁর সেই আসন ছিল। নজরুল "আন্‌ওয়ার পাশা" নাম দিয়ে কবিতাও লিখেছে। সেই কবিতাটির ভিতর দিয়েও তার প্রবল দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। "আন্‌ওয়ার পাশা" "কামাল পাশা"র আগেকার রচনা। কিন্তু কামাল পাশার তুর্কি রাজ্যের, সাম্রাজ্যের নয়, পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের সহিত আন্‌ওয়ার পাশার এতটুকুও সংযোগ ছিল না। অথচ, কামাল পাশা কবিতায় অকারণে নজরুল আন্‌ওয়ার পাশাকেও টেনে নিয়ে এলো :—

[কামাল পাশাকে কোলে লইয়া নাচিতে লাগিল]

"হৌ হৌ হৌ কামাল জিতা রও!

কামাল জিতা রও!

ও কে আসে! আনোয়ার ভাই?—
আনোয়ার ভাই! জানোয়ার সব সাফ্!
জোর নাচো ভাই! হর্দম দাও লাফ!
আজ জানোয়ার সব সাফ!
হুর্‌রো হো! হর্‌রো হো!!"

আসলে যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এই যে প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কির পরাজয়ের পরে সে দেশের তিন জন মহান নেতা—তালাত পাশা, জামাল পাশা ও আনৃওয়ার পাশা জার্মানীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কামাল পাশা তাঁদের পরের ধাপের নেতা ছিলেন। তিনি গোপনে স্মার্নায় (এশিয়া মাইনরে) প্রবেশ ক'রে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে ও সৈন্যদল গঠন করতে লাগলেন। ইউরোপীয় তুর্কি ও স্মার্না ব্রিটিশের সাহায্যে গ্রীক দখল ক'রে নিয়েছিল। নব গঠিত সোবিয়েৎ রাষ্ট্র কামাল পাশাকে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করছিলেন। যে-সকল তুর্কি সৈন্য জারের গবর্নমেণ্টের দ্বারা বন্দী হয়েছিলেন এবং যে-সকল তুর্কি যুদ্ধের কারণে রুশ দেশে আটকা পড়েছিলেন তাঁদের সকলকে সাজিয়েগুজিয়ে সোবিয়েৎ সরকার স্মার্নায় পাঠিয়ে দিলেন। ওদিকে জার্মানীতে তুর্কি নেতাদের মনে শান্তি ছিল না। তাঁরা ভয় করছিলেন যে যে-কোনো সময়ে তাঁরা ব্রিটিশ বা আর্মেনিয়ানদের দ্বারা নিহত হতে পারেন। তাই সোবিয়েৎ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে জামাল পাশা আর আনৃওয়ার পাশা মস্কোতে আসেন। এখানে সোবিয়েৎ সরকার তাঁদের নিকট হতে জানতে চান যে তাঁরা স্মার্নায় যেতে চান কিনা। জামাল পাশা শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী হলেন, কিন্তু আনৃওয়ার পাশা রাজী হলেন না। তুর্কি ও সোবিয়েৎ সীমান্ত স্থিত "কারুর-রাজ্য-নয়" ইলাকা পার হওয়ার সময়ে আর্মেনিয়ান আততায়ীর গুলিতে জামাল পাশা মারা গেলেন। তুর্কিস্তানে তখন বিশৃঙ্খলা চলেছিল। আনৃওয়ার পাশা সোবিয়েৎ

গবর্নমেন্টের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে তিনি তুর্কিস্তানে গিয়ে সেখানকার অবস্থা শান্ত করতে চান। সোবিয়েৎ সরকার তাঁকে তাসকন্দ যাওয়ার অনুমতি দিলেন, কিন্তু খুব কড়া নজর রাখলেন তাঁর ওপরে। আন্ওয়ার পাশার ইচ্ছা ছিল যে তাঁর ছয় শ' বছর আগেকার পিতৃভূমিতে এই সুযোগে তিনি একটি তুর্কি রাজ্য স্থাপন করে নিবেন। তিনি তলে তলে প্রতিক্রিয়াশীল মুল্লা ও বে'দের (জমীদারদের) সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এবং একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন নবগঠিত তুর্কিস্তান রিপাবলিকের বিরুদ্ধে। সেই যুদ্ধে যোদ্ধবেশে মারা গেলেন আন্ওয়ার পাশা।

১৯২১ সালে নজরুল যখন কামাল পাশা রচনা করল (এটা বিদ্রোহীর আগেকার রচনা) তখন আমি ওপরে যত খবর দিলাম তত খবর জানতাম না। তবে, নানান খবরের কাগজের মারফতে, বিশেষ করে উর্দু খবরের কাগজের মারফতে এতটা আমরা নিশ্চিত জানতাম যে কামাল পাশার সঙ্গে আন্ওয়ার পাশা নেই। আমি নজরুলকে বললাম যে তার 'কামাল পাশা' কবিতা তুলনাহীন। কেন সে মিছামিছি এমন একটি কবিতায় আন্ওয়ার পাশাকে টেনে আন্ছে? যিনি সত্য সত্যই কামাল পাশার পক্ষে নেই। কিন্তু নজরুল তার এই মহান সৃষ্টিতে আনওয়ার পাশার নামটি ছুঁইয়ে রাখবেই!

নজরুল যখন "কামাল পাশা" কবিতাটি রচনা করেছিল তখনও কামাল পাশা পরিপূর্ণরূপে জয়লাভ করেন নি। কবিতাটি কিন্তু তাঁর জয়লাভেরই কবিতা। কামাল পাশা গ্রীক্দের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ অভিযান আরম্ভ করেছিলেন ১৯২২ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে এবং ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্ণরূপে বিজয়লাভ করেন।

চিয়াং কাইশেকের আগমনে

কল্যাণীয়া প্রমীলা নজরুল ইস্লামের মুখে যেমন শুনেছি:

১৯৪২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চীনের চিয়াং কাই-শেক্

সস্ত্রীক দিল্লী পৌঁছান। দিল্লী হতে রেলওয়ে ট্রেন যোগে তিনি কলকাতা এসেছিলেন এবং কলকাতা হতে তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনেও গিয়েছিলেন। সব নিয়ে দু' সপ্তাহ তিনি ভারতে ছিলেন। কলকাতা হতেই সোজা চুংকিঙে চলে যান তিনি। এই সময়ে তাঁকে ভারতে নন্দিত ক'রে একটি গান রচনা করার জন্যে ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানী নজরুল ইস্‌লামকে অনুরোধ করেছিলেন। সে তখন নীচের লেখা গানটি রচনা করেছিল।

চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক! সাম্যের জয় হোক!
ধরার অর্ধ নর-নারী মোরা রহি এই দুই দেশে,
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে,
সহিব না আর এই অবিচার, খুলিয়াছ আজি চোখ॥
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক!
সাম্যের জয় হোক!
প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের হিমালয়
(আজ) এই কথা যেন কয়—
মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীরে
ইহা কি সত্য নয়?
হইব সর্বজয়ী আমরাই সর্বহারার দল,
সুন্দর হবে, শান্তি লভিবে, নিপীড়িতা ধরাতল!
আমরা আনিব অভেদ ধর্ম নব বেদগাথা শ্লোক॥
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক!
সাম্যের জয় হোক!

সুর-শিল্পী শ্রীজগন্ময় মিত্র গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে এই গানটি গেয়েছিলেন।

"সাকী" ও নজরুল

গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ভিতরে ইরানী কবিদের "সাকী"কে নিয়ে বাঙালী কবি ও লেখকদের ভিতরে একটা অদ্ভুত ধরনের বিচ্যুতি ঘটেছে। "সাকী" আরবী ভাষার শব্দ। আরও হাজার হাজার আরবী শব্দের সঙ্গে "সাকী" শব্দটিও ইরানী (পার্সী) ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে। শব্দটি পুংলিঙ্গ। ইরানী কবিদের "সাকী" কিশোর বালক। সে যুবতী তো নয়ই, ছোট মেয়েও নয়। "সাকী"র অর্থ পানপাত্র বাহক। সাদা বাঙলা কথায় "সাকী" হচ্ছে ছোকরা চাকর। সে সেজেগুজে থাকে, মনিবের পানপাত্র এগিয়ে দেয়, হয়তো অন্য ফরমায়েশও খাটে। "সাকী"র ইংরেজি প্রতিশব্দ page। ফিউদাল যুগের ব্যাপার। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের কিছু কিছু তফাৎ থাকতে পারে।

আমাদের দেশের লোকেরা (হিন্দু-মুসলমান উভয়েই) এক সময়ে পার্সী পড়েছেন। তা থেকে "সাকী" শব্দটি তার সঠিক অর্থে বাঙলায় প্রচলিত হয়েছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখায় পানপাত্র বাহক অর্থেই "সাকী" শব্দ আছে। হঠাৎ কেন যে বাঙলায় পুংলিঙ্গ একদিন রাতারাতি স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে গেল তা জানিনে।

শ্রীরাজশেখর বসুর "চলন্তিকা"য় আরবী শব্দ "সাকী"র অর্থ দেওয়া হয়েছে 'সুরা-পরিবেশক'। শব্দটিকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয় নি। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' "সাকী"কে মেয়ে করেন নি, ছেলেই রেখেছেন। হিন্দী ভাষার বিরাট অভিধান 'হিন্দী শব্দসাগরে' "সাকী" ছেলে, মেয়ে নয়। কোনো উর্দু কবি, লেখক বা অভিধান রচয়িতা "সাকী"কে মেয়ে তো করতেই পারেন না। বিখ্যাত অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার

অভিধানে' প্রথমে "সাকী"র প্রকৃত অর্থ দিয়েছেন এবং তার ইংরেজি প্রতিশব্দ যে page সেকথাও লিখেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই বলেছেন যে শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গও বটে। তিনি নরেন্দ্র দেবের তর্জমা রুবাইয়াৎ হতে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। পুলিসের চাকরী উপলক্ষে তিনি দিল্লী ও যুক্ত-প্রদেশে (উত্তর প্রদেশে) দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন এবং উর্দু প্রাধান্যের যুগেই কাটিয়েছেন। তাঁর পক্ষে এই রকম ভুল অদ্ভুত ঠেকছে। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর সঙ্কলিত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ : : আধুনিক বাংলা ভাষার অভিধানে' "সাকী"র অর্থ লিখেছেন "মদ্যপাত্র পরিবেশক তরুণ বা তরুণী"। এটা আমার নিকটে আরও আশ্চর্য ঠেকছে। তিনি পার্সী ভাষায় একজন পণ্ডিত না হতে পারেন, কিন্তু কোনো শব্দ পুংলিঙ্গ, না, স্ত্রীলিঙ্গ তা বোঝার মতো জ্ঞান তাঁর আছে। তিনি কেন এই ভুল করলেন ? "সাকী" যে তরুণীও হতে পারে একথা বলে তিনি কি বাঙালী লেখকদের ভুল পথে চালিত করলেন না ? তিনি কেবল একজন লেখক নন, অভিধানকারও।

আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী স্তম্ভিত করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব। কাজী নজরুল ইস্‌লাম যে "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে"র বাঙলা তর্জমা করেছে তার একটি বড় ভূমিকা লিখেছেন তিনি। এই ভূমিকা পড়ে মনে হয় যে তিনি ইরানী ভাষা ভালোই জানেন। ফিরদৌসীর মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা' সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেছেন এবং বলেছেন পূর্ব গৌরবের কথা তুলে ধরে 'শাহ্‌নামা'র কবি আস্ফালন করেছেন। সৈয়দ সাহেবের কোনো লেখায় পড়েছি যে অনেক দিন তিনি ইজিপ্টেও ছিলেন। কোনো আরবী শব্দের আকৃতি হতে তা পুংলিঙ্গ, না, স্ত্রীলিঙ্গ তা বোঝার জ্ঞান তিনি নিশ্চয় সে দেশে থাকার সময়ে আয়ত্ত করেছেন। তা সত্ত্বেও 'সাকী' সম্বন্ধে নজরুলের ভুল ধরিয়ে না দিয়ে তিনি নিজেই 'সাকী'কে বলেছেন "তন্বঙ্গী তরুণী"। আরও বলেছেন 'সাকী'র সঙ্গে " 'বে থা' হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও কবিরা বড় মারাত্মক স্মৃতিশক্তিহীন।"

শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে নজরুলের দ্বিতীয় ভাষা পার্সী ছিল। হাফিজ নূরুন্নবী সেখানে তার ভালো শিক্ষক ছিলেন। তার পরে সে লিখেছে যে পল্টনে সে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের নিকটে ইরানের কবি হাফিজের কাব্য পড়েছে। হাফিজের কাব্যে কথায় কথায় 'সাকী'র নামোল্লেখ হয়েছে এবং 'সাকী' যে কিশোর বালক,—বালিকা নয়, যুবতী তো নয়ই, একথাও সে বুঝেছিল। পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব তাকে একথা কিছুতেই বোঝাতে পারেন না যে 'সাকী' কিশোর বালক নয়,—সে বালিকা বা যুবতী। কারণ, মৌলবী সাহেব শুধু তো কাব্য পড়ান নি, যে-ভাষায় কাব্য লেখা, সেই পার্সী ভাষাও তো তাঁর নজরুলকে পড়াতে হয়েছে। কাজেই, 'সাকী'র প্রকৃত অর্থ নজরুল জানত। তা' ছাড়া, আমার মনে আছে যে এই নিয়ে আমি তার সঙ্গে ১৯২৬ সালে আলোচনাও করেছিলেম। এই শব্দটিই যে পুংলিঙ্গ সেদিকেই তার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু তার মনে 'সাকী'র নারীমূর্তিই রূপ নিয়েছিল। নজরুল হয়তো কবি শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ নজরুলের ফৌজ হতে ফেরার আগেই ছাপা হয়েছিল। "কামাল পাশা"র মতো একটি অপূর্ব সৃষ্টিতে সে যেমন জেনে-শুনেও আন্ওয়ার পাশাকে অহেতুক টেনে এনেছিল ঠিক সেই রকমই সে 'সাকী'কে মেয়ের রূপ দেওয়ার জন্যে ঠিক জিদ ধরে বসে থাকল। এটাও নজরুলের একটি ইচ্ছাকৃত বিচ্যুতি।

পার্সী ভাষা ও সাহিত্যে আমার অধিকার এত কম যে সেটাকে কোনো অধিকার নয় বলেও ধরা যায়। কিন্তু এই ভাষা ও সাহিত্যের সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা অনেকেই রয়েছেন। তাঁদের এই বিষয়ে লেখা উচিত। আমাদের কবিরা ও লেখকেরা (তাঁদের বেশীর ভাগই পারসী ভাষা জানেন না) যে-ভাবে 'সাকী'কে নিয়ে মেতে উঠেছেন তাতে এদিকে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে

তাঁরা আমাদের সাহিত্যকেই বিচ্যুতি-দুষ্ট ক'রে তুলবেন। এই কাজটি পণ্ডিত ব্যক্তিদের।

ইরানের যে-যুগের কবিরা 'সাকী' নিয়ে মাতামাতি করেছেন সে যুগের ইরানকে ভালো ক'রে বুঝতে হবে। সেটা না বুঝলে 'সাকী'কে বুঝতে পারা যাবে না। পারসী সাহিত্যে 'সাকী'র ব্যাপারটাই হয় তো কল্পিত। সব কবিই কি মদ খেতেন? যাঁরা মদপান করতেন না তাঁদের 'সাকী'রা কি সরবরাহ করত? মহাকবি সাআদী তো ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁরও কি 'সাকী' ছিল? কিন্তু কিশোর বালকের প্রতি প্রেম নিবেদন তাঁরও লেখায় আছে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কথা বলুন এই সম্বন্ধে।

নজরুলের "প্রলয়োল্লাস"

১৯৫৬-৫৭ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ "বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম" নাম দিয়ে বাঙলায় একটি তথ্য চিত্র তৈয়ার করেছেন। চিত্রটি দুই-রীলে ১৯৯৫ ফিট্ লম্বা। দেশের প্রিয় কবির সম্বন্ধে বাঙলা সরকারের এই উদ্যোগ খুব বেশী প্রশংসা পাওয়ার দাবী রাখে। কিন্তু ঘটনার দিক হতে এই চিত্রে কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি ঘটেছে। দীর্ঘকাল আগে 'প্রিয়া সিনেমা'তে এই ছবিটি দেখে এসে আমি শ্রীমন্মথনাথ রায়কে এই সম্বন্ধে ডাকযোগে একখানা পত্র লিখেছিলেম। তিনিই এ ছবির প্রযোজক। আমার বিশ্বাস আমি তাঁর সঠিক ঠিকানা জোগাড় করেছিলেম। টেলিফোন ডিরেকটরীর সঙ্গে সেই ঠিকানা মিলিয়েও দেখেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত শ্রীরায় আমার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেন নি। তবে হতে পারে আমার পত্র তিনি পান নি।

এক জায়গায় লেখা আছে :—

"১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হলে নজরুল সেই গণ-আন্দোলনের জয়ধ্বনি গাইলেন—

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কাল বোশেখীর ঝড় ।"

নজরুলের কবিতার এই ক'টি ছত্র তার বিখ্যাত কবিতা "প্রলয়োল্লাস" হতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু "প্রলয়োল্লাস" ১৯২০ সালে রচিত তো হয়ইনি, ১৯২১ সালও তার রচনা-কাল নয়। কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে কুমিল্লায় এবং তা ছাপা হয়েছিল ১৩২৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যক "প্রবাসী"তে (১৯১ পৃষ্ঠা, ১৩২৯)। খ্রীস্টীয় হিসাবে ১৩২৯ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ ছিল ১৯২২ সালের ১৪ই বা ১৫ই মে। "প্রবাসী" তখনও খুব নিয়মিত প্রকাশিত হতো, অর্থাৎ ১লা জ্যৈষ্ঠের কাগজ তার চার-পাঁচ দিন আগে বার হয়ে যেতো। নজরুল তার বিখ্যাত কবিতাগুলি লেখার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো না কোনো কাগজে ছাপানোর জন্যে পাঠিয়েছে। এই জন্যেই "প্রলয়োল্লাস" ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে রচিত ব'লে আমরা ধ'রে নিচ্ছি। তার বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র "কামাল পাশা"ই আফ্‌জালুল হক্ সাহেবের দৌলতে মাসের পর মাস প্রেসে পড়েছিল। কারণ, 'মোসলেম ভারত' অত্যন্ত অনিয়মিত কাগজ ছিল। ঠিক সময়ে 'বিজলী'রা এসে গিয়েছিলেন ব'লে "বিদ্রোহী"র কপালে "কামাল পাশা"র দুর্ভোগ ঘটেনি।

১৯২২ সনে নজরুল যখন "প্রলয়োল্লাস" লিখেছিল তখন খিলাফৎ ও অসহযোগের যুক্ত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। বন্দীরা জেল হতে বেরিয়ে আসছিলেন,—নূতন ক'রে কেউ জেলে

যাচ্ছিলেন না। কাজেই, যে-আন্দোলন নিবে গেছে সেই আন্দোলন সম্বন্ধে কবি কি ক'রে বলতে পারে যে

"ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কাল বোশেখীর ঝড়" ?

এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারা যায় যে "প্রলয়োল্লাসের" ভিতর দিয়ে কবি নূতনকে নন্দিত করেছে যে-নূতন 'সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে' 'আগল' ভেঙে দিয়েছে। কবি বলেছে

মাভৈঃ মাভৈ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে !
জরায়-মরা মুমূর্ষদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে !

* * *

ধ্বংস দেখে ভয়-কেন তোর ? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন !
আসছে নবীন—জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন !

* * *

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

কবির নূতন সিন্ধু-পারে প্রলয় ঘটিয়েছে, জগৎ জোড়া প্রলয়ের ভিতর দিয়ে সে ঘনিয়ে আসছে। সে অসুন্দরকে ছেদন করবে এবং জরায় মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তার জায়গায় নূতনকে গড়বে। কে কবির এই নূতন ? অসহযোগ আন্দোলন তখন শেষ হয়ে গেছে। কবির নূতন তা নয়। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনও কোনো নূতন আন্দোলন নয়,—তখনকার মতো স্থগিত আছে মাত্র। তা ছাড়া, "প্রলয়োল্লাসের" ভিতর দিয়ে যে-সামাজিক বিপ্লবের আভাস ফুটে উঠেছে তা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্ম-পন্থায় ছিল না।

১৯২১ সালের শেষাশেষিতে আমরা এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি

গড়ে তুলব স্থির করেছিলেম। কাজী নজরুল ইস্‌লামও আমাদের এই পরিকল্পনায় ছিল। রুশ বিপ্লবের ওপরে যে সে আগে হতে শ্রদ্ধান্বিত ছিল সে-কথা আমি আগেই বলেছি। আমাদের এই পরিকল্পনা হতেই সৃষ্টি হয়েছিল তার সুবিখ্যাত "প্রলয়োল্লাস" কবিতা। তার সিন্ধু-পারের 'আগল ভাঙা' মানে রুশ বিপ্লব। তার প্রলয় মানে 'বিপ্লব'। আর জগৎ জোড়া বিপ্লবের ভিতর দিয়েই আসছে নজরুলের নূতন, অর্থাৎ আমাদের দেশের বিপ্লব। এই বিপ্লব আবার সামাজিক বিপ্লবও।

আজহার উদ্দীন খান তাঁর "বাংলা সাহিত্যে নজরুল"-এর প্রথম সংস্করণে "প্রলয়োল্লাসের" রচনার সময় সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি। তিনি তাঁর পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণে কিন্তু লিখেছেন যে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত ও তা থেকে উদ্ভূত আন্দোলনের প্রেরণায় নজরুল তার "প্রলয়োল্লাস" রচনা করেছিল (২৫ পৃষ্ঠা)।

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিত মানসের' পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ভারতী সংস্করণের ১৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :—

"'প্রলয়োল্লাস' এই কাব্যগ্রন্থের (অগ্নি-বীণা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে দেশব্যাপী প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নজরুলের কবিচিত্তও মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উল্লসিত হয়ে ওঠে। কবি পুরাতনের ধ্বংস ঘটিয়ে নূতনকে আহ্বান জানান। তিনি দেশবাসীকে ডাক দেন নূতনকে বরণ করতে।

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্‌-বোশেখীর ঝড়।' "

ওপরে আমি যে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দিয়েছি তা থেকে সকলেই খুব সহজে বুঝতে পারবেন যে আজহার উদ্দীন খান ও ডক্টর

সুশীলকুমার গুপ্ত দু'জনাই "প্রলয়োল্লাস" কবিতা সম্বন্ধে ভুল খবর ছেপেছেন। আমি জানিনা তাঁরা শ্রীমন্মথনাথ রায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কিনা।

"জাতের নামে বজ্জাতি"

আমাদের আগে জানা ছিল না, এমন একটি ঘটনার কথা এক সভায় শ্রীনলিনাক্ষ সান্যালের মুখে শুনেছিলেম। তাঁর বিয়ে হচ্ছিল একটি গোঁড়া হিন্দু-পরিবেশে। হঠাৎ তাঁর ক'জন বন্ধু নজরুল ইস্‌লামকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। এর জন্যে কেউ আগে হতে প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রীসান্যাল আপন মনে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে গোঁড়ামির পরিবেশে নজরুল না কোনো রকমে নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। যা'ক, সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটি সুব্যবস্থা হলো যাতে সব দিক রক্ষা পেয়ে গেল। নজরুল ব্যাপারটি বুঝেছিল এবং এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করেই সে লিখেছিল তার "জাতের নামে বজ্জাতি" কবিতাটি। শ্রীনলিনাক্ষ সান্যালের বিয়ের তারিখটি আমার জানা নেই। "জাতের নামে বজ্জাতি" শীর্ষক কবিতা ১৩৩০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুল তখন জেলে ছিল। পরে এই কবিতা তার "বিষের বাঁশী"তে ছাপা হয়েছে। এই কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছে। গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডেও উঠেছিল কবিতাটি। নীচে তার কিছুটা তুলে দিলাম।

* * * *

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতে নয়'ক মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতে জাতির জান
তাইত বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশ' খান।

এখন দেখিস্ ভারত জোড়া,
পড়ে আছিস্ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥

জানিস নাকি ধর্ম সে যে বর্মসম সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল'
যে জাত-ধর্ম ঠুনকো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সেত,
যাক্ না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া।

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা

সময়টা ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ ছিল, না, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ তা আমি সঠিক মনে করতে পারছিনে। এখন যদি আমি জেলে না থেকে বাইরে থাকতেম তা হলে হয়তো মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পুরনো দলীল-পত্র হতে প্রকৃত তারিখটি বা'র করতে পারতেম। কথাটি হচ্ছে এই যে নজরুল ইস্‌লাম আর আমি কুস্টিয়ায় একটি কৃষক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেম। শুধু আমি একা নয়, কলকাতা হতে আবদুল হালীম আর ফিলিপ স্প্রাটও সেই সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ফিলিপ স্প্রাট গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। তিনি কলকাতায় আমাদের সঙ্গে থেকে সাংগঠনিক কাজ করতেন। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ডও তিনি ভোগ করেছেন। এখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে গিয়েছেন।

নজরুলের সঙ্গে কুস্টিয়ায় কৃষক সম্মেলনে যোগদান ও বঙ্গীয় কৃষক লীগ গঠন

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এই সময়ে সস্ত্রীক কুস্টিয়ায় থাকতেন। কৃষক সম্মেলনের উদ্যোক্তাও তিনিই ছিলেন। তাঁর নিমন্ত্রণে পুত্র বুলবুল ও দু' মাসের শিশু সানি (সব্যসাচী) সহ নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা এবং শাশুড়ী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীও কুস্টিয়ায় হেমন্তবাবুর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। কুস্টিয়ার সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

যোগ দিয়েছিলেন। মনে আছে ত্রিপুরা জিলা হতে ওয়াসীমুদ্দীন সাহেবও এসেছিলেন। সেখানে আমরা বঙ্গীয় কৃষক লীগ—কৃষকদের একটি রাজনীতিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে তু'শ্রেণীর ভিত্তিতে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্ট্‌স্‌ পার্টি গড়ার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল। সেই জন্যে সংগঠনকে এক শ্রেণীর ভিত্তিতে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে ছিল আমাদের কুষ্টিয়ার এই উদ্যোগ। কিন্তু তার পরেই আমরা ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংস্রবে গিরেফ্‌তার হয়ে যাই। কৃষক লীগ আর গড়ে উঠল না। তার উদ্যোগের জন্যে মীরাট মামলায় আমাদের অপরাধের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়ল। তবে, সেটা ছিল বোঝার ওপরে শাকের আঁটির মতো।

কুস্টিয়ার ওই সভাতেই আমি নজরুলের সঙ্গে রাজনীতিক মঞ্চে শেষ দাঁড়িয়েছিলেম। ওখানকার সভার কাজ শেষ হওয়ার পর দিনই আমরা কলকাতায় চলে আসি। বাচ্চারা সুদ্ধ প্রমীলা ও গিরিবালা দেবীও আমাদের সঙ্গেই এসেছিলেন। নজরুল আরও তু' এক দিনের জন্যে কুস্টিয়ায় থেকে গিয়েছিল। আমাদের পার্টির আফিসে পুলিসের তালাশি হওয়ার খবর পেয়ে আমি শিয়ালদা স্টেশন হতে সোজা আফিসে চলে যাই। ওঁদের মা ও মেয়েকে আবতুল হালীম বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

'ধূমকেতু'র নজরুল ইস্‌লাম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের নিকট হতে বীরের মর্যাদা পেয়েছিল। 'ধূমকেতু'তেও জনগণের স্বার্থের কথা যে একেবারেই থাকত না তা নয়, তবুও কৃষকের স্বার্থের কাগজ ছিল না 'ধূমকেতু'। কিন্তু নজরুল ইস্‌লাম যে সাপ্তাহিক 'লাঙ্গল'-এর প্রধান পরিচালক হলো এটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর যুবকদের ভালো লাগল না। 'লাঙ্গল' নামটিই এমন যে 'ভূমির' ছোট-বড় মালিকেরা তা পসন্দ করতে পারলেন না। দেশের মধ্যবিত্ত যুবকেরা ভূমির সঙ্গে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। ভূমি হ'তে-পাওয়া আয় তাঁরা ভোগ করতেন, কিন্তু ভূমি হ'তে কোনো উৎপাদন তাঁরা করতেন না,—সেই কাজটি করতেন কৃষকেরা। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে মধ্যবিত্ত যুবকেরা অকাতরে জেল খাটতে পারতেন, প্রাণ বিসর্জনও দিতে পারতেন, কিন্তু ভূমিতে ছিল তাঁদের স্বার্থ। আজকের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে এই জিনিসটা বুঝতে চাইলে চলবে না। এটা বুঝতে হবে উনিশ শ' বিশের দশকের অবস্থাকে সামনে রেখে। অসহযোগ আন্দোলন নিবে যাওয়ার পরে কেউ কেউ প্রজা ও কৃষক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এমন লোকেদের একজন ছিলেন শ্রীহেমন্তকুমার সরকার। তখন তাঁর পরম বন্ধু, জমীদার কংগ্রেস-নেতা শ্রীকিরণশঙ্কর রায় সুকৌশলে রটিয়ে দিলেন যে তিনি একজন পুলিসের চর। সুভাষচন্দ্র বসুকে তিনিই ধরিয়ে দিয়েছেন। শ্রীবসুও আবার শ্রীসরকারের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। দু'জন এক সঙ্গে সাধুও হয়েছিলেন কয়েক দিনের জন্যে। মনে আছে, হেমন্তকুমার সরকার একদিন কথায় কথায় আমায় বলেছিলেন যে যশোহরের এক সভায় তিনি যখন প্রজা ও কৃষকের স্বার্থের বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল হঠাৎ "ভুঁইফোড়" "ভুঁইফোড়" ("upstart! upstart!!") ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। এমনই ছিল উনিশ শ' বিশের দশকে ভূমির মালিকদের শ্রেণী-সচেতনতা! এই অবস্থায় বের হয়েছিল সাপ্তাহিক "লাঙল"। তাতে ছাপা হয়েছিল কবি নজরুল ইস্‌লামের বিরাট কবিতা 'সাম্যবাদী' ও 'কৃষকের গান', ইত্যাদি।

'পথের দাবী'তে 'লাঙ্গলের গান'

এই সময়েই স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'র মুদ্রণ "বঙ্গবাণী" নামক মাসিক পত্রে শেষ হয়ে

এসেছিল, সম্ভবত তা পুস্তকরূপে ছাপা হতে প্রেসেও গিয়েছিল। এই পুস্তকের সাতাশের পরিচ্ছেদে তখন নিম্নলিখিত কথোপকথন ছাপা হয়েছিল। কথাটা হচ্ছিল মূলত শরৎচন্দ্রের প্রধান চরিত্র ও অবাস্তব সৃষ্টি ডাক্তার, অর্থাৎ সাব্যসাচী এবং কবি শশীর মধ্যে।

"শশী কহিল, আমি আবার আরম্ভ করব। চাষাভুষো, কুলি-মজুরদের জন্যেই এবার শুধু লিখব।

"কিন্তু তারা ত পড়তে জানে না, কবি।

"শশী কহিল, নাই জানলে, তবু তাদের জন্যেই আমি লিখব।

"ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সেটা অস্বাভাবিক হবে, এবং অস্বাভাবিক জিনিস টিকবে না। অশিক্ষিতের জন্যে অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, কারণ তাদের ক্ষুধাবোধ আছে, কিন্তু সাহিত্য পরিবেষণ করা যাবেনা। তাদের সুখ-দুঃখের বর্ণনা করার মানেই তাদের সাহিত্য নয়। কোনদিন যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য তারাই করে নেবে,—নইলে তোমার গলায় লাঙ্গলের গান লাঙ্গল-ধারীর গীতিকাব্য হয়ে উঠবে না। এ অসম্ভব প্রয়াস তুমি ক'রোনা, কবি।

"শশী ঠিক বুঝিতে পারিলনা, সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তবে আমি কি করব?

"ডাক্তার কহিলেন, তুমি আমার বিপ্লবের গান ক'রো। যেখানে জন্মেচ, যেখানে মানুষ হয়েচ, শুধু তাদেরই—সেই শিক্ষিত ভদ্র জাতের জন্যেই।"

("পথের দাবী", অষ্টম সংস্করণ, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

শরৎচন্দ্রের কবি শশীর সঙ্গে যদিও নজরুলের তেমন কোনো মিল নেই তবুও সেই শিক্ষিত 'ভদ্র' যুবকরা যাঁরা 'লাঙ্গল' হাতে নজরুলকে পসন্দ করতে পারেন নি, অথচ তাকে ভালোবাসেন, তাঁরা ধ'রে নিলেন যে শরৎচন্দ্রের কটাক্ষিত কবি, নজরুল ইস্‌লাম ছাড়া আর

কেউ নয়। 'পথের দাবী' হতে যে-অংশটুকু আমি ওপরে তুলে দিয়েছি তা "বঙ্গবাণী"তে ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা 'লাঙ্গল'কে ভালো চোখে দেখতে পারেন নি তাঁরা এই ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে বাঙলা সাহিত্যের একজন দিগ্‌গজ স্বয়ং শরৎচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে আছেন। অথচ, এত যে আলোচনা হচ্ছিল শরৎচন্দ্র নিজে কিছুই বলছিলেন না। তিনি বলছিলেন না যে নজরুল ইস্‌লাম তাঁর লক্ষ্য নয়। শ্রীতারানাথ রায় (সংক্ষেপে তিনি নিজেকে 'তারারা' লিখতেন) এই নিয়ে "আত্ম-শক্তি"তে প্রবন্ধও লিখলেন। আশ্চর্য এই যে তখনও শরৎচন্দ্র কিছুই বললেন না। কিন্তু প্রতিবাদ হলো অন্য জায়গা হতে। শ্রীতারানাথ রায় 'মুসোলিনী'র ছোট্ট জীবনী লিখেছিলেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখতে গিয়ে মুসোলিনীকে 'দেশ-প্রাণতার অবতার' বলেছিলেন।

নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আপনা হতেই "লাঙ্গলের গান" শিরোনাম দিয়ে 'গণশক্তি'তে ছাপাবার জন্যে একটি লেখা পাঠালেন। 'লাঙল'-এর নাম বদলে তখন 'গণশক্তি' হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন :—

> "যখন দেখলুম "আত্মশক্তি"র তারারা সব্যসাচীর এই অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে নজরুলকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করছেন, তখন কথাটা আলোচনা ক'রে দেখবার লোভ হলো।……কিন্তু আমাদের দেশে যাঁরা 'লাঙ্গলের গান' গাইছেন, তাঁরা তো জীবনকে ঠিক এই ভাবে মেনে নেন নি—ও গান তাঁদের বুক ঠেলে কণ্ঠ দিয়ে যে বেরুচ্ছে তা নিশ্চিতই গীতিকাব্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়। চৈতন্যদেব যখন গান গেয়ে গেয়ে দেশ মাতিয়ে-ছিলেন, রাজপুত চারণ কবিরা যখন গাইতেন তখন কি কবি-যশ প্রার্থনা তাঁদের মনের কোণেও ঠাঁই পেয়েছিল? গান গাইবার একমাত্র সার্থকতা কি গীতিকাব্য সৃষ্টিতে? তা ছাড়া আর

কিছুই কি নেই? আছে। আছে বলেই তো চৈতন্যদেব পেরেছিলেন বাঙালীকে মহাশক্তির পরশে জাগরিত করতে, আর সেই স্পর্শে বাঙালী সঞ্জীবিত হয়েছিল বলেই তো অন্য জিনিস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সাহিত্যিকের সব চেয়ে বড় সম্পদ বৈষ্ণব কাব্য গড়ে উঠেছে। অথচ কাব্য সৃষ্টি চৈতন্যদেবের লক্ষ্য ছিল না।

"আমাদের দেশের লাঙ্গলের গান গায়কদের সব্যসাচীর ওই কথা শুনিয়েই যাঁরা বলতে যান যে 'লাঙ্গলের গান' লাঙ্গল-ধারার গীতিকাব্য হয়ে উঠবে না, তাঁদের একথা মনে করিয়ে দিলে বোধ হয় অন্যায় হবেনা যে, সাহিত্যের চেয়েও অনেক বড় জিনিসের দাবী যুগে যুগে মানুষের ভিতরকার সঙ্গীতের উৎস খুলে দিয়েছে, আর তারই কিছু কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করবার শক্তি লাভ করেই সাহিত্য ধন্য ও পবিত্র হয়েছে, এমন কি তার নিজের নাম অবধি পেয়েছে।......... ।"

আমি শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পুরো লেখাটি এখানে ছাপালাম না সেই একই কারণে যে পুস্তকটি বড় হয়ে যাচ্ছে। লেখাটি ১৯২৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের (৬ই আশ্বিন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) "গণবাণী"তে ছাপা হয়েছিল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে "লাঙ্গলের গানে"র প্রতি তাঁর প্রধান চরিত্র সব্যসাচীর মুখ দিয়ে কটাক্ষ করিয়েছিলেন তা থেকে উনিশ শ' বিশের দশকের বাঙালী 'ভদ্রলোক'দের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তখনও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মনে করতেন তাঁরাই সবকিছু করবেন, আর জনগণ গড্ডলিকার মতো তাঁদের অনুসরণ করবেন। কেউ 'পেটি বুর্জুআ' বললে বাঙালী 'পেটি বুর্জুআ'রা তখনও চটে যেতেন, বলতেন তাঁরা 'বুর্জুআ',—'পেটি বুর্জুআ' নন।

তবে, উনিশ শ' বিশের দশকেই দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করেছিল, মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

সংগ্রামশীল রূপ গ্রহণ করেছিল। কৃষক-অভ্যুত্থানও হয়েছিল স্থানে স্থানে। এই দশকের নানান সংঘাতের ফলেই তার পরের দশকের শুরু হতে বাঙালী 'ভদ্র' যুবকেরা সমাজে নিজেদের স্থান সম্বন্ধে সচেতন হতে আরম্ভ করেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাসের সহিত নজরুল ইস্‌লামের প্রথম সাক্ষাৎ—কলকাতার ট্রামে

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ ছিল, না, মার্চ মাসের আরম্ভ তা এখন আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তবে, সম্ভবত মার্চ মাসই হবে। তার কয়েক দিন পরেই আমি মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংস্রবে গিরেফ্‌তার হয়েছিলেম। আমাদের গিরেফ্‌তারের তারিখ ছিল ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ। একদিন বিকাল বেলা নজরুল ইস্‌লাম ২/১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনের দোতালায় আমাদের আফিসে এলো। আমাদের আফিস মানে ওয়ার্কার্স্‌ এণ্ড পেজাণ্টস্‌ পার্টির আফিস। সে দিন বিকালে বোধ হয় নজরুল ইস্‌লামের যথেষ্ট অবসর ছিল। সে বহুক্ষণ আমাদের আফিসে থাকল। অনেক কথা হলো তার সঙ্গে। আমাদের অনুরোধে সে স্বরচিত গানও গাইল। তারপরে সে কথায় কথায় বলল, একটি মজার খবর শুনবে? কি কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে সে ট্রামে যাচ্ছিল এবং তার পাশের আসনটি খালি ছিল। সেই আসনে কিছুটা মোটা মতন একজন ভদ্রলোক এসে বসলেন। বসেই তিনি নজরুলকে বললেন যে "আমি আপনার একজন ভক্ত।" নজরুল তাঁর নাম জানতে চাওয়ায় উত্তর এলো,

"শ্রীসজনীকান্ত দাস।"

তখন নজরুলের চেহারার অবস্থা কি রকম হয়েছিল এবং সে প্রথম সজনীকান্তকে কি বলেছিল সে-সব কথা আমি তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। আমি বললাম, "এ কি বলছ তুমি, নজরুল? এত

দিন সজনীকান্ত দাসকে চিনতে না তুমি?" সে বলল, "কোনো দিন দেখাই হয়নি তার সঙ্গে এর আগে।" আমার বিশ্বাস ছিল যে নজরুল সজনীকান্ত দাসকে চিনত এবং সজনীকান্তও নজরুলকে চিনতেন। তাঁদের মধ্যে হৃদ্যতা নিশ্চয় গড়ে ওঠেনি, হয়তো তাঁরা কথাবার্তাও পরস্পরের সঙ্গে বলতেন না। কিন্তু নজরুল ইস্‌লাম যে একেবারেই সজনীকান্তকে চিনত না এটা আমি ভাবতেই পারি নি। আমি নজরুলের ওপরে কিঞ্চিৎ চটেছিলেম। বললাম, "তোমার মতো লোক আমি পৃথিবীতে দু'জন দেখিনি। যে-লোকটি তোমায় এত ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করলেন, খুব নির্দোষ ব্যঙ্গবাণও নয়, তার ওপরে আবার কত অপ-সমালোচনা তোমার করলেন, শুধু তোমার বন্ধু হওয়ার কারণে আমাদের গায়েও তিনি হুল ফুটিয়ে ছাড়লেন, সেই সজনীকান্তকে তুমি কোনো দিন দূর থেকেও দেখলে না, এটা আমার নিকটে খুবই আশ্চর্য ঠেকছে"। আমি আরও বললাম, "আমার নিজেরই তো সজনীকান্তকে কত দেখার ইচ্ছা হয়েছে, কারণ ক্ষমতার অপব্যবহার করলেও, যাঁকে কোনো দিন তিনি চিনেন না, জানেন না, তার গায়ে হুল ফুটিয়ে দিলেও,—তিনি একজন শক্তিশালী লেখক। আমি তোমার মতো সাহিত্যিক আড্ডাতে যাই না, কোনো গানের মজলিসেও আমার যাওয়া হয় না, আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তোমার তো তাঁকে চেনা উচিত ছিল"। যা'ক, এটা সত্য কথা যে সে দিন ট্রামে দেখা হওয়ার আগে নজরুল কখনও সজনীকান্ত দাসকে দেখেনি। কিন্তু সজনীকান্তের সঙ্গে ট্রামে দেখা হওয়ার খবরটি নজরুল শুধু যে আমাকেই দিয়েছিল, আর কাউকে একথা বলেনি, এটা হতেই পারে না। বরঞ্চ, আমাকেই খবরটি না জানানোর বেশী সম্ভাবনা ছিল, ট্রামে দেখা হওয়ার দিনই কিংবা তার পরের দিন সে আমাদের আফিসে এসেছিল ব'লে আমাকে সে খবরটি জানিয়ে ফেলেছিল। সে তার সাহিত্যিক বন্ধুদের নিশ্চয় কথাটা

জানিয়েছিল, আর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে সে একথা না জানিয়েই পারে না। সজনীকান্ত নিজেই যখন যেচে নজরুলের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন তখন নজরুল আর তাঁর মধ্যে যে একটা সঙ্কোচের বাধা ছিল তাতো ভেঙেই গিয়েছিল। তারপরে তাঁদের পরিচয় দানা বাঁধল না কেন? নজরুলের আবেগ এত প্রবল ছিল যে তা সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। তা ছাড়া, নজরুলের বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার যে সজনীকান্তেরও বন্ধু ছিলেন, একথা পরিষ্কার ভাষায় সজনীকান্তের আত্মস্মৃতিতে লেখা আছে। আমার মাথায় একথা কিছুতেই আসছে না যে সেই ট্রামের প্রথম দেখার পরে আবার 'প্রথম দেখা' (?) হওয়ার জন্যে সজনীকান্তকে পাক্কা আড়াই বছর অপেক্ষা করতে হলো কেন? সজনীকান্ত লিখেছেন :—

"……কাজী নজরুল ইস্‌লামের আমার সাক্ষাৎ আলাপ ও ঘনিষ্ঠতার কাহিনী বলা প্রয়োজন।

"নজরুলকে 'শনিবারের চিঠি' কম গালি দেয় নাই, সত্য কথা বলিতে গেলে 'শনিবারের চিঠির' জন্মকাল হইতেই সাহিত্যের ব্যাপারে একমাত্র নজরুলকেই লক্ষ্য করিয়াই প্রথম উদ্যোক্তারা তাক করিতেন। তখন আমি আসিয়া জুটি নাই। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এলাইয়া পড়িলে ওই নজরুলী রন্ধ্র-পথেই আমি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মোহিতলালও ওই নজরুলের কারণেই আসিয়া জুটিয়াছিলেন,—তবে আমাদের ছিল স্রেফ খেলা, মোহিতলালের ছিল জীবন-মরণ সমস্যা।………সেই নজরুলের সঙ্গে আমার ভাব হওয়া একটু বিচিত্র বটে। অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগে' এই প্রসঙ্গে আমার তারিফ করিয়াছেন।

"এই অঘটন ঘটাইয়াছিলেন অঘটন-ঘটন-পটীয়ান পবিত্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—আমাদের পবিত্রদা। মিলনের স্থানটা ধর্মস্থান ছিল না, মিলনেচ্ছুরাও ছিল না শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।

এক মজলিসে গান-বাজনার মধ্যে রাত্রি গভীর হইতেছিল। হঠাৎ পবিত্রদা প্রত্যাদিষ্টের মত অনুভব করিলেন, এমন একটা রাত্রে "In such a night as this" নজরুল এবং সজনীকান্ত পৃথক থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না। সেই গভীর রাত্রেই তিনি পড়ি-কি-মরি করিয়া ছুটিলেন এবং ব্যাপারটার তাৎপর্য আমাদের ঠাহর হইতে না হইতেই মজলিস-ভবনের দ্বারে কাজীর চকচকে চকোলেট রঙের ক্রাইসলার গাড়ির দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। মাটিতে চাদর লুটাইতে লুটাইতে তাম্বুলরাগরক্তাধরোষ্ঠবক্ষ নজরুল আসিয়া ঘরের মেঝেতে দাঁড়াইতেই আসরে উপবিষ্ট আমাকে পাঁচজনে মিলিয়া জোর করিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। তারপর হুমদো হুমদো দুই পুরুষের নারীসুলভ কোমল ললিতলবঙ্গলতা পদ্ধতিতে প্রথম মিলন সংঘটিত হইল। সদ্য-পরিচয়ের "আপনি-আজ্ঞা" সম্বোধন অর্ধ ঘণ্টায় "তুমি" এবং পরবর্তী আধ ঘণ্টায় চড়্‌চড়্‌ করিয়া "তুই-তোকারির" অধোভূমিতে নামিয়া আসিল। সেদিন যাঁহাদের এই মহামিলনের মহানাটক অবলোকন করিবার সুযোগ হইয়াছিল তাঁহারা ভাগ্যবান। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সেই ভাগ্যবানদের দলে ছিলেন, এইটুকুমাত্র আমার মনে আছে।" (সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৫ ও ১৭৬ পৃষ্ঠা)।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসের শুরুতে সজনীকান্ত দাস ট্রামে নজরুলের পাশের খালি আসনে এসে বসেছিলেন এবং নজরুলকে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই কথা সেদিনই কিংবা তার পরের দিন নজরুল আমাদের বলেছিল একঘর লোকের সামনে। খবরটা অসত্য হতেই পারে না। এখানে সজনীকান্ত তাঁর ও নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ আর আলাপের যে বিবৃতি দিয়েছেন তা ঘটেছিল ট্রামে আলাপ হওয়ার পুরো আড়াই বছর পরে। এটা মনে রাখতে হবে

যে নজরুল ইস্‌লাম ডজ্‌ ব্রাদার্সের ক্রাইসলার গাড়ীখানা ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগে কেনেনি। ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানীতে এর রেকর্ড পাওয়া গেলেও যেতে পারে, তবে ডি. এম. লাইব্রেরীতে এর খবর তো পাওয়া যাবেই। কারণ নজরুল "অগ্নি-বীণা"র স্বত্ব বিক্রয় করে মোটর গাড়ী কিনেছিল।

সজনীকান্ত ট্রামে যেচে নজরুলের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তাঁদের উভয়ের বন্ধু ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। নজরুল তার 'বাঁধন-হারা' নলিনীকান্ত সরকারকে উৎসর্গ করেছে। আবার সেই 'ব্যাঙ' লেখার সময় হতেই নলিনীকান্তের সঙ্গে সজনীকান্তের পরিচয়। সজনীকান্ত যখন নজরুলের সঙ্গে ভাব করতেই চাইলেন তখন নলিনীকান্তের মারফতেই তা ছিল সর্বাপেক্ষা সহজ। নজরুল যে ধরনের মানুষ ছিল তাতে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে একঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট ছিল। এবং আড়াই বছরের ভিতরে এই রকম যে হয় নি তা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। মামলার আসামী হয়ে আমি মীরাট চলে গিয়েছিলেম, তাই নিজের চোখে কিছু দেখিনি। তবে, এটা বুঝি যে স্মৃতিচারণ করার সময়ে অনেকে দু'তিনটি বিভিন্ন ঘটনাকে একটি ঘটনাতে মিলিয়ে ফেলেন। সজনীকান্ত যে-মজলিসের বিবৃতি দিয়েছেন সে-মজলিস নিশ্চয় বসেছিল, নজরুল সেই মজলিসে এসেওছিল, শুধু সজনীকান্তের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় সেই দিন হয়নি। বছর ও মাসের সঙ্গে সংযোগ না ঘটিয়ে যখনই আমরা স্মৃতিচারণ করি তখনই আমরা বিপদে পড়ে যাই। এখানে যদি ক্রাইস্‌লার গাড়ীর উল্লেখ না থাকত তাহলে আমি এত জোরের সঙ্গে কথা বলতে পারতেম না।

স্মৃতিকথা এই জন্যে মুল্যবান যে তাতে সম-সাময়িক ইতিহাসের বিস্তর মাল-মসলা থাকে। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা স্মৃতিকথাগুলি হতে এইসব মাল-মসলা আহরণ করবেন। স্মৃতিকথাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কথা থাকলে সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিতকারক

তা থেকে অনেক সাহায্য পান। কিন্তু আমাদের তথ্য যদি সঠিক না হয় তবেই বিভ্রম ও বিভ্রাট ঘটে। সাবধান না হলে স্মৃতি মরীচিকার মতো আমাদের বিভ্রমের পথেও টেনে নিয়ে যায়, এ ক্ষেত্রে যেমন শ্রীসজনীকান্ত দাসকে টেনে নিয়েছে।

আমি বঙ্গোপসাগরের সন্দ্বীপ নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে জন্মেছি, এবং মানুষও হয়েছি এই দ্বীপে। হঠাৎ সাগরে গজিয়ে ওঠা দ্বীপ নয় সন্দ্বীপ। এক হাজার বছরের অনেক আগেও এই দ্বীপে মানুষের বসতি ছিল। সন্দ্বীপ আইন-ই-আকবরীর একটি পরগনা। শাসন-কার্যের পরিচালনার দিক হতে সন্দ্বীপ আগে নোয়াখালী জিলায় ছিল। দেশ ভাগ হওয়ার কিছুকাল পরে তা চট্টগ্রাম (চাটিগাঁ) জিলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমি ঘর-সংসারের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন হয়ে ১৯১৩ সাল হতে কলকাতায় বাস ইখ্‌তিয়ার করেছি। কিন্তু তবুও নজরুল একদিন সন্দ্বীপে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

সন্দ্বীপে নজরুল ইস্‌লাম

ঠিক তারিখটার কথা আমার পক্ষে বলা মুশ্‌কিল। সে তার ৮/১, পানবাগান লেনের বাসা হতেই একবার চট্টগ্রাম গিয়ে বেশ কয়েকদিন সেখানে থেকে এসেছিল। চট্টগ্রামে সে হবীবুল্লাহ্ বাহারদের বাড়ীতে ছিল। তাঁর ছোট বোন বেগম শাম্‌সুন্নাহার যে-বই ("নজরুলকে যেমন দেখেছি") লিখেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে "১৯২৬ সালের শেষাশেষি ও ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে পর পর দু'বার (নজরুল) চট্টগ্রাম পদার্পণ করেন। এই সফরের মধুময় ফল 'সিন্ধু হিন্দোল' ও 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত কবির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা।" এই থেকে ধ'রে নেওয়া যায় যে ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে নজরুল চট্টগ্রাম গিয়েছিল। এবারেই সে সন্দ্বীপও গিয়েছিল। তবে, আমার মনে হয় না যে সে নিজের

প্রেরণায় গিয়েছিল। আমার দুই ভাই-পো তখন চট্টগ্রাম কলেজে ইন্‌টারমেডিয়েট ক্লাসে পড়ছিল। তাদের একজনের সঙ্গে ১৯২৭ সালে কলকাতায় নজরুলের পরিচয়ও হয়েছিল। আমার এই ভাই-পোরাই নজরুলকে সন্দ্বীপ নিয়ে গিয়েছিল ব'লে আমার ধারণা। হতে পারে মনে মনে নজরুলের ত্রিশ-চল্লিশ মাইল শীতের সিন্ধু ভ্রমণের লোভও হয়ে থাকবে। আমাদের ওই দিকে সমুদ্র শীতকালে শান্ত থাকে। তখন চট্টগ্রাম আর বরিশালের মধ্যে স্টীমার যাতায়াত করত। সন্দ্বীপ ছিল তার একটা স্টেশন।

জানি না কেন, সন্দ্বীপ নজরুলের পসন্দ হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে এসে সে আরও একবার সন্দ্বীপে যেতে চেয়েছিল, অবশ্য আমি যদি সঙ্গে যাই। কিন্তু তখন তলেতলে ভারত গবর্নমেণ্ট আমার জন্যে মীরাটের টিকেট কিনছিলেন এবং আমার থাকার জায়গাও সংরক্ষিত হচ্ছিল মীরাট ডিস্ট্রিক্ট জেলে।

সেবার কলকাতা ফেরার পরে এবং তারপরে কুস্টিয়া যাওয়ার আগে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর নিকট হতে টাকা ও নিমন্ত্রণ পেয়েছিল।

নজরুলের দুই শিক্ষক

(১) কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নজরুল ইস্‌লাম কিছু দিন মাথ্‌রুন হাইস্কুলে পড়েছিল। বর্ধমান জিলার মঙ্গলকোট থানার অধীনে এবং অজয় নদের তীরে মাথ্‌রুন একটি গ্রাম। এই গ্রামটি কাসিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জন্মস্থান। তিনিই তাঁর জন্মস্থানে তাঁর পিতার নামে স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন। স্কুলের আসল নাম নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউট। কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক এই স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন।

নজরুল যে এক সময়ে মাথ্‌রুনের হাইস্কুলে পড়েছে এবং কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক যে সেই স্কুলে তার শিক্ষক ছিলেন এই কথা আমরা প্রথম তার মুখেই শুনি। সে যখন ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ফৌজ হতে ফিরে আসে তখন বাঙলা দেশে

"মাঝি তরী হোথা বাঁধবনাকো আজকে সাঁঝে"

কবি কুমুদরঞ্জনের এই গানটি বড় বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। কেউ নজরুলকে এই গানটি গাইতে অনুরোধ করা হতেই প্রথমে কথাটা ওঠে। তখনই সে বলেছিল সে কিছু দিন মাথ্‌রুন হাইস্কুলে পড়েছিল এবং কবি কুমুদরঞ্জন তার শিক্ষক। সে গর্বের সঙ্গেই কথাটা

আমাদের বলেছিল। তার কিছু দিনের ভিতরে কবিতা লিখে নজরুল নাম ক'রে ফেলে। এই সময়ে আমরা ক'জন একদিন ছুপুর বেলা ৩২, কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসে বসে কথাবার্তা বলছিলেম। নজরুল ইস্‌লামও সামিল হয়েছিল আমাদের আলোচনায়। এই সময়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এসে খবর দিল যে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক নজরুলকে দেখতে এসেছেন এবং নীচে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন। শুনেই নজরুল খালি পায়েই নীচের দিকে ছুটল, জুতোর ভিতরে পা গলাবার সময়টুকুও (তখনও বাঙলা দেশে চপ্পল পরার রেওয়াজ চালু হয়নি) সে নষ্ট হতে দিল না। সে কি করে দেখবার জন্যে আমরাও তার পিছে পিছে ছুটলাম। গিয়েই নজরুল প্রথমে কবি কুমুদরঞ্জনের পায়ের ধুলো নিল আর তারপরে তাঁকে সসম্মানে সঙ্গে ক'রে দোতালায় নিয়ে এলো। কবি কুমুদরঞ্জন যে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকলেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওপরে গেলেন না, তার কারণ এই ছিল যে নজরুল কি ভাবে তাঁকে গ্রহণ করবে এই বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিল। নজরুলের সেই কোন্ ছোটবেলায় তিনি তাকে দেখেছিলেন! নজরুলের ব্যবহারে কিন্তু তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। ছুই কবি একত্র হওয়ার পরেও যে কবিতার আবৃত্তি শুরু হলোনা তাতে আমি অন্তত খুব খুশী হয়েছিলেম। তাঁরা অনেকক্ষণ অনেক আলাপ-আলোচনা করলেন। নজরুল নিজের সব খবর তাঁকে জানাল। কথায় কথায় সে কবি কুমুদরঞ্জনকে ব'লে ফেলল যে "সার, আমিও আপনার মতো পাগল" শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে "খেপাটা আবার একি ব'লে বসল।" কিন্তু কবি কুমুদরঞ্জনের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে সেখান থেকে নজরুলের প্রতি স্নেহ ঝরে পড়ছে।

ওপরে বলা ঘটনা হতে সন্দেহ করার কোনো অবকাশই থাকে না যে নজরুল মাথ্‌রুনের স্কুলে পড়েনি বা কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তার শিক্ষক ছিলেন না। এখানে একথা আমি বলছি এই কারণে যে নজরুলদের কাজী পরিবারের এক ভদ্রলোক বলেছেন যে নজরুল কোনো দিন মাথ্‌রুনের স্কুলে পড়েই নি। কাজেই কবি কুমুদরঞ্জন তার শিক্ষক কি করে হবেন? আমার মনে হয় কাজী পরিবারের যাঁরা কিঞ্চিৎ ভাগ্যবান ছিলেন তাঁরা কোনো খবরই রাখতেন না, ছোটবেলা নজরুল কোথায় যাচ্ছে এবং কি করছে। নিঃস্ব বালকের খবর রাখতে গেলেই তো কোনো না কোনো দায়িত্ব ঘাড়ে এসে চাপতে পারে।

কেউ কেউ আবার লিখেছেন যে নজরুল স্কুল-পালানো ছেলে ছিল। এটাও সত্য কথা হতে পারে না। কারণ, যে-ছেলের বাপ মা'র পয়সা আছে সে-ছেলেই শুধু স্কুল পালাতে পারে। নজরুলের মা'র কোনো পয়সা ছিল না। পড়ার আগ্রহ নিয়ে নিজেই সে স্কুল খুঁজে বেড়াচ্ছিল, পয়সা নেই ব'লে স্কুলগুলিই তার নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছিল। মাথ্‌রুন নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে নজরুল কেন পড়তে গিয়েছিল, একথা বুঝতে কি কোনো কষ্ট করতে হয়? স্কুলটি ছিল কাসিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর, আর তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দানশীল ব্যক্তি। তাঁর ইস্টেট্‌ হতে সাহায্য পেলেই শুধু নজরুলের পক্ষে পড়া চালানো সম্ভব ছিল। সেই আশাতেই সে গিয়েছিল মাথ্‌রুনে, পরে যেমন সে গিয়েছিল শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে। অবশ্য, আমি জানিনে, মাথ্‌রুনে কাসিমবাজার ইস্টেট্‌ হতে নজরুল কোনো সাহায্য পেয়েছিল কিনা।

(১) হাফিজ নূরুন্নবী

একটি অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল। শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে যিনি নজরুলের পার্‌সী শিক্ষক ছিলেন সেই হাফিজ

নুরুন্নবী ছিলেন আমার একজন বন্ধু। নজরুলের ফৌজ হতে ফেরার আগে এই কথাটা আমি কোনোদিন ভাবিনি। অর্থাৎ, আমি ভালো ক'রে বুঝতামই না রানীগঞ্জ আর শিয়ারশোলে তফাৎ কি? তার ফৌজ হতে ফেরার পরে সে যখন আমাদের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে থাকা শুরু করেছে তখন একদিন সে আমায় বলল যে সে খিদিরপুরে তার শিক্ষক হাফিজ নূরুন্নবীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে চায়। তখনই আমার মনে পড়ে গেল যে হাফিজ নূরুন্নবী তো শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে চাকরী নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি নজরুলকে জানালাম যে নূরুন্নবী সাহেব আমার বন্ধু। আমিই তাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাব।

১৯১৫ সালের গরমের সময়ে আমি দু' মাসের জন্যে খিদিরপুর জুনিয়র মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষকের কাজ করেছিলেম। তখন এই মাদ্রাসার হেড মৌলবী (প্রধান শিক্ষকও বটেন) ছিলেন হাফিজ নূরুন্নবী সাহেব। সেই গরমের ছুটি শেষ হতেই তিনি রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে হেড মৌলবীর (পার্‌সী শিক্ষকের) পদে যোগ দেন। নূরুন্নবী সাহেবের সমস্ত 'কুর্‌-আন'' কণ্ঠস্থ ছিল। যাঁদের তাই থাকে তাঁদের 'হাফিজ' বলা হয়। তা ছাড়া, তিনি কলকাতা মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন। ইংরেজিও তিনি মোটামুটি জানতেন। কিন্তু মাত্র দু' মাসের পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটু বেশী নিবিড় হয়েছিল এই কারণে যে তিনি কবিত্বময় উর্দু গদ্য লিখতেন। সাধারণভাবে লেখকরা সেই যুগে আমায় খুব সহজে আকর্ষণ করতেন।

নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে আমি খিদিরপুরের শাহ্‌ আমান লেনে হাফিজ নূরুন্নবীর বাড়ীতে গিয়েছিলেম। তাঁর পিতা মুন্‌শী শাহ্‌ আমান আলীর মৃত্যু হওয়ায় (১৯১৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল) সম্ভবত তিনি শিয়ারশোল স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে এসেছিলেন। আমি যতটা বুঝেছিলেম তাতে

নজরুলের সঙ্গে হাফিজ নূরুন্নবীর নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মুস্‌লিম শিক্ষকরা ছাত্রদের খুব বেশীর ভাগ স্থলেই 'তুমি' সম্বোধন করেন এবং স্নেহের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় না হলে কখনও 'তুই' সম্বোধন করেন না। আমি দেখেছিলেম নূরুন্নবী সাহেব নজরুলকে 'তুই' সম্বোধন করছেন।

শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে হাফিজ নূরুন্নবী যখন পার্‌সী ভাষার শিক্ষকরূপে ১৯১৫ সালে যোগ দিয়েছিলেন তখন নজরুল দ্বিতীয় ভাষারূপে সংস্কৃত পড়ছে। সেই স্কুলে মৌলবী আবদুল গফুর নামে আরও একজন যে পার্‌সী ভাষার শিক্ষক ছিলেন তাঁর আর নজরুলের মধ্যে নাকি কখনও সুখকর সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। সে যাই হোক, নূরুন্নবী নজরুলকে পার্‌সীর ক্লাসে টেনে এনেছিলেন। তিনি সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ব'লে নজরুল তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। নজরুলের সামনেই তিনি হাসতে হাসতে আমায় বলেছিলেন যে বেত হাতে তাড়া ক'রে ওকে আমি আমার পার্‌সীর ক্লাসে ধরে এনেছিলেম।

একটি কথা এখানে ভাববার আছে যে মক্‌তব হতে নজরুল যখন নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেছিল তখন সে কিছু পার্‌সী পড়েছিল কি না। সে স্বরচিহ্নের সাহায্যে অর্থ না বুঝেই কুর্‌আন ভালোই পড়তে শিখেছিল। তার মানে আরবী ভাষার বর্ণমালার সঙ্গে তার ভালো পরিচয়ই হয়ে গিয়েছিল। পার্‌সী ভাষাও পারস্য আরবদের দ্বারা বিজয়ের পর হতে আরবী অক্ষরেই লিখিত হয়। এই অবস্থায় নজরুল সেই সময়ে কিঞ্চিৎ পার্‌সীও কি পড়েছিল? তার বাড়ীর লোকেরা বলছেন যে সে তার কাকা কাজী বজ্‌ল-ই-করীমের নিকটে সামান্য কিছু পার্‌সীও পড়ে নিয়েছিল। এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা। তবে নূরুন্নবী সাহেবই যে তার ভিতরে পার্‌সী ভাষার একটা মোটামুটি ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। হাই স্কুলের ওপরের ক্লাসে পড়তে পড়তে নজরুল একবার ডবল প্রমোশন

নিয়েছিল, সম্ভবত ক্লাস সেভেন হতে একলাফে ক্লাস নাইনে উঠেছিল। আবার ক্লাসের প্রথম ছাত্রও ছিল সে। যে বিষয়গুলি সে পড়ছিল তার একটিতে (পার্‌সীতে) সম্পূর্ণ কাঁচা থাকলে কখনও সে এত ভালো ফল পরীক্ষায় করতে পারত না।

নজরুল তার বঙ্গানুবাদ "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ"-এর ভূমিকায় লিখেছে যে তাদের বাঙালী পল্টনের পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের মুখে কবি হাফিজের "দিওয়ান"-এর কিছু কিছু আবৃত্তি শুনে সে মুগ্ধ হয়, আর সে দিন থেকেই সে তাঁর কাছে পার্‌সী ভাষা শিখতে আরম্ভ করে। তাঁর কাছেই সে পার্‌সী কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্য পড়ে ফেলে। "সেই দিন থেকেই তাঁর কাছে (পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের কাছে) ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি" কথাটা নজরুল একান্ত ঝোঁকের মাথায় লিখে ফেলেছে। পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পরে লিখেছিল ব'লে তার মন ঠিক ছিলনা। পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের কাছেই যদি সে প্রথম পার্‌সী ভাষা শেখা আরম্ভ ক'রে থাকে তবে মেট্রিকুলেশন ক্লাস পর্যন্ত পার্‌সীর ক্লাসে সে কোন্‌ ভাষা পড়েছিল ? আসলে পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের কাছে সে হাফিজের "দিওয়ান" পড়া আরম্ভ করেছিল। তার ভিতর দিয়ে তার পার্‌সী ভাষার জ্ঞানও বেড়েছিল। আধুনিক পার্‌সী ভাষার কথা জানিনে, ক্লাসিকাল পার্‌সী ভাষা অন্য পুরানো ভাষাগুলির তুলনায় অনেক সোজা বটে, তবুও পার্‌সী ভাষার সব কবির কাব্য সেই পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবও পড়াতে পারতেন ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। কবি হাফিজের 'দিওয়ানে'র যে-সংস্করণ নজরুল পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের নিকটে পড়েছিল সেখানা সে ফৌজ হতে ফেরার সময়ে সঙ্গে এনেছিল। সে কথা আমি আগেই লিখেছি।

১৯২৩ সালের মে মাসে আমার গিরেফতারের আগে পর্যন্ত আমি নূরুন্নবী সাহেবের বাড়ীতে যাতায়াত করেছি। কোনো রাজনীতিক ব্যাপারের সঙ্গে আমার যোগ আছে একথা তিনি

জানতেন, তবে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সঙ্গে আমার সংযোগ আছে একথা তিনি জানতেন না।

নূরুন্নবী সাহেবের পিতা মুন্‌শী শাহ্‌ আমান আলী সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাধু ও ফকীর ব্যক্তি ছিলেন। বিখ্যাত আইনজীবী সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি. আই. ই. তাঁকে খুব বেশী ভক্তি করতেন। তিনিই কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর আগে ইংরেজ আই. সি. এস. অফিসাররাই চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন। পরে তিনি লণ্ডনে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্যও ছিলেন। তাঁরই হস্তক্ষেপে মুন্‌শী শাহ্‌ আমান আলীর কবর সাধারণ কবরস্তানে না হয়ে তাঁর বাড়ীর আলাদা দহ্‌লিজে (বৈঠকখানায়) হয়েছিল। ইক্‌বালপুর বাই লেনের নাম পরিবর্তন করে তিনিই শাহ্‌ আমান লেন করে দিয়েছিলেন।

নূরুন্নবী সাহেবের কাকার নাম ছিল ডাক্তার আহ্‌মদ হুসয়ন। সেকালের আগ্রা মেডিকাল কলেজ হতে এল. এম. এস পাস করে তিনি মিলিটারী মেডিকাল সার্বিসে ঢুকেছিলেন। পরে তিনি ইমিগ্রেশন ডিঁপোর মেডিকাল অফিসারের কাজ নিয়ে ত্রিনিদাদ যান। চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করেও তিনি ত্রিনিদাদেই ছিলেন এবং সেখানেই তিনি ১৯১৯ সনের ৩০শে মার্চ তারিখে মারা যান। একজন ভারতীয় (বাঙালীও বটেন) দূর বিদেশে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন ব'লে ত্রিনিদাদেরই একখানা কাগজ হতে মাল-মসলা নিয়ে আমি ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যক "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছেপেছিলেম।

হাফিজ নূরুন্নবী শুধু পিতার কবরের খাদিম হয়েই দিন কাটান নি, রুজি-রোজগারের জন্যে তিনি অনেক কিছুই করেছেন। খিদিরপুরের কাজী ও মুস্‌লিম ম্যারিজ রেজিস্ট্রার তিনি হয়েছিলেন। খিদিরপুরের ষোলআনা মস্‌জিদ সংলগ্ন কবরস্তানের (কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত) সব-রেজিস্ট্রারের কাজও কোনও সময়ে তিনি করেছেন।

১৯৪০ সালে তিনি মুরশিদাবাদের নওয়াবের লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হয়েছিলেন। এখানে তিনি শুধু চাকরী করতে গিয়েছিলেন, না, তাঁর কিছু লেখারও উদ্দেশ্য ছিল তা জানিনে। গবেষণার পক্ষে খুব মূল্যবান এই লাইব্রেরী।

১৯৪৩ সালের ২২শে আগস্ট তারিখে হাফিজ নূরুন্নবী সাহেব কলকাতা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। ১৯৩০ সালের জুন মাসে ভারত গবর্নমেণ্ট তাঁকে 'খান সাহিব' উপাধি দিয়েছিলেন।

"সওগাত" ও "নওরোজ"

"সওগাত" ও "নওরোজ" তু'খানা বাঙলা মাসিক পত্রিকা। এই তু'খানা কাগজের সঙ্গেই কাজী নজরুল ইস্‌লামের লেখার সংস্রব ছিল। "সওগাত" ১৯১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আর, "নওবোজ" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ সালে।

"সওগাতে"র সম্পাদক ছিলেন এম. নাসিরউদ্দীন সাহেব। দেশ ভাগ হওয়ার পরে "সওগাত" ঢাকায় উঠে গেছে। আমি সঠিক খবর জানিনা, সম্ভবত এখনও তিনিই 'সওগাতে'র সম্পাদক। "সওগাতে"র মালিকও নাসিরউদ্দীন সাহেব। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুরের নিকটে কোনও গ্রামে তাঁর বাড়ী। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমার যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তখনও দেখেছি বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বেশ টান। ছোট গল্প লেখার কথা ভাবতেন, কখনও লিখেছেন কিনা তা আমি জানিনে,—তবে, একথা সত্য যে অনেককে দিয়ে ছোট গল্প তিনি লিখিয়েছেন।

নাসিরউদ্দীন সাহেব প্রথম মোস্‌লেম প্রিন্টিং এণ্ড পবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড নাম দিয়ে একটি কোম্পানী রেজিস্ট্রি

করেছিলেন। 'আল্‌হাম্‌ব্রা হোটেল' নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। এটিকেও জয়ণ্ট স্টক্ কোম্পানী হিসাবে তিনি রেজিস্ট্রি করেছিলেন কিনা সে কথা মনে রাখি নি। হয় তো করেছিলেন। সত্য সত্যই কলিন স্ট্রীটে একটি ছোট্ট হোটেল তিনি খুলেছিলেনও।

নাসিরউদ্দীন সাহেবের দু'টি কোম্পানীই কালের আঘাত সহ্য করে টিকে থাকতে পারেনি, কিন্তু তাঁর "সওগাত" টিকে ছিল এবং আশা করি এখনও তা ঢাকায় টিকে আছে। কাজী নজরুল ইস্‌লাম পল্টনের ব্যারাক হতেই 'সওগাতে' লেখা আরম্ভ করেছিল, যেমন সে করেছিল "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য়। উনিশ শ' বিশের দশকে সে বরাবর "সওগাতে" লিখেছে। উনিশ শ' ত্রিশের দশকে সে 'সওগাতে' লিখত কিনা সে খবর আমার জানা নেই।

ভিতরের খবর নেওয়ার চেষ্টা কখনও করিনি, বাহির থেকে আমার মনে হয়েছে যে উনিশ শ' বিশের দশকের শেষভাগে "সওগাতে"র অবস্থা সচ্ছল হয়েছিল। নাসিরউদ্দীন সাহেব তখন প্রেস কিনেছিলেন। অনেকেই তখন "সওগাতে" জুটেছিলেন। এক সময়ে সাপ্তাহিক ও 'শিশু সওগাত'ও বা'র হয়েছিল।

"সওগাত" ছাড়া নাসিরউদ্দীন সাহেবের আর কোনও ব্যবসায় ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অনেকে অনেক কিছুই করেছেন। "দৈনিক ইত্তেহাদে"র উদ্বোধনী সভায় যোগ দিতে গিয়ে নাসিরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে বহু বছরের পরে আমার দেখা হয়। তার পরে তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। নূতন পার্ক স্ট্রীটের একখণ্ড খালি জায়গায় মণ্ডপ তৈয়ার ক'রে এই উদ্বোধনী সভাটি হচ্ছিল। নাসিরউদ্দীন সাহেব আমায় তখন বলেছিলেন যে তাঁর জমীনের ওপরেই সভাটা হচ্ছে। তা থেকে বুঝেছিলেম যে নাসিরউদ্দীন সাহেব কলকাতায় একজন বিত্তবান ব্যক্তি।

"নওরোজ" নাম দিয়ে একখানা বাঙলা মাসিকপত্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রথম বা'র হয়। খ্রীস্টাব্দের হিসাবে সময়টা ছিল ১৯২৭ সালের জুন-জুলাই মাস। তখন যা বুঝেছিলেম তাতে কিছু সংখ্যক মুস্‌লিম যুবক ছিলেন এর উদ্যোক্তা। তাঁরা "মোসলেম ভারতে"'র আফজালুল্ হক সাহেবকে সঙ্গে নিয়েছিলেন এই কারণে যে তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আসলে তিনি এই কাগজের ভিতরের ব্যাপারের সঙ্গে মোটেই যুক্ত ছিলেন না। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমি যতটা বুঝেছিলাম একমাত্র বে-নজীর আহ্‌মদই সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

কাগজ বা'র করার আগে যে তোড়জোড় করা হয়েছিল দূর থেকে তা লক্ষ্য ক'রে আমরা বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেম। ৪৫ কিংবা তার কাছাকাছি নম্বরের মেছুয়া বাজার স্ট্রীটে (এখন নাম কেশব সেন স্ট্রীট) একটি পুরো দোতালা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ওপরে আফিস আর নীচে ছাপাখানা। নার্সিং লেনের শ্রীচিত্ততোষ বসু লণ্ডন হতে মেরামত করা পুরনো প্রিন্টিং মেশিন কলকাতায় আমদানী ক'রে বিক্রয় করতেন। তাঁর নিকট হতে' ফজলুল হক সেলবর্সী (তাঁর সম্বন্ধে আগে অনেক কথা বলেছি) দেড় হাজার টাকায় একটা মেশিন কিনে 'নওরোজে'র বাড়ীতে বসিয়েছিলেন। এই থেকে মনে হচ্ছে যে তিনিও সেই মুস্‌লিম যুবকদের দলে ছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যিনি এ. এম. এ. জমান নামে পরিচিত হয়েছিলেন, যিনি কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও আইন সভার সভ্য ইত্যাদি হয়েছিলেন, তিনিও ছিলেন "নওরোজে"র যুবকদের দলে। তবে, তাঁর নাম তখন ছিল সুরজ মিঞা। তিনি তো "নওরোজে"র বাড়ীতেই বাস করতেন।

একটা পুরো দোতলা বাড়ী, একটা পুরো ছাপাখানা, বাড়ীভর্তি লোক গিজগিজ করছেন,—এ সবই একখানা বাঙলা মাসিকের জন্যে! এত লোকের ভিতরে সাহিত্যিক গুণ ছিল মাত্র একজনের,

—তাঁর নাম আমি ওপরে উল্লেখ করেছি। ফজলুল হক সেলবর্সীর সাংবাদিক অভিজ্ঞতা ছিল বটে, কিন্তু একখানা সাহিত্যিক মাসিক পত্র সম্পাদনার ক্ষমতা তাঁর ভিতরে কতটা ছিল তা আমি জানিনে।

কৃষ্ণনগরে "নওরোজে"র তরফ হতে কাজী নজরুল ইস্‌লামের নিকটে একটি ডেপুটেশন গেল। তার মুখপাত্র ছিলেন আফ্‌জালুল হক সাহেব। "নওরোজ" সম্পর্কেও তাঁর পুরানো প্রস্তাবই করা হলো নজরুলের নিকটে, যে-প্রস্তাব তিনি অনেক আগে করেছিলেন তাঁর "মোসলেম ভারতে"র জন্যে। অর্থাৎ নজরুলের সমস্ত লেখা প্রথমে ছাপা হবে "নওরোজে", অবশ্য, সে-সব লেখার ওপরে "নওরোজে"র কোনো স্বত্ব থাকবে না। নজরুলকে শুধু যে "নওরোজে"ই লেখা ছাপাতে হচ্ছে, আর কোনও কাগজে সে তার লেখা দিতে পারছে না, স্থির হলো যে তার জন্যে তাকে মাসে মাসে একটা টাকা দেওয়া হবে। টাকার এই অঙ্কটা মাসে একশ' হতে দেড়শ' টাকা ছিল। আমি ঠিক অঙ্কটা মনে করতে পারছিনে। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কেও কাগজে আনা হয়েছিল। কিন্তু চার-পাঁচ সংখ্যা কাগজ মাত্র বা'র হয়েছিল। এ ধরনের কাগজ চলতে পারে না, তার ওপরে পূর্ববঙ্গের কোনো জিলার একটা মোকদ্দমার ধাক্কাও এসে লাগল "নওরোজের" গায়ে। সবকিছু ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

নজরুলের লেখা শুধু "সওগাতে"ই বার হবে, আর কোথাও নয়, এই রকম একটি প্রচেষ্টাও হয়েছিল, তবে কার্যে পরিণত হয়নি।

শুনেছি বে-নজীর আহ্‌মদ সাহেব পূর্ববঙ্গে ব্যবসায় করে এখন লক্ষপতি হয়েছেন।

মা ও মেয়ে

গিরিবালা দেবী ও প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম

আমার এই স্মৃতিকথায় গিরিবালা দেবী ও প্রমীলার কথা আমি বারে বারে বলেছি। তবুও তাঁদের সম্বন্ধে আমার বলা এখনও শেষ হয় নি।

আমি আগেই বলেছি যে শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন এবং একটি মাত্র সন্তান, প্রমীলা, জন্মাবার পরেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁর প্রথমা স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থাতেই তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে এই প্রথমা স্ত্রী এখনও বেঁচে থাকতে পারেন। ১৯৬৪ সালের শেষার্ধে আমি তাঁর বেঁচে থাকার কথা শুনেছিলেম ব'লে মনে পড়ে।

নজরুল ইস্‌লামের সাহিত্যিক বন্ধুরা কতটা কি জানতেন তা জানিনে, গিরিবালা দেবী সাহিত্যে অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি বাঙলা সাহিত্যের পড়া-শুনা করতেন এবং বাঙলা ভাষা ভালোই জানতেন। যাঁরা শুধু পড়েই আনন্দ পান, কোনো কিছু লিখে নিজেদের জাহির করেন না (সমাজে অবশ্য তাঁদের সংখ্যাই বেশী), গিরিবালা দেবী ছিলেন তাঁদেরই একজন। আমাদের চার পাশে নানান রকমের সমস্যা আমাদের ঘিরে রেখেছে। অন্য কিছু না হোক, কমপক্ষে এই সকল সমস্যার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে ইচ্ছা করলেই তিনি একজন লেখিকা হিসাবে নাম করতে পারতেন। নজরুলের

পরিচয়ের সুযোগেও মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা তাঁর জন্যে অবারিত হতে পারত। কিন্তু তিনি ভিন্ন মেজাজের মেয়ে ছিলেন। নজরুলের সব লেখার খবর তিনি রাখতেন। সে নিজেও তার লেখার খবর তাঁকে জানাত। কারণ, সমঝদার লোককে নিজেদের লেখার খবর জানিয়ে লেখকরা আনন্দ পান। নজরুল কয়েক দিন বাইরে থেকে বাড়ী ফিরলে সেই কয় দিনে সে কি লিখেছে তার খবর গিরিবালা দেবী নিতেন। বাধ্য হয়ে আমাকে একসঙ্গে অনেক বছর কলকাতা হতে অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে আসার পরে তিনিই আমাকে নজরুলের লেখার বিস্তৃত বিবরণ জানিয়েছিলেন। তাঁর মুখেই খবর পেয়েছিলেম যে নজরুলের গীতি-নাট্য 'আলেয়া'র গানগুলি প্রথমে একবার চুরি হয়ে গিয়েছিল। তারপরে আবার নজরুলকে নূতন ক'রে গানগুলি লিখতে হয়েছে। তিনিই আমায় জানিয়েছিলেন যে অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র অনুরোধে নজরুল প্রথম শ্যামা বিষয়ক গান রচনা করেছিল। গিরিবালা দেবীই আমায় বলেছিলেন যে 'চৌরঙ্গি' ছায়াচিত্রের জন্যে নজরুল বড় বেশী পরিশ্রম করেছিল। কিন্তু ফজলি ব্রাদার্স পুরো টাকা নজরুলকে দেন নি। নজরুলের অসুখ হওয়ার পরে গিরিবালা দেবীর মুখেই আমি প্রথম শুনতে পাই যে হাইকোর্টের সলিসিটর শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকটে মাত্র চার হাজার টাকার জন্যে নজরুলের গানের রয়াল্‌টি ও পুস্তকাদি বাঁধা পড়েছে।

এই মহীয়সী মহিলা সমাজের সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা ক'রে তাঁর একমাত্র সন্তান প্রমীলার হাত ধরে একদিন দেবরের সংসার হতে বা'র হয়ে এসে ছন্নছাড়া নজরুল ইস্‌লামের সংসার গড়ে তুলেছিলেন। নজরুলের কাব্য ও দেশপ্রেম তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। নজরুল যে মুসলমানের ছেলে একথা তিনি কোনো দিন মনের কোণেও স্থান দেন নি। নানান দিকের নানান লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন।

গিরিবালা দেবীকে আমি প্রথম দেখেছিলেম ১৯২১ সালে কুমিল্লায়। তারপরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমার প্রথম বারের জেল হতে ফিরে আসার পরে ১৯২৬ সালে। কৃষ্ণনগরে নজরুল ইস্‌লামের বাড়ীতেই এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন থেকে প্রায়ই তাঁদের মা ও মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই যুগে আবদুল হালীম আর আমি একসঙ্গে থেকেছি। আমরা ভাবতাম তাঁদের মা ও মেয়ের অসুবিধাগুলির প্রতি আমাদের নজর রাখা উচিত। শুধু ভাবাই সার। আসলে আমাদের কোনো কিছু করার ক্ষমতা ছিলনা। সব সময়ে আমাদেরই খাওয়া জুটতনা। গিরিবালা দেবী সবই বুঝতেন। কোনো কোনো সময়ে নজরুলের কোনো বন্ধুর তরফ হতে তাঁদের কোনো অসুবিধা ঘটলে গিরিবালা দেবী আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা গিয়েছি, আবদুল হালীমই গিয়েছে বেশীর ভাগ সময়ে, কিন্তু কতটুকু কি আমাদের করার ক্ষমতা ছিল ?

গিরিবালা দেবী একটা কিছু করতে চাইতেন। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয়া শিক্ষয়িত্রীর একটা কাজের তদবীর করার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। এই কাজের যোগ্যতা তাঁর ছিল। তাঁর চেয়ে অনেক কম লেখাপড়া জানা মেয়েকে আমি এই কাজ করতে দেখেছি। একবার আমি তাঁর এই কাজের জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করার কথাও ভেবেছিলেম। কিন্তু নজরুল ইসলাম রাজী হলো না কিছুতেই। গিরিবালা দেবীর রাজনীতিতে আকর্ষণ ছিল। আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের রাজনীতিতে তাঁকে টানতে পারতেম। কিছু কিছু কাজ আমরা তাঁকে দিচ্ছিলামও। এমন সময়ে আমাদের গিরেফ্‌তারের ফলে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। তখনও ধার্মিক কৃচ্ছ্রতা তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় নি।

নজরুলের ছেলে বুলবুল ১৯২৬ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে কৃষ্ণনগরের "গ্রেস কটেজে" জন্মেছিল। "গ্রেস কটেজ" ছিল

খ্রীস্টান মহিলার বাড়ীটির নাম, যে-বাড়ীতে নজরুল থাকত। নজরুল ছেলের নাম রেখেছিল অরিন্দম খালিদ। বুলবুল তার ডাক নাম। এই নামেই শিশুটি শুধু যে নজরুলের বন্ধুদের নিকটে পরিচিত হয়েছিল তা নয়, সে তাঁদের ওপরে তার অপরিসীম প্রভাবও বিস্তার করেছিল। একটি খুদে জাতুকর ছিল সে। নজরুলের বন্ধুদের সঙ্গে সে চলে যেতো এবং তাঁদের বাড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আবার নিজেদের বাড়ীতে সে ফিরে আসত। অদ্ভুত ছিল তার স্মৃতিশক্তি। একখানা ইংরেজি পাখীর পুস্তক নজরুল কিংবা আর কেউ তাকে দিয়েছিল। সেই পুস্তকে বিরাট সংখ্যক পাখীদের ছবি মুদ্রিত ছিল এবং প্রত্যেক ছবির নীচে ইংরেজি ভাষায় পাখীর নাম লেখা। নজরুল শুধু পাখীদের ইংরেজি নামগুলি তাকে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছিল, হয় তো এক একটি পাখীর নাম একাধিক বার শুনিয়েছিল। তাতেই তার নামগুলি মুখস্থ হয়ে যায়। কেউ বই খুলে তাকে ছবি দেখালেই সে পাখীর ইংরেজি নাম ব'লে দিত। আমি যখনকার কথা বলছি তখন আড়াই বছরের মতো তার বয়স ছিল। অক্ষর পরিচয় তার তখন হওয়ার কথা নয়।

এই বুলবুল মা ও দিদিমা'র চোখের মণি ছিল,—চোখের মণি ছিল সে নজরুলের তামাম বন্ধুদের, যাঁরা তার বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু কেউ জানত না কত গভীর ছিল নজরুলের স্নেহ তার প্রতি। আমি নিজে সর্বদা শিশুদের নিকট হতে শত হস্ত দূরে থেকেছি। তাদের আকর্ষণের নিকটে কখনও আমি ধরা দিতে চাই নি। নজরুলের পানবাগান লেনের বাড়ীতে গিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে আসার সময়ে বুলবুলও সঙ্গে সঙ্গে দোতালা হতে নেমে আসত। গেটে এসে বলত "জেঠা মশায়, আবার এসো।"

মীরাট জেলে গিয়ে বুঝেছিলেম নজরুলের বুলবুল আমার ওপরেও কিঞ্চিৎ জাতু বিস্তার করেছে।

১৯৩০ সালে একদিন মীরাট জেলেই আবতুল হালীমের ছোট

ভাই কাসিমের নিকট হতে (আবতুল হালীম তখন গাড়োয়ান ধর্মঘটের সংস্রবে জেলে সাজা খাটছিল) একখানা পত্র পেলাম যে নজরুলের বুলবুল আর নেই। তুরন্ত বসন্ত রোগে সে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২৪শে বৈশাখ তারিখে (খ্রীস্ট্রীয় হিসাবে ১৯৩০ সালের ৭ই কিংবা ৮ই মে) মারা গেছে। আমার মনের তখন যে-অবস্থা হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার তখন মনে হচ্ছিল যে আমি যদি কাঁদতে পারতাম তবে ভালো হতো। কিন্তু তখনই মনে হলো, বন্ধু-পুত্রের মৃত্যুতে আমার শোকোচ্ছ্বাসের মর্যাদা হয়তো আমার সহবন্দীরা দিবেন না এবং সেটা হবে বুলবুলের স্মৃতির অবমাননা। কাজেই আমি নিজের ভিতরে নিজে গুমরাতে লাগলাম। এই সময়েই আমি মাসী-মাকে (গিরিবালা দেবীকে নজরুল প্রথম পরিচয় হতেই মাসী-মা ডাকত, সেইজন্যে তার বন্ধুরাও তাঁকে মাসী-মা ডাকতেন) একখানা দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেম। আমার এই পত্রখানার কথাই কবি জসীম উদ্দীন তাঁর "ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়" নামক পুস্তকের ১৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

বুলবুলের মৃত্যুতে নজরুল, প্রমীলা ও গিরিবালা দেবী প্রত্যেকেই প্রাণে তুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন, অথচ তাঁদের প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শোকের আঘাত হতে বাঁচাতে চাইছিলেন। তার মানে তাঁরা আপন আপন মনে গুমরে মরছিলেন। পরে গিরিবালা দেবীর সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়েছিল তখন তিনি আমায় বলেছিলেন যে বুলবুলের মৃত্যু তাঁর মন ভেঙে দিয়েছে। তিনি কোথাও চলে যেতে চান, কিন্তু তাঁকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বললেন, "মাঝে মাঝে বাক্স হতে তোমার পত্রখানা বা'র ক'রে আমি পড়ি আর কাঁদি।" তিনিই আমায় বলেছিলেন, অসুখের সময় বুলবুল তার বাবাকে কিছুতেই কাছছাড়া হতে দেয় নি। তার চোখেও বসন্তের গুটি বা'র হয়েছিল। বেঁচে থাকলে বুলবুল অন্ধ হতো। আমি এক এক সময় ভাবি অন্ধ হয়েও বুলবুল যদি বেঁচে থাকত। একজন বড় গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ

তো সে হতে পারত। নজরুল আমায় একদিন বলেছিল যে উস্তাদ জমীরুদ্দীন খানের সঙ্গে যখন তার সঙ্গীতের চর্চা হতো তখন শুনে শুনে বুলবুল তার সব কিছু আয়ত্ত ক'রে ফেলত। এমন ছিল তার স্মৃতিশক্তি। বুলবুলের মৃত্যুর পরেই সকলে বুঝেছিলেন যে কত গভীর ছিল পুত্রের প্রতি নজরুলের স্নেহ ও ভালোবাসা।

গিরিবালা দেবীর ধার্মিক কৃচ্ছ্রসাধন কখন হতে শুরু হয়েছিল তা আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না, আমার মনে হয় বুলবুলের মৃত্যুর পর হতেই তাঁর এই কৃচ্ছ্রতা বেড়ে গিয়ে থাকবে। তিনি কঠোরভাবে একাদশীর উপবাস করতেন, গঙ্গাস্নান করতে যেতেন ইত্যাদি। এই গঙ্গাস্নানের জন্যেই তিনি উত্তর কলকাতা ছাড়তে চাইতেন না। হিন্দু বিধবার জীবনে এই রকম কঠোরতা এসেই থাকে। তিনি যদি রাজনীতিক কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারতেন তবে অন্য কথা ছিল। কিন্তু ধার্মিক কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও গিরিবালা দেবীকে আমি কখনও অনুদার হতে দেখিনি। নজরুলের বন্ধুদের তিনি সেবা-যত্ন করেছেন। দারিদ্র্যের সংসারে তিনি দারিদ্র্যকেই ভূষণ করে নিয়েছেন।

আবদুল হালীমের একখানা পত্র আমি এই পুস্তকে ছেপেছি।

হুগলীতে নজরুলের যে অসুখ হয়েছিল এবং যে-অসুখে তার বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না তাতে গিরিবালা দেবী কত সেবা করেছিলেন তা এই পত্রে আছে। হুগলীতে নজরুল বেঁচে উঠেছিল বটে, কিন্তু তার অসুখের জের কৃষ্ণনগরেও চলেছিল। সে সময়ে গিরিবালা দেবী নজরুলের অশেষ যত্ন নিয়েছেন। তারপরে, ১৯৪২ সালে নজরুলের বর্তমান অসুখ যেদিন শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কী যে তিনি করেছেন নজরুলের জন্যে সেটা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই শুধু বুঝতে পারবেন। যাঁরা দূরে দূরে থেকেছেন তাঁদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। শুধু কি নজরুলের সেবা করতে হয়েছে তাঁকে,—তাঁর নিজের মেয়ে প্রমীলা, সেও তো ছিল শয্যাশায়িনী। নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছিল তার। একই সঙ্গে

মেয়ের সেবাও তো করতে হয়েছে তাঁকে। আবার নাতি দুটিকেও মানুষ করতে হয়েছে, পড়াতে হয়েছে। এরই মধ্যে হয় তো পরিচিতাদের নিকটে টাকা ধার করতেও যেতে হয়েছে তাঁর।

এটা সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে যে নজরুল ইস্‌লামের বিরাট সংখ্যক বন্ধুদের ভিতরে খুব বেশীর ভাগই গিরিবালা দেবীর বিরুদ্ধে কোনো দুর্নাম রটনা করেন নি। খুব বেশীর ভাগই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকেরা যা রটিয়েছেন তা মর্মান্তিক। উনিশ শ' ত্রিশের দশকে নজরুলের হাতে বিস্তর টাকা এসেছে। আবার এই উনিশ শ' ত্রিশের দশকেই (১৯৩৯ সালে) নজরুল তার সব কিছু বন্ধক রেখেছিল শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকটে মাত্র চার হাজার টাকা ধার নিয়ে। গিরিবালা দেবী ও প্রমীলার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ছিল এই যে এত তো টাকা এলো গেলো, তাঁরা তার ভিতর থেকে কিছু টাকা জমালেন না কেন? সব জায়গায় এটাই তো দেখা যায় যে সংসারে মেয়েরা কিছু কিছু টাকা জমিয়ে রাখেন। অভিযোগকারীদের কথা এই ছিল যে তাঁরা যদি কিছু টাকা জমিয়ে রাখতেন তবে নজরুলের অসুখের প্রথম ধাক্কাটা সামলানো যেতো। কিন্তু এটা তাঁরা বুঝতে পারলেন না যে নজরুলের অসুখের শুরুতে তার পরিবারে জমানো টাকা থাকা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এটা সত্য কথা যে উনিশ শ' ত্রিশের দশকে নজরুলের হাতে হাজার হাজার টাকা এসেছিল। সে সব টাকা কি সে তার স্ত্রী ও শাশুড়ীর হাতে তুলে দিয়েছিল? আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পেছনে ও বন্ধুদের জন্যে টাকা খরচ করেনি সে? তবুও না হয় জবরদস্তী ধরে নিলাম যে প্রমীলা ও গিরিবালা দেবী হাজার দু'হাজার টাকা জমা করে রাখতে পারতেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে প্রমীলার অসুখের সময়ে কি হতো? তখনই তো সে টাকা খরচ হয়ে যেতো। প্রমীলার অসুখের সময় হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তার জন্যেই তো শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকটে নজরুলের যথাসর্বস্ব বাঁধা

পড়ল। গানের রয়ালটি পর্যন্ত বাদ গেল না। নজরুলের এই অদ্ভুত ধরনের বন্ধুদের মুখের ভিতরে জিহ্বা ছিল, যেমন খুশী কথা তাঁরা বলতে পারতেন, কিন্তু কত কী যে ঘটে গেল তার কিছুই তাঁরা চোখে দেখতে পেলেন না। মানুষের বিপদের সময়ে কথা শোনানো বাহাদুরীর কাজ নয়। আমি এখানে কবি জসীম উদ্দীনের লেখা "ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়" হতে কিছুটা তুলে দিচ্ছি। জসীম শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীকে "খালা আম্মা" অর্থাৎ মাসী-মা ডাকতেন।

"একদিন বেলা একটার সময় কবিগৃহে গমন করিয়া দেখি খালা আম্মা বিষণ্ণ বদন বসিয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার মুখ আজ বেজার কেন ?"

"খালা আম্মা বলিলেন "জসীম, সব লোকে আমার নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। নুরুর নামে যেখান থেকে যত টাকা-পয়সা আসে, আমি নাকি সব বাক্সে বন্ধ করে রাখি। নুরুকে ভালমত খাওয়াইনা, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি না। তুমি জান, আমার ছেলে নেই ; নুরুকেই আমি ছেলে করে নিয়েছি। আর, আমিই বা কে ! নুরুর দু'টি ছেলে আছে—তারা বড় হয়ে উঠেছে। আমি যদি নুরুর টাকা লুকিয়ে রাখি, তারা তা সহ্য করবে কেন ? তাদের বাপ খেতে পেল কিনা, তারা কি চোখে দেখে না ? নিজের ছেলের চাইতে কি কবির প্রতি অপরের দরদ বেশী ? আমি তোকে বলে দিলাম, জসীম এই সংসার থেকে একদিন আমি কোথাও চলে যাব। এই নিন্দা আমি সহ্য করতে পারিনে।"

"এই বলিয়া খালা আম্মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "খালা আম্মা, কাঁদবেন না একদিন সত্য উদ্ঘাটিত হইবেই।

"খাল্লা আম্মা আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, যে ঘরে নজরুল থাকিতেন সেই ঘরে। দেখিলাম, পায়খানা করিয়া

কাপড়-জামা সমস্ত অপরিষ্কার করিয়া কবি বসিয়া আছেন। খালা আম্মা বলিলেন, "এই সব পরিষ্কার করে স্নান করে আমি হিন্দু বিধবা তবে রান্না করতে বসব। খেতে খেতে বেলা পাঁচটা বাজবে। রোজ এইভাবে তিন-চার বার পরিষ্কার করতে হয়। যারা নিন্দা করে তাদের বোলো, তারা এসে যেন এই কাজের ভার নেয়। তখন যেখানে চক্ষু যায় আমি চলে যাব।" (১৭১-৭২ পৃষ্ঠা)।

আমি এখানে জসীম উদ্দীনের লেখা হতে তুলে দিলাম এই জন্যে যে এই লেখায় এতটুকুও অতিরঞ্জন নেই। এই জাতীয় রটনা নজরুলের বন্ধু মহল হতেই হয়েছে। তার কথা বলার শক্তি লোপ পাওয়ার পরে কেউ কেউ আবার তার নাম নিয়েই রটনা করেছে। আমার নিকটে নজরুলের নাম নিয়ে যখনই কেউ বলতেন যে কি কি বিরূপ মন্তব্য তাঁর নিকটে নজরুল মাসী-মার সম্বন্ধে করেছে তখনই আমি বুঝে নিতাম যে তিনি নিজের মন্তব্যই বলছেন। সুখের বিষয় যে এঁদের সংখ্যা বেশী ছিল না। তবুও আমি ভাবি এই মহীয়সী মহিলা নজরুলের জন্যে কি করলেন, আর প্রতিদানে তার বন্ধুদের কাছ থেকে কি পেলেন তিনি!

গিরিবালা দেবী কাউকে কিছু না বলে একদিন সত্য সত্যই চলে গেলেন। কাউকে মানে আমাদের। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে কলকাতার বিখ্যাত হিন্দু-মুস্‌লিম দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। কয়েক দিন পরে দাঙ্গা থেমে যায়। তারপরে আবার দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এই দ্বিতীয় দাঙ্গা শেষ হওয়ার পরে যখন একটা থমথমে ভাব চলেছিল তখনই চলে গিয়েছিলেন শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী। সম্ভবত সেটা অক্টোবর মাস ছিল। নজরুলরা তখনও শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে রয়েছে। আমি একদিন তাদের দেখতে গেলাম। কিন্তু গাড়ী জোগাড় করে গেলাম এবং হিন্দু নামধারী একজন কমরেডকে গাড়ীর চালক করে তবে গেলাম। বাড়ীর

দরওয়াজায় নজরুলের যে নামের প্লেট্ লাগানো ছিল তা দাঙ্গার সময়ে খুলে ফেলতে হয়েছিল। বড় রাস্তা হতে বাড়ীটি সামান্য ভিতরের দিকে ছিল। তাই বড় রাস্তায় গাড়ী রেখে আমি একাই ওদের বাড়ীতে গেলাম। প্রমীলার অসুখ হওয়ার পর হতে খবর দিয়ে নীচে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তবে আমি ওপরে যেতাম। কারণ, আমাকে প্রমীলার ঘরেই বসানো হতো। তার মানে ঘরটি গোছানোর পরে আমায় ডাকা হতো। সিঁড়ির গোড়া হতে মাসী-মা নিজেই আমায় ডেকে নিতেন। ও-বাড়ীতে সকলে জুতো খুলে ওপরে যেতেন। আমি 'শু' পরি ব'লে মাসী-মা বলতেন, "না বাবা, তোমায় জুতো খুলতে হবেনা।" সেদিন সকাল বেলাতেই গিয়েছিলেম। মাসী-মা আমায় ডেকে নিলেন না। প্রমীলার ঘরে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, তখনও মাসী-মাকে দেখলাম না। আমি ধ'রে নিলাম যে তিনি গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। তারপরে নজরুলকে একবার দেখে, আমি যখন ফিরে আসছিলাম তখন সব্যসাচীও (তার বয়স তখন আঠারো বছরের মতো) আমার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত এলো এবং বলল, "দিদিমা পরশু দিন রাগ ক'রে চলে গেছেন।" তখনই আমি বুঝলাম যা আশঙ্কা করেছিলেম তা সত্যে পরিণত হয়েছে। বড় মনোকষ্ট পেয়ে গিরিবালা দেবী চলে গিয়েছেন। প্রমীলা ধরে নিয়েছিল যে তার মা প্রথমে সমস্তিপুরে ভাইদের বাড়ীতে যাবেন, তারপরে যাবেন কাশীতে। আমি সব্যসাচীকে বললাম, "তোমরা চার দিকে চিঠি-পত্র লিখে খবর নাও। মাসী-মা যেখানেই যান না কেন, আমি নিজে গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনব।" কিন্তু তাঁর ভাইদের বাড়ী থেকে খবর এলো যে সেখানে তিনি যান নি। কোথাও রাস্তা হতে একখানা ছোট্ট পত্র প্রমীলাকে শুধু তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর জন্যে সে যেন কোনো চিন্তা না করে। এখানেই সব শেষ হয়ে গেল। আর কোনো খবর পাওয়া গেল না তাঁর। একবার শুধু প্রমীলাদের কে একজন পরিচিত লোক এসে বলেছিলেন যে তাঁর মনে হলো

তিনি যেন অনেক দূর হতে কাশীতে গিরিবালা দেবীকে দেখেছিলেন। গিরিবালা দেবী (সত্যই তিনি যদি গিরিবালা দেবী হোন) একটি গলিতে ঢুকে গেলেন। সেই ভদ্রলোক আর কিছুতেই তাঁর পাত্তা করতে পারলেন না। জানিনে এই অনিশ্চিত খবরকে গিরিবালা দেবীর শেষ খবর বলা যায় কিনা। বেঁচে থাকলে এখন তাঁর বয়স বাহাত্তর-তিয়াত্তর বছর হবে। কিন্তু বেঁচে কি তিনি আছেন? আজও তিনি যদি বেঁচে থাকেন তবে তিনি কি খবর পেয়েছেন যে তাঁর একমাত্র সন্তান প্রমীলা আর নেই?

পেন্সনের কাগজে এবং আরও অনেক কিছুতে প্রমীলাকে নাম সই করতে হতো। সে সই করত—**প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম।** কাজী নজরুল ইস্‌লামের স্ত্রী হয়ে সে নিজেকে ধন্য মনে করেছিল। ১৯২১ সালে তাকে যখন আমি প্রথম কুমিল্লায় দেখেছিলেম তখন চঞ্চলা না হলেও বড় প্রাণময়ী মেয়ে ছিল সে। ১৯২৬ সালে তাকে যখন আমি আবার দেখলাম, অর্থাৎ নজরুলের স্ত্রীরূপে দেখলাম তখন মনে হলো যে সে তার বয়সের পক্ষে একটু বেশী ধীর, স্থির ও গম্ভীর। তার বয়স তখন ছিল মাত্র আঠারো বছর। সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুপত্নীর পরিবর্তে সম্পর্কটা ছোট বোনের ক'রে নিল।

পরে পরে প্রমীলা কয়েকটি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। পুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে সে পেল প্রথম প্রচণ্ড আঘাত। দ্বিতীয় আঘাতটি এলো তার নিজের শরীরের ওপরে ১৯৩৯ সালে। মাস মনে করতে পারছিনে। তার বাঁচার আশা একেবারেই ছিল না। শেষ পর্যন্ত তার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে সে জীবনে বেঁচে গেল। তারপরে বছরের পর বছর তাকে বিছানায় শুয়েই থাকতে হয়েছে। জীবনে আর কখনও সে উঠে বসতে পারেনি। নজরুল পাগল হয়ে যাওয়ায় সে পেয়েছিল তৃতীয় প্রচণ্ড আঘাত। চতুর্থ প্রচণ্ড আঘাত সে পেয়েছিল

১৯৪৬ সালে যখন গিরিবালা দেবী সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বিবাগী হয়ে চলে গেলেন। এর কোনো আঘাতেরই বেদনার পরিমাণ করা যায় না। জন্মের পর হতে সে কোনো দিন মা'কে ছেড়ে থাকেনি। মা'র ছত্রচ্ছায়াতেই তার জীবনের বছরগুলি একের পর এক কেটে গিয়েছিল। সেই মা যে এমনভাবে চলে গেলেন তার বেদনা কত গভীরভাবে প্রমীলার বুকে বেজেছিল তা আমাদের পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। শুধু কি এই অপরিমেয় বেদনাই? সঙ্গে সঙ্গে নজরুল আর প্রমীলা অকূল সাগরেও ভাসল। গিরিবালা দেবীই তো নজরুলের সব সেবা করতেন। উত্থান-শক্তিহীনা প্রমীলাও তো একান্তভাবে মায়ের ওপরেই নির্ভরশীলা ছিল। কিন্তু আমরা বরাবর প্রমীলাকে গিরিবালা দেবীর ছত্রচ্ছায়ায় দেখেছি। তার ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ আগে কোনো দিন আমাদের ঘটেনি। এইবার সকলে সেই সুযোগ পেলেন। শোক-জর্জরিতা প্রমীলার ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে এবার সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে নজরুলকে সামলাল এবং নিজেরও ব্যবস্থা করে নিল। লোক বেশী লাগল, কাজেই টাকাও বেশী খরচ হলো। কিন্তু ব্যবস্থা সে ক'রে ফেলল। পুরো সংসারটা সে শুয়ে শুয়েই চালাতে লাগল। বাজার করানো, রান্নাবান্না, সকলকে খাওয়ানো-দাওয়ানো এই সব কিছুই চললো তারই তদারকে। তার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গ ছিল সবল। কাৎ হয়ে সে রান্নাঘরের তরকারি কুটে দিত, এমন কি মাছও কুটে দিত সে। কেউ গেলে যদি তার ইচ্ছা হতো যে তাঁকে সে নিজের হাতে চা তৈরী করে খাওয়াবে রান্নাঘর হতে গরম জল আনিয়ে তাও সে করত। টাকা-কড়ির হিসাব-কিতাব সবই রাখত সে। ছেলেরা তো বাড়ী থাকতনা প্রায়ই। কবিকে দেখতে কত কত লোক আসতেন। সে-সব ব্যবস্থাও প্রমীলা করত।

প্রমীলার কাছে আমি বুলবুলের কথা কখনও তুলতাম না।

একবার শুধু কথায় কথায় বলেছিলেম যে ওদের ছেলে অনিরুদ্ধ দেখতে কতকটা বুলবুলের মতো হয়েছে। গিরিবালা দেবীর কোনো খবর কেউ দিলেন কিনা তা হয়তো কোনো কোনো দিন জিজ্ঞাসা করতাম। সব দুঃখ-দুর্ভাগ্য সে মুখ বুজে সহ্য করে যেতো। কী সহনশীলতা যে তার ছিল তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। ১৯৫১ সালে তিন বছরের কিছু বেশী দিন পরে জেল হতে বের হয়ে যখন ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলেম তখন শুধু নজরুলকে দেখিয়ে একদিন সে বলেছিল যে "দেখুন দাদা, কি মানুষ কি হয়ে গেছেন।"

বাইরে থেকে প্রমীলার স্বাস্থ্য ভালোই দেখাত। প্রকৃত বয়সের চেয়ে তার বয়সও অনেক কম দেখাত। মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে মৃত্যু যে তাকে কেড়ে নেবে একথা আমরা কখনও ভাবতে পারি নি। আমার মনে হয় প্রমীলা নিজেও ভাবেনি যে এত তাড়াতাড়ি সে মরবে। কিন্তু রোগ তাকে আক্রমণ করেছিল। ভিড় হয় ব'লে নজরুলের জন্মদিনে আমি তাদের বাড়ী যেতাম না, একদিন আগে কিংবা একদিন পরে যেতাম। ১৯৬২ সালে আমি কিন্তু নজরুলের জন্মদিনেই ওদের বাড়ী গিয়েছিলেম। প্রমীলার কাছে যেতেই সে বলল, "দাদা, একটু পায়ের ধুলো দিন। কাল আমি মরে গিয়েছিলেম, আর তো দেখা হতোনা।" শুনলাম আগের দিন সে দীর্ঘক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল। পুরো জুন মাস বাড়াবাড়ি অসুখ চললো। এর মধ্যে আর একদিন আমি ওদের বাড়ীতে যাই। অল্পক্ষণ পরেই সেদিন সে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি অন্য ঘরে কিছুক্ষণ বসে তারপরে বাড়ী চলে এসেছিলেম। ঘুম থেকে উঠেই সে বৌমাকে (অনিরুদ্ধের স্ত্রীকে) আমায় ডেকে দিতে বলে। বৌমা তখন তাকে জানান্স যে "মা, আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি চলে গিয়েছেন।" বৌমা যদি এই কথাটা টেলিফোনে আমায় সে দিনই জানিয়ে দিত তবে আমি সে দিনই কষ্ট ক'রে আবার যেতাম। তেতালায় উঠতে আমার খুব কষ্ট হয় ব'লে সে আমাকে সে দিন আর খবরটি দেয়নি।

পরে সে যখন আমায় খবরটি জানাল তখন কথা বলার মতো সুস্থ আর আমি প্রমীলাকে পাই নি। কী যে সে আমায় বলতে চেয়েছিল,—নজরুলের কথা, না ছেলেদের কথা, কে জানে?

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে প্রমীলা মারা যায়। সে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৭শে বৈশাখ তারিখে (খ্রীস্টীয় হিসাবে ১৯০৮ সালের মে মাস হবে) জন্মেছিল। আমি আমার মা-বাবার কনিষ্ঠ সন্তান। আমাকে 'দাদা' ডাকার কেউ ছিল না। একমাত্র প্রমীলাই আমায় 'দাদা' ডাকত। তার মৃত্যুতে আমায় 'দাদা' ডাকার আর কেউ রইল না।

প্রমীলার মারা যাওয়ার দু'-তিন দিন পূর্বে সব্যসাচী আমায় জিজ্ঞাসা করল, "জেঠা মশায়, মা'র অবস্থাতো খুবই খারাব। তিনি যদি মারা যান তাঁর অন্ত্যেষ্টি কি ভাবে হবে?" আমি বললাম, "কেন, তোমার মা তো কখনো ধর্মান্তর গ্রহণ করেনি। তাকে তোমরা দাহ করবে। তবে, আমার নিজের মত তাকে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে দাহ করা।"

একটি হিন্দু ছেলে প্রমীলার কাছে থাকত। তার কাজ-কর্ম ক'রে দিত। প্রমীলার মৃত্যুর আগের দিন সেই ছেলেটি সবাইকে এবং ৬৪/এ, আচার্য জগদীশ বসু রোডে আমাদের পার্টি আফিসে এসে আমাকেও বলল যে প্রমীলাকে যেন কবর দেওয়া হয় এই ইচ্ছা তার নিকটে তিনি প্রকাশ করেছেন। কবি প্রমীলার ঘরেই থাকত। সেই ছেলেটি রাত্রে কবি কি করেন, না করেন, তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে প্রমীলাদের দুয়ারের বাইরে বারান্দায় শুত। একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে তার সঙ্গে প্রমীলার অনেক সব কথা হচ্ছিল। সেই সময়ে প্রমীলা তাকে ব'লে দেয় যে তার মৃত্যুর পরে নজরুলের পাশেই যেন তাকে কবর দেওয়া হয়। প্রমীলা বয়সে নজরুলের চেয়ে নয় দশ বছরের ছোট ছিল। সে হয় তো মনে করেছিল যে নজরুলের পরেই তার মৃত্যু হবে। প্রমীলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার

কিছু বলার ছিল না। অন্য কোনো লোকও কিছু বলেন নি। তখন নজরুলের ভাই-পোরা ধ'রে বসল যে তাদের কাকী-মা'কে তারা চুরুলিয়া গ্রামে নিয়ে গিয়ে কবর দেবে। তার মানে মৃত্যুর পরে নজরুলেরও কবর হবে চুরুলিয়ায়। তখন কবি, সাহিত্যিক ও দেশ-প্রেমিকদের তীর্থভূমিতে পরিণত হবে চুরুলিয়া। হয় তো একদিন চুরুলিয়া গ্রাম, চুরুলিয়া পোস্ট আফিস ও চুরুলিয়া রেলওয়ে স্টেশন —সব কিছুই নজরুল ইস্‌লামের নামে হয়ে যাবে। নজরুলের ভ্রাতুষ্পুত্ররা তাদের মনের এই উদ্দেশ্য ও কামনা হতেই প্রমীলার মৃতদেহ চুরুলিয়ায় কবর দিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এতবেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। চুরুলিয়াতেই প্রমীলার কবর হয়েছে।

শেষ কয়েকটি কথা

নানান সূত্র হতে খবর পাওয়া গেছে যে শিশু ও বাল্যকালে নজরুল ইস্‌লাম হাজী পাহালওয়ান নামক একজন ফকীরের কবরের সেবা করেছে। সেবা করার মানে এই যে সে কবরের ধুলো ঝেড়েছে এবং সাঁঝের বেলায় কবরে তেলের বাতি জ্বালিয়েছে। বিচার করে কোনো কিছু বোঝার মতো বয়স তার সেটা ছিলনা। মুরব্বি ও গুরুজনেরা তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে যাঁকে ওখানে কবর দেওয়া হয়েছে দীর্ঘকাল আগে মরে গেলেও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুস্তক হতে আমরা জানতে পেরেছি যে বেশ বড় হয়ে নজরুল যখন রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়ছিল তখন সে গাঁজা কিনে সন্ন্যাসীকে ঘুস দিয়েছে। সন্ন্যাসীর নিকট হতে সে জানতে চেয়েছে যে কোনো একটি বিষয়ে তার কি হবে। ওই রানীগঞ্জেরই হাতবাঁধা ফকীরের বিষয়ে সে "মুক্তি" নাম দিয়ে কবিতা লিখেছে এবং বলেছে যে ঘটনাটি সত্য। বছরের একটা সময়ে নিমগাছের সবপাতা ঝ'রে পড়ে, আবার একদিন রাতারাতি সব পাতা নূতন করে গজিয়েও যায়। এটা আমরা বরাবর দেখে আসছি। কিন্তু নজরুলের কবিতায় ছিল যে নূতন পাতা গজানো হচ্ছে হাতবাঁধা ফকীরের 'কারামত'। এই ভাবে নজরুলের মনে ফকীর ও সাধু-সন্ন্যাসীরা তাঁদের যে অতি প্রাকৃত ও অলৌকিক

কাজ করার ক্ষমতা আছে এই রকম একটা ধারণা তার ছোট বয়স হতেই জন্মিয়ে দিয়েছিলেন।

নজরুলের মনে বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব

এই সব সত্ত্বেও উনিশ শ' বিশের দশকে নজরুল ইস্‌লাম বন্ধু মহলে প্রচার ক'রে বেড়াত যে সে একজন নাস্তিক। প্রচারটা সে মুখে মুখেই করত, এই বিষয়ে কাগজে সে কোনো দিন প্রবন্ধ লেখেনি, অন্তত, আমার তা জানা নেই। তার লেখায় কিন্তু নাস্তিকতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। আদালতে সে যে "রাজবন্দীর জবানবন্দী" দাখিল করেছিল সেটাকে তো 'ভগবান'চর্চিতই বলা যায়। শুধু কি তাই? সেমিটিক ধর্মাবলম্বীরা পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের কথা মানেন। ইস্‌লাম ধর্ম সেমিটিক পরিবারের ধর্ম। তবুও নজরুলের লেখা হতে বোঝা যায় যে সে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করত। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুর (মিত্রের) মেয়ের জন্মদিনে সে লিখেছিল:

"আবার মনের মতন করে
কোন নামে বল ডাকব তোরে?
পথ ভোলা তুই এই যে ঘরে
ছিলি ওরে এলি ওরে বারে বারে নাম হারায়ে॥"

জিনিসটা আমাদের বিচার করে দেখা দরকার। নজরুল ইস্‌লাম যে বন্ধুদের ভিতরে নিজেকে নাস্তিক ব'লে প্রচার করত সেটা সে সরবেই করত। তাতে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই। নজরুলের বন্ধুরা সকলেই তা জানতেন। কিন্তু কেন সে নিজেকে নাস্তিক বলত? শুধু নজরুলের রচনা পড়লেই চলবে না, আমার মতে নজরুলকেও অধ্যয়ন করা আবশ্যক। তখন আমি যা বুঝেছিলেম তা হচ্ছে এই। ১৯২০-২১ সালে নজরুলের ভিতরে অদম্য আবেগ ছিল। নূতন নূতন চিন্তাধারাকে আঁকড়ে ধরার

জন্যে সে তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার ভিতরে যে সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকীরেরা ঘুমিয়েছিলেন তাঁরা তখন জেগে উঠে "না, না" করছিলেন। ১৯২০ সালে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের সহিতও নজরুলের মুখোমুখি পরিচয় হয়। এই পরিচয় অল্প দিনের ভিতরেই খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিণত হয়। জেল হতে মুক্তি পেয়ে আসার পরে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ কোনো রাজনীতিক সংগ্রামে যোগদান করেন নি। তিনি তাঁর দাদা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের চিন্তাধারারই তখন ধারক ও বাহক ছিলেন। তারও কিঞ্চিৎ ছোঁয়া নজরুলের মনে লাগা অসম্ভব নয়। 'ব্যথার দানে'র কথা ধরছি না। তার স্বত্ব বিক্রয় হয়ে গিয়েছিল। নজরুলের পুস্তক প্রথম প্রকাশ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের প্রকাশন ভবন—আর্য পাবলিশিং হাউস। তা থেকে নজরুলের মনে আধ্যাত্মিক ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল একথা আমি বলতে চাইনে, শুধু যোগাযোগের ব্যাপারটা আমি এখানে দেখালাম। সে যে নিজেকে বারে বারে নাস্তিক বলে ঘোষণা করছিল তা ছিল তার আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকত্বের হাত হতে বাঁচার প্রচেষ্টা। তার এই প্রচেষ্টা পুরো উনিশ শ' বিশের দশক তাকে সাধু-সন্ন্যাসী, ফকীর ও ধ্যানী যোগীর হাত হতে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

১৯৩০ সালের মে মাসে নজরুলের পুত্র বুলবুল বসন্ত রোগে মারা যায়। আমি নিজে তখন কলকাতায় উপস্থিত ছিলাম না। যাঁরা তখন কলকাতায় ছিলেন তাঁরা দেখেছেন যে কী গভীর স্নেহ ও আসক্তি নজরুলের পুত্রের প্রতি ছিল। পুত্র-শোক ভোলার জন্যে সে তখন অনেক চেষ্টা করেছে। কবি জসীম উদ্দীন লিখেছেন, তিনি তখন নজরুলকে একদিন খুঁজে পেলেন ডি. এম. লাইব্রেরীর দোকান ঘরের একটি কোণে। পুত্র-শোক ভোলার জন্যে সে সেখানে বসে বসে হাসির কবিতা লিখছিল এবং কেঁদে কেঁদে নিজের চোখ ফুলিয়ে ফেলছিল।

পুত্রের মৃত্যু নজরুলকে ভ্রান্তির শিকারে পরিণত করল

এত করেও নজরুল বাঁচতে পারল না। শোকাতুর পিতার মনে যে দুর্বলতা প্রবেশ করেছিল তার নিকটে সে ধরা দিল। সে গেল লালগোলা হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মজুমদারের নিকটে। আগেই সে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নিকট হতে শুনেছিল যে ত্যাগী যোগী শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনার দ্বারা যেখানে পৌঁছেছেন গৃহী যোগী শ্রীবরদাচরণ মজুমদারও তাঁর সাধনার দ্বারা তার কাছাকাছি পৌঁছেছেন। এটা নিমতিতাতে নজরুলের শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের সহিত দেখা হওয়ার অনেক আগেকার কথা। শুধু মনে শান্তি লাভ করার জন্যে নজরুল এই গৃহী যোগীর নিকটে যায় নি, সে স্থূল দেহে পুত্র বুলবুলকে অন্তত একটিবার দেখতেও চেয়েছিল। ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত নজরুলের পরম বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের লেখা হতে নিয়ে লিখেছেন "বরদাচরণের যোগশক্তির প্রভাবে নজরুল তাঁর মৃতপুত্র বুলবুলকে একবার স্থূলদেহে দেখতে সমর্থ হন।" (নজরুল চরিত মানস, ভারতী সংস্করণ, ১২৫ পৃষ্ঠা)। যে-বুলবুলের স্থূলদেহ মাটির তলায় পচে গিয়েছিল সে কি ক'রে স্থূলদেহ নিয়ে বাবার সামনে হাজির হতে পারল? নিছক একটা ভ্রান্তির ব্যাপার। এখান হতেই নজরুলের সর্বনাশের আরম্ভ হয়েছিল। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের আত্মচরিতে আমি পড়েছি যে বিহারের বিখ্যাত নেতা, সদাকৎ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মুজ্‌হারুল হক সাহেবও পুত্রের মৃত্যুর পরে এভাবে ভ্রান্তির পেছনে ছুটেছিলেন। তিনিও একটিবার স্থূলদেহে পুত্রকে দেখতে চেয়েছিলেন।

"নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়" জুলফিকার হায়দর * সাহেবের

* তিনি নিজে নিজের নাম জুলফিকার হায়দর লিখেছেন। দু'তিনখানা অভিধানে জুলফিকারের উচ্চারণ জুলফকার দিয়েছে। এই জন্যে আমি নিজে সব জায়গায় জুলফকার লিখেছি। (লেখক)

লেখা একখানা পুস্তক। আগে অনেক চেষ্টা করেও এই পুস্তকখানা আমি পাইনি। কাজী সব্যসাচী (নজরুলের ছেলে) যখন আমায় বইখানা জেলে পাঠিয়েছে তখন আমার এ পুস্তকের লেখা শেষ হতে চলেছে। জুলফকার সাহেবের বই পড়ে এখন আমি ভাবছি যে সব্যসাচী বইখানা আমায় না পাঠালেই ভালো হতো। তা হলে এ বই সম্বন্ধে আমায় কিছু লিখতে হতো না। অসুস্থ নজরুলের ও তার পরিবারের জন্যে জুলফকার সাহেব কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আর্থিক ত্যাগও স্বীকার করেছেন তিনি। এমনটা যে তাঁকে করতেই হতো তেমন কোনো বাধ্য-বাধকতার ব্যাপারও ছিল না। নজরুলের বিপুল কবিত্ব শক্তির তিনি ভক্ত ছিলেন। তার জন্যে তিনি নজরুলকে ভালোবেসেছিলেন, আর তাকে ভালোবেসেছিলেন ব'লে তার পরিবারের লোকদের জন্যেও তিনি একটা দায়িত্ববোধের প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। নজরুলদের জন্যে তিনি যতটা করেছিলেন আত্মীয়ের জন্যে আত্মীয় ততটা করতে পারেন না। সেখানে স্বার্থের কথা এসে যায়। বন্ধু ছিলেন বলেই তিনি নিঃস্বার্থে এত কিছু করতে পেরেছিলেন।

তাঁর পুস্তকের লেখাও চমৎকার। অবশ্য, এই মত আমার চেয়েও যোগ্যতর ব্যক্তির প্রকাশ করা উচিত। নজরুলের ব্যাধিগ্রস্ত জীবন সম্বন্ধে এত কথা আর কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। এত সব সত্ত্বেও আমার মনে হয় এই পুস্তক না লিখলেই তিনি ভালো করতেন। তাঁর পুস্তকে মাঝে মাঝে যে মর্মান্তিক সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতা ফুটে উঠেছে তাতে তিনি এমন একখানা ভালো পুস্তককে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন।

নজরুলের সঙ্গে ১৯৩২ সালে তাঁর প্রথম পরিচয়ের দিনেই তিনি তার বাড়ীতে খেয়েছিলেন। তাঁর আর একজন মুসলিম বন্ধু ও নজরুলের সঙ্গে তিনি একত্রে বসেই খেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"তিনজন খেতে বসলাম। কাঁসার থালা, পিতলের

পেয়ালা, গ্লাস—এককথায় নিখুঁত হিন্দুয়ানী পরিবেশ, কায়দা-কানুন, পরিবেশনের ধারা ইত্যাদিও।” (২ পৃষ্ঠা)

আসলে সেদিনই জুলফকার সাহেব মনে মনে আহত হয়েছিলেন। একজন মুস্‌লিম কবির বাড়ীতে একি হিন্দুয়ানী পরিবেশ! তিনি আশা করেছিলেন দস্তরখান, চায়না প্লেট, চিনির পেয়ালা ও কাচের গ্লাস ইত্যাদি। এগুলি হলেই বোধহয় পরিবেশটা মুসলমানী হয়ে যেতো। খাদ্যবস্তুতে তাঁর যে বিশেষ ওজর-আপত্তি ছিল তা মনে হয় না!

মনে হচ্ছে জুল্‌ফকার সাহেব বাঙলা দেশের মুস্‌লিম সমাজের উচ্চস্তরের বাশিন্দা। এই সমাজের নীচের স্তর তিনি কখনও দেখেছেন ব'লে আমার মনে হয় না। যৌবনের আরম্ভে আমি বাকেরগঞ্জ ও খুলনা জিলার গ্রামে গ্রামে মুস্‌লিম কৃষকদের ভিতরে ঘুরেছি। আমার নিজের জিলা নোয়াখালীতেও তাঁদের জীবন আমি দেখেছি। বাকেরগঞ্জ ও খুলনা জিলার গ্রামে দেখেছি সামান্য সচ্ছল অবস্থার কৃষকেরাও কাঁসার থালা, বাটি ও গ্লাস ব্যবহার করেন। তাঁরা খেতেনও পিঁড়িতে বসেই। বিকাল বেলা কারুর বাড়ীতে গেলে আমাকে তাঁরা পিঁড়িতে বসতে দিয়েছেন এবং খেতে দিয়েছেন মুড়ি ও কাঁসার বাটিতে খেজুরের রাব গুড়। আমার নিজের জিলায় চিনির বাসনের চলন ছিল বটে, কিন্তু গরীবরা বেশীর ভাগ ব্যবহার করতেন মাটির বাসন ও মাটির পেয়ালা। আমাদের এমন যে মোল্লা-মৌলবীর সন্দ্বীপ, সেখানেও মুসলমান কৃষকেরা পিঁড়িতে বসেই খেতেন। কলকাতার অভিজাত মুস্‌লিম পরিবারেও আমি দেখেছি যে শিশুদের জন্যে কাঁসার প্লেট্‌, ইত্যাদির ব্যবস্থাই ছিল। অবশ্য, এসব কিছু না জেনেই তিনি নজরুলের বাড়ীতে কাঁসার থালা, বাটি ও গ্লাস ইত্যাদি দেখে মনে এমন প্রচণ্ড আঘাত পেলেন যে ৩২ বছর পরেও তা কিছুতেই ভুলতে পারলেন না।

পুস্তকের দশের পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

“নজরুলের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারটি তাঁর জীবনের একটি

> বড় অভিশাপ। 'বিদ্রোহী'র কবি কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ বিদ্রোহী ছিলেন না এবং তা ছিলেন না বলেই তাঁর জীবনে হিন্দু কিংবা মুসলমান কোন ধর্মেরই আচার অনুষ্ঠান পালন করে চলেন নি। বাড়ীতে তিনি 'ভগবান' এবং 'জল' বলতেন, আবার মুসলমানের সামনে 'আল্লাহ্' এবং 'পানি' বলতেন।"

জুলফক্কার সাহেব তাঁর মনের আসল কথা বলেছেন আরও পরে, তাঁর পুস্তকের তেরোর পৃষ্ঠায়।

> "এ ব্যাপারে বাধাতো শুধু এ টুকুই ছিলো যে নিজের নামটা শুধু বদলে দিয়ে হিন্দু হয়ে গেলেই হতো। অথবা তাঁর স্ত্রীকে মুস্‌লিম স্বামীর মুস্‌লিম স্ত্রীও বানিয়ে নিতে পারতেন।"

হিন্দু নাম গ্রহণ করলেও নজরুল যে হিন্দু হয়ে যেতে পারত না একথা জুল্‌ফকার সাহেব জানেন। তাঁর মনের আসল বাসনা এই যে প্রমীলা যখন নজরুলকে বিয়ে করলই তখন সে কেন ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিতা হলোনা? আর, মেয়ে মুসলমান হলে মা'ই বা হতে পারতেন না কেন? অবশ্য জুলফকার সাহেব শেষের কথাটা লেখেন নি। ওটা আমি জুড়ে দিয়েছি। তিনি বড় দেরিতে নজরুলের সংস্রবে এসেছিলেন বলে নজরুলের জীবনের খবর কমই রাখেন। প্রমীলা ও গিরিবালা দেবীর সম্বন্ধে নিজের মনে বিরূপ ধারণা বদ্ধমূল ক'রে নেওয়ার আগে তাঁর উচিত ছিল এটা জেনে নেওয়া যে নজরুল তার বিয়ের আগে কোন্ 'আচার অনুষ্ঠান' মেনে চলত। তা হলে তিনি বুঝতে পারতেন যে নজরুল তার বিয়ের আগেও কোনো আচার অনুষ্ঠান মেনে চলতনা, বিয়ের পরেও না। জুলফকার সাহেবের, হয়তো তাঁর আরও কোনো কোনো বন্ধুরও, মনের ভাবখানা এই যে দু'জন হিন্দু নারীর জন্যে তাঁরা তাঁদের মুস্‌লিম নজরুলকে হারালেন। আগেকার খবর জানা থাকলে তাঁদের মনে এই ভাবের উদয়ও হত না।

মুশ্‌কিল এই হয়েছে যে জুলফকার সাহেবেরা প্রমীলা ও নজরুল ইস্‌লামের বিয়ের ব্যাপারটাই বোঝেন নি। এই পুস্তকে তাদের বিয়ের বিষয়ে যে-অধ্যায়টি আমি লিখেছি তাতে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। তাঁরা যদি দয়া করে একটি বার তা পড়ে নেন তবে ব্যাপারটা তাঁরা বুঝতে পারবেন। ভারতের মুসলমান মুঘল বাদ্‌শাহ্‌দের হিন্দু বেগমেরা ছিলেন। তাঁরা অন্দর মহলে হিন্দু দেব-বিগ্রহ স্থাপন করে ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা করতেন। তাতে কারুর নামাজের ব্যাঘাত ঘটেনি। এই বেগমদের গর্ভে জন্ম-নেওয়া শাহ্‌জাদারা সিংহাসনের অধিকারীও হয়েছেন। "দেবতার বেলা লীলা-খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা", এটা কি করে চলতে পারে? কিন্তু জুলফকার সাহেব তাই চালিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করার জন্যে ব্যস্ত যে হিন্দু পরিবেশের জন্যেই কবি নিরাময় হচ্ছিল না। তিনি একদিন অধ্যাপক আবদুল খালেক এম. এ.-কে কবির বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। কবিকে দেখেই অধ্যাপক সাহেব হাত তুলে আল্লার নিকটে 'দোওয়া করলেন' এবং ফেরার পথে তিনি জুলফকার সাহেবকে বললেন যে "এই পরিবেশে কবির রোগ নিরাময়ের আশা একেবারেই অসম্ভব।" কেন অসম্ভব? কেন না "মুসলমান কবি, অথচ পরিবেশ সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী"। একজন বি. এ. পাশকরা পীর জনাব আবদুর রশীদ সাহেবও এই একই রকম মন্তব্য করলেন। (১৭৬ পৃষ্ঠা)। এখানেই জুলফকার সাহেবের মনের আসল পরিচয় পাওয়া যায়। এই মন নিয়েই তিনি নজরুলের সেবা করতে গিয়েছিলেন!

জুলফকার সাহেব ও আমি

জুলফকার সাহেব আমার সম্বন্ধে তাঁর পুস্তকে কিঞ্চিৎ ভুল তথ্যের পরিবেশন করেছেন। লিখেছেন আমি নজরুলের বাড়ীর ঠিকানা জানতাম না। তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করি যে তিনি যেন আমাকে একদিন তাঁর সঙ্গে নজরুলের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং তিনি আমায় একদিন সত্যসত্যই সঙ্গে নিয়েও গিয়েছিলেন। এখানে আমি

সবিনয়ে তাঁকে জানাতে চাই যে তাঁর স্মৃতি-বিভ্রম ঘটেছে। নজরুলের ঠিকানার জন্যে আমি কোনো দিন তাঁর নিকটে যাইনি। এমন দুর্ভাগ্য আমার কি করে হয়েছিল যে নজরুলের ঠিকানার জন্যে আমায় জুলফকার সাহেবের ঠিকানায় যেতে হয়েছিল? তাঁর ঠিকানাও তো আমার জানা ছিলনা। নজরুল কলকাতার যে-ঠিকানাতেই থাকুক না কেন, তার ঠিকানা আমি জানবই। তাঁর সঙ্গে আমি নজরুলের বাড়ীতে যাইও নি। সত্য কথা হচ্ছে এই যে নজরুলের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আমার একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল। এই দেখা হওয়ার আগে নজরুলদের শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে আমি বহুবার গিয়েছি। আমার আত্মগোপন করে থাকার সময়েই নজরুলরা শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে উঠে এসেছিল। ওই অবস্থা হতে বের হয়ে এসেই আমি তাঁদের ঠিকানা জেনেছিলেম। ওই বাড়ীর মালিকদের ভিতরে আবার আমার চেনা লোকও ছিলেন। ও-বাড়ীতে যেদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সেদিন ওখানে আরও অনেকে ছিলেন। আব্বাস উদ্দীনও ছিলেন। আশ্চর্য এই যে নজরুলের ওই অসুস্থ অবস্থাতেই তার একটি চাকরীর কথা হচ্ছিল। লোক-সঙ্গীতের কিংবা ওই জাতীয় কিছু একটা ব্যাপার। সেই চাকরীতে আব্বাস উদ্দীন তার সহকারী হওয়ার কথা ছিল। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা নানা রকম ফর্মে নজরুলের সই নিচ্ছিলেন। চাকরীটা ভারত গবর্নমেন্টের, কিন্তু কাজ করতে হবে বাঙলা দেশে এবং আফিস হবে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ। মিস্টার আহ্‌মদ শাহ্‌ বুখারী তখন অল্‌-ইণ্ডিয়া রেডিওর ডিরেক্টর জেনেরেল ছিলেন। তিনি ছিলেন নজরুলের কবিতার একজন ভক্ত। তার কবিতা, সম্ভবত কবিতার অনুবাদ, তিনি পড়তেন। এই যে চাকরীটি, তার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। যদিও হঠাৎ এক এক সময়ে নজরুলকে ভালো মনে হতো তবুও চাকরী করার মতো অবস্থা তার ছিল না। শুনেছিলেম একদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে নজরুল শুধু বসেইছিল।

সে কারুর সঙ্গে কোনো কথা পর্যন্ত বলেনি। তার চাকরীর এই প্রথম দিনটি তার শেষ দিনও ছিল।

আমি যে কথা বলছিলেম তা থেকে সরে এসেছি। জুলফকার সাহেবকে সেদিনের আরও কথা আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। সেই গোলমালের ভিতরে তিনি যখন নজরুলের নিকট হতে বিদায় নিতে গেলেন তখন সে তাঁকে বলল, "তুমি থেকো। আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতে যাব।" তাতে জুলফকার সাহেব বড় বিব্রত বোধ করেন। তিনি প্রমীলার ঘরে গিয়ে এই বিব্রত অবস্থাতেই বলেছিলেন, "দাদা আমাদের বাড়ীতে যেতে চাইছেন। তা হলে আমাকে এখন গিয়ে তো সব ব্যবস্থা করতে হয়।" জনাব জুলফকার হায়দর সাহেব! একটিবার নিজের স্মৃতিকে আলোড়িত ক'রে দেখুন ত এই কথাগুলি আপনার মনে পড়ে কিনা। অবশ্য, পরে নজরুল জুলফকার সাহেবের বাড়ীতে যায়নি।

হাঁ, জুলফকার সাহেবের সঙ্গ লাভের জন্যে আমি চীৎপুরের ট্রামে সেদিন ফিরেছিলেম। তা না হলে শ্যামবাজার ডিপোতে গিয়েই আমার ট্রামে চড়ার কথা। কারণ আমি তখন থাকতেম ৭৫ নম্বর চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে। বাড়ীটি ছিল ইস্‌লামীয়া হস্‌পিটালের পাশে। নিউ ইয়র্ক সোডা ফাউনটেইনে আমরা যে চা খেয়েছিলেম একথাও সত্য। দামটাও জুলফকার সাহেবই দিয়েছিলেন। আমার বাসায় এসে জুলফকার সাহেব একদিন-দু'দিন আমায় পাননি, তাঁর বাসায় গিয়ে একদিন আমি তাঁকে পাইনি, এটাও সত্য কথা। কিন্তু একথা তিনি তাঁর পুস্তকে কোথাও বলেন নি যে ৭৫ নম্বর চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে তিনি একদিন আমায় পেয়েছিলেন এবং অনেক কথাও হয়েছিল তাঁর সঙ্গে আমার। সে দিনই তিনি আমায় বলেছিলেন যে নজরুল তাঁকে বলেছিল যে তার শাশুড়ী একটি "রাঘব বোয়াল।" এই কথাটি আমি বিশ্বাস করি নি, কিন্তু এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে বৃথা তর্কও করি নি। আমি জানতাম নজরুল পাগল হয়েছিল বলেই তিনি

কথাটা বলতে পেরেছিলেন। তবে, তিনি তাঁর পুস্তকে কিঞ্চিৎ ঘুরিয়ে (১৫ পৃষ্ঠা) কথাটা না লিখলে আমি কখনও এই কথা এখানে লিখতাম না। এতকাল আমি কাউকে একথা বলিওনি। মানুষকে অনেক বিষ পান ক'রে ক'রে নীলকণ্ঠ হতে হয়।

১৯৪৩ সালে তিনি যে কমিউনিস্ট পার্টির তহবীলে একশত টাকা দান করেছিলেন এটা সত্যে কথা। টাকাটা তিনি কমরেড আবদুল হালীমের হাতে দিয়েছিলেন, না, আমার হাতে, তা এখন আমার মনে নেই। আর, ১৯৪৩ সালে আমাদের 'দলীয় পত্রিকা' "স্বাধীনতা"র জন্যে তিনি টাকা দিতে পারেন না। কারণ, 'স্বাধীনতা' তখন আমাদের মনেও জন্ম নেয় নি।

কালীপদ গুহরায় ও জুলফকার হায়দর

নজরুল ইস্‌লাম অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে তার পরিবার যে দুরবস্থায় পড়েছিল তাঁদের সেই দুর্দিনে কালীপদ গুহরায়ও ওই পরিবারের একজন অকৃত্রিম সুহৃৎ ছিলেন, একা জুলফকার হায়দর সাহেব ছিলেন না। আশ্চর্য এই যে জুলফকার সাহেবের পুস্তকে তাঁর নামোল্লেখও নেই। তিনি কোনো এক কালীপদ গাঙ্গুলীর কথা লিখেছেন। আমি ধরে নিতে পারতাম যে তিনি গুহরায়কে ভুল ক'রে গাঙ্গুলী লিখেছেন। কিন্তু তারও উপায় নেই। কারণ, কে. পি. গাঙ্গুলী স্বাক্ষরিত তাঁকে লেখা একখানা ইংরেজি পত্রও তিনি তাঁর পুস্তকে (১৯৯ পৃষ্ঠা) ছেপেছেন। অথচ, এই নামের কোনো লোকই নজরুলের পরিবারের সঙ্গে সংসৃষ্ট ছিলেন না। একমাত্র জুলফকার সাহেবই বলতে পারেন এই ইংরেজি পত্রখানা তিনি কোথা হতে পেলেন?

শ্রীকালীপদ গুহরায় নজরুলের পরিবারের জন্যে জুলফকার সাহেবের চেয়ে কম কিছু করেন নি। বরঞ্চ অনেক বেশীই করেছেন। জুলফকার সাহেব পরিবারের ঘোর দুর্দিনে তার সাহায্যে তিন বছর লিপ্ত ছিলেন, আর কালীপদ গুহরায় লিপ্ত ছিলেন তার চেয়েও ঢের

ঢের বেশী দিন। এক সময়ে তিনি নজরুলের বাড়ীতে থাকতেনও। আমি যতটা শুনেছি নজরুলের জন্যে আর্থিক ত্যাগও তিনি জুলফকার সাহেবের চেয়ে অনেক বেশী স্বীকার করেছেন। সেই সময়ে নজরুলের অসহায় পরিবারের কালীপদ গুহরায়ই প্রকৃত অভিভাবক ছিলেন। তিনি নজরুলের পুরানো বন্ধু, অবশ্য সাহিত্যিক বন্ধুই। রাজনীতিতে তিনি ও অমলেন্দু দাশগুপ্ত এক দলের লোক ছিলেন। অমলেন্দু দাশগুপ্তের সহিতও নজরুলের গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। নজরুল যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌টারমেডিয়েট পরীক্ষার বাঙলার পরীক্ষক হয়েছিল তখন হতেই ভিতরে ভিতরে নজরুলের অসুখের সূচনা হয়েছিল। বাইরে থেকে তা বোঝা যেতোনা। তাই সে কালীপদ গুহরায়ের সাহায্য নিয়েই খাতা পরীক্ষা করেছিল। নজরুলের ছেলে দু'টি যে ছোট থেকে বড় হতে হতে ইন্‌টারমেডিয়েট অবধি পড়ল তাতেও কালীপদ গুহরায়ের অবদান ছিল। অথচ জুলফকার সাহেবের পুস্তকে তেমন কোনো স্বীকৃতিই নেই এ সবের।

লুম্বিনীতে নজরুলের চিকিৎসা সম্বন্ধে জুলফকার সাহেব যা লিখেছেন তা বাইরে আমরা যা শুনেছি তার সঙ্গে মিলছে না। আমি এখন বন্দীদশায় রয়েছি বলে বাইরের সঙ্গে মুকাবিলা করার সুযোগ আমার নেই। কিন্তু ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যে নজরুলের চিকিৎসা করেছিলেন সেই কথাটা জুলফকার সাহেবের পুস্তকে নেই কেন? নজরুলের চিকিৎসার ব্যাপারে এটাই তো বিশিষ্ট খবর।

আর একটি কথা। মাওলানা মুহম্মদ আকরম খান সাহেব কি সত্যই নজরুলের না'ত-ই-রসূলের (হজরত মুহম্মদের প্রশংসা গীতির) তারিফ করেছিলেন? পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর লেখায় পড়েছিলেম যে তিনি অনেকগুলি উর্দু না'তের কঠোর বিরুদ্ধবাদী। কাওয়ালদের গাওয়া কোনো কোনো উর্দু না'তকে তিনি কৃষ্ণলীলার সঙ্গে তুলনা করতেন। তিনি মুহম্মদী জমাআতের লোক, যে-জমাআত ধর্মের ব্যাপারে কঠোর বিশুদ্ধতা রক্ষার পক্ষপাতী। এই জমাআতের

প্রবর্তক মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহাব তো হজরত মুহম্মদের কবরকে ভেঙে দিয়ে ভূমির সমান করে দিতে চেয়েছিলেন এই জন্যে যে, কবরটিকে উঁচু দেখতে পেয়ে কেউ তার পূজা শুরু করে দিতে পারেন। হতে পারে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মতের পরিবর্তন হয়েছিল।

আব্বাস উদ্দীন সাহেবের ফর্মায়েশে নজরুল ইস্লাম তার ইস্লামী সঙ্গীতগুলির রচনা শুরু করেছিল। আব্বাস সাহেব নিজেই সে কথা লিখে গেছেন। এই গানগুলি পয়সা এনেছিল। অনেক হিন্দু সুর-শিল্পীও গানগুলি রেকর্ডে গেয়েছিলেন। কোনো হিন্দুর এই গানগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার কারণ আমি বুঝিনা। গোঁড়া মুসলমানরা অবশ্য আপত্তি তুলতে পারতেন। এই গানগুলি লেখার জন্যে শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী যে নজরুলকে বাক্যবাণে বিঁধেছিলেন তা কি জুলফকার সাহেব নিজের কানে শুনেছিলেন? নিজে না শুনলে কার মুখ থেকে তিনি কথাটা শুনেছিলেন তা তাঁর বলা উচিত ছিল।

জুলফকার হায়দর সাহেব বহু দীর্ঘ বৎসর তাঁর মনে প্রমীলা ও গিরিবালা দেবী সম্বন্ধে বিরূপতা পোষণ ক'রে আসছেন। গিরিবালা দেবীর চলে যাওয়ার ও প্রমীলার মারা যাওয়ার পরেও তাঁর বিরূপতা যায় নি। আবার তাঁর পুস্তকে তিনি তাঁদের উচ্চ প্রশংসাও করেছেন। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় তাঁর এই প্রশংসা তাঁর মনের অনুভূতি মিশানো। এই কূট ব্যাপার যে কি ক'রে মানুষের মনে ঘটে তা আমি বুঝি না।

আমি সবিনয়ে দু'টি ঐতিহাসিক তথ্যের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। মহাকবি ফিরদৌসী পারস্যের শিরাজনগরের লোক ছিলেন না। কিন্তু জুলফকার সাহেব লিখেছেন তিনি শিরাজের লোক।

খৎনা (ত্বকচ্ছেদ) কি মুসলমানদের অবশ্য করণীয় (ফর্‌জ্) ? আমি তো শুনেছিলেম নয়। খৎনা ইহুদীদের ভিতরে প্রচলিত একটি

নিয়ম, মুসলমানরাও মেনে চলেন, এই তো আমি জানতেম। তবে, শারীরতত্ত্বের দিক হতে নিয়মটা ভালো। জুলফকার সাহেব এর জন্যে এত বেসামাল হলেন কেন?

নজরুল ইস্‌লামের পরিবারের সঙ্গে আবদুল হালীম ও আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। কিন্তু পরিবারের দুর্দিনের সময়ে আমরা

নজরুলের দুর্দিনে আমরা—আবদুল হালীম ও আমি

ব্যক্তিগতভাবে কিংবা আমাদের পার্টির (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির) তরফ হতে এগিয়ে গিয়ে কবির পরিবারের সব দায়িত্ব, অন্তত কিছু কিছু দায়িত্বও, আমাদের হাতে তুলে নিলাম না কেন? কমিউনিস্ট পার্টির যে বিশেষ রাজনীতি ছিল তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। শ্রীকালীপদ গুহরায় ও শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্তের সেই সময়ে (১৯৪৩ সালে) কোনো সক্রিয় রাজনীতি ছিল কিনা তা আমি জানিনে। কিন্তু একটা রাজনীতিতে সেই সময়ে তাঁদেরও অটল বিশ্বাস ছিল। সেই রাজনীতি আর আমাদের রাজনীতিতে ছিল প্রচণ্ড সংঘাত। আমরা এগিয়ে গিয়ে কিছু কাজ-কর্মের ভার নিলে শ্রীকালীপদ গুহরায় থাকতেন না। কত আগে হতে আমাদের অনুপস্থিতিতেও তিনি নজরুলের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর জুলফকার হায়দর সাহেব যতই যা কিছু বলুন না কেন শ্রীগুহরায়ই ছিলেন তখন পরিবারের অভিভাবক। তাঁকে চলে যেতে দিয়ে আমরা কিছু করতে চাইলে নজরুলের পরিবারকেই অনেক অসুবিধায় পড়তে হতো। জুলফকার সাহেবকে কালীপদ গুহরায় ও অমলেন্দু দাশগুপ্ত বরদাশ্‌ত্‌ করতেন। কারণ, তাঁর কোনো রাজনীতি ছিল না। তা'ছাড়া তাঁর মনে যেমন আধ্যাত্মিক ঝোঁক ছিল তেমন ঝোঁক গুহরায় ও দাশগুপ্তরও ছিল, হয় তো তাঁর চেয়ে বেশী ছিল। নজরুলের পরিবারকে আমি অসুবিধায় ফেলতে চাই নি। কাজেই, আমি শুধু মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁদের দেখে এসেছি। কখনো কখনো কেউ না কেউ আমার নিকটে নজরুলের

জন্যে সামান্য টাকা (এক সঙ্গে দশ-বিশ টাকার বেশী নয়) পাঠিয়েছেন। মনে আছে একবার মাত্র কবি অনিল কাঞ্জিলাল ও কবি গোলাম কুদ্দুস কোথাও হতে জোগাড় ক'রে আমায় একশ' টাকা দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সব টাকা আমি প্রমীলার হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছি।

নজরুলের রোগের প্রথম সূচনা কখন হয়েছিল তা বলা কঠিন। সে নিজে নিশ্চয় তার ভিতরে এই রোগের আবির্ভাবটা অনেক আগে টের পেয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে যদি কোনো বিশিষ্ট চিকিৎসকের নিকটে যেত তা হলে আজ আমাদের দেশ তাকে এই ভাবে হারাত না। তা হলে আমরা আমাদের চোখের সামনে আজ এক জীবন্মৃত নজরুলকে দেখতে হ'ত না। দেশের কত দুর্ভাগ্য যে নজরুলের যখন বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ছিল তখন সে আশ্রয় নিয়েছিল আধ্যাত্মিকতার কোটরে। এই আধ্যাত্মিকতা যে কি তা আমি জানিনে, তবে তা রোগের ঔষধ নয়। রোগের ঔষধ হচ্ছে বড়ি, মিক্‌চার কিংবা সূচের ভিতর দিয়ে শরীরের ভিতরে তরল পদার্থ ঢোকানো। নজরুল গোড়ায় তা না ক'রে রোগকে বাড়তে দিল।

৯ই জুলাই ১৯৪২ তারিখে নজরুলের অসুখ সকলের নিকটে ধরা পড়ে।

গিরেফ্‌তার এড়াবার জন্যে আমি ১৯৪০ সালের মে মাস হতে আত্মগোপন ক'রে কাজ করছিলেম। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে দৈনিক 'নবযুগে' কাজ করেন এমন একজন বন্ধু আমার গোপন বাসস্থানে খবর পাঠালেন যে "কাজী নজরুল ইস্‌লাম হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। কথা বলার সময়ে তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে তাঁকে মধুপুরে বিশ্রাম ও বায়ু পরিবর্তনের জন্যে পাঠানো হয়েছে।" নজরুল এই সময়ে দৈনিক 'নবযুগে'র সম্পাদক ছিল।

আমার ওপর হতে গিরেফতারী পরওয়ানা উঠে যাওয়ার পরে আমি যখন শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়ে গিরিবালা দেবী ও প্রমীলার সঙ্গে দেখা করার প্রথম সুযোগ পেলাম তখন নজরুল লুম্বিনী পার্কে রয়েছে। কলকাতার উপকণ্ঠে লুম্বিনী পার্ক মানসিক ব্যাধির একটি প্রাইভেট হস্‌পিটাল। গিরিবালা দেবী জানালেন যে শীঘ্রই নজরুলকে বাড়ীতে নিয়ে আসা হবে। সাবান ইত্যাদি চেয়ে সে যে চিঠি লিখেছিল সে কথাও তিনি বললেন। নজরুলকে লুম্বিনী হতে ফিরিয়ে আনার দু'একদিনের ভিতরেই আমি তাকে দেখতে যাই। সে তখন আমায় চিনতে পেরেছিল, আমার সঙ্গে কথাও বলেছিল। বলেছিল, তার বড় কষ্ট হচ্ছে। কথায় তেমন কোনো আড়ষ্টতাও আমি সেদিন লক্ষ্য করিনি। গিরিবালা দেবী আমায় বললেন নজরুলের প্রথম অসুখ কোথায় ও কি ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। আমার কি জানি কেন ধারণা জন্মেছিল যে কোনো একটি সভায় ব্যাপারটি ঘটেছিল। পরে যাচাই করে জেনেছি যে সভায় নয়, অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশনে। আগে হতেই গিরিবালা দেবী ও প্রমীলা নজরুলের কথায় একটা আড়ষ্টতা লক্ষ্য করেছিলেন। এই জন্যে সে দিনকার রেডিওর প্রোগ্রামটি শোনার জন্যে তাঁরা উদগ্রীব হয়ে বাড়ীতে বসেছিলেন। অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর স্টেশনে বলতে গিয়ে নজরুল কিছুই বলতে পারছিল না। তার জিহ্বা কেবলই আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে তখনই ঘোষণা ক'রে দিল যে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রোগ্রামটি আর একদিন হবে। কিন্তু অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে যাওয়ার সে দিনই ছিল নজরুলের শেষ দিন। এদিকে বাড়ীতে প্রমীলা ও গিরিবালা দেবী রেডিওর কাছেই অপেক্ষা করছিলেন। নৃপেনের ঘোষণা শুনেই তাঁরা কাঁদতে লাগলেন এবং বুঝলেন যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। সেই রাত্রে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ই কবিকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। হিসাব

কবির জন্মদিনে নজরুল ইস্‌লাম ও লেখক

ক'রে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এই ঘটনা ৯ই জুলাই (১৯৪২) দিন গত রাত্রে ঘটেছিল। তার পরের দিন (১০ ই জুলাই, ১৯৪২) সকালে কবি নিজের হাতে জুলফকার হায়দর সাহেবকে যে পত্র লিখেছিল তাতে সে লিখেছে যে "আমি কাল থেকে অসুস্থ"। পত্রে তারিখ দেওয়া আছে ৭-১০-৪২ । আসলে ১০-৭-৪২ এর স্থলে নজরুল ভুলে ৭-১০-৪২ লিখেছিল। নজরুলের অসুখটাই জুলাই মাসে যে প্রকাশ পেয়েছিল, অক্টোবর মাসে নয়, সেটা আমি 'নবযুগ' আফিস হতে পাওয়া এক পত্রে জুলাই মাসেই জানতে পেয়েছিলেম। ক'দিন পরে নজরুল জুলফকার হায়দর সাহেবকে যে পত্র লিখেছিল তাতে সে ঠিক তারিখই লিখেছিল ১৭-৭-৪২। তা'ছাড়া নজরুলরা মধুপুর হতে কলকাতায় ফিরে এসেছিল ১৯৪২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে। অসুখ ধরা পড়ার পরেই তারা মধুপুর গিয়েছিল। কাজেই জুলফকার সাহেবকে নজরুল ১০ই জুলাই তারিখে পত্র লিখেছিল, কোনো অবস্থাতেই ৭ই অক্টোবর তারিখে নয়। এই হিসাব হতে আমরা নিশ্চিতরূপে ধরে নিতে পারি যে ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই তারিখে নজরুলের অসুখটা সকলের নিকটে প্রথম ধরা পড়েছিল, যদিও অসুখ অনেক আগেই হয়েছিল। আমি জানিনে, জুলফকার সাহেব কেন অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর ঘটনাটা তাঁর পুস্তকে লিখলেন না।

এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে যে প্রমীলার অসুখের সময় হতেই (১৯৩৯) নজরুল ইস্‌লাম দারুণ অর্থ-সঙ্কটে পড়েছিল।

সে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে তার পরিবারে দুঃখের আর শেষ থাকল না। এই সময়ে (আমি ১৯৪৩ সালের কথা বলছি) নজরুলকে, অর্থাৎ নজরুলের পরিবারকে সাহায্য করবার জন্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। আমি খবরের কাগজে পড়লাম যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই কমিটির সভাপতি ও শ্রীসজনীকান্ত দাস তার

সাহায্য কমিটি গঠন

সেক্রেটারি হয়েছেন। এখন জুলফকার সাহেবের পুস্তকে কমিটির সভ্যগণের নাম ছাপা হয়েছে। আরও দেখতে পাচ্ছি যে শ্রীসজনীকান্ত দাস ও জনাব জুলফকার হায়দর সাহেব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন। কিন্তু আসলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই সব কিছু করতেন। আমি যতটা বুঝতে পেরেছিলেম, এখন জুলফকার সাহেবের লেখার দ্বারাও তা সমর্থিত হচ্ছে, তাতে ডক্টর মুখার্জিই টাকাটা জোগাড় করে দিচ্ছিলেন। নজরুল ইস্‌লামের কবিত্ব শক্তির প্রতি তিনি বরাবরই শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।

এই কমিটি গঠনের কথা খবরের কাগজে পড়ে আমার ইচ্ছা হয় যে শ্রীসজনীকান্ত দাসের সঙ্গে একবার দেখা করে আমি জেনে নেব যে তাঁরা কি ভাবে কি ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। আমি তাই সজনীকান্তের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে কমরেড গোপাল হালদারকে অনুরোধ করি। আমি জানতামনা যে কমরেড গোপাল হালদারও কমিটির একজন সভ্য। তিনি নিজেও জানতেন কিনা আমার তাতে সন্দেহ আছে। মোটের ওপরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কমরেড গোপাল হালদার একদিন শ্রীসজনীকান্ত দাসের বাড়ীতে গেলেন। তিনি আমায় আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করেছিলেন এবং তখন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এসে যাওয়ায় আমার মুখের সামনে আমার অনেক প্রশংসাও তিনি করেছিলেন। অবশ্য, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আগে হতেই আমার পরিচয় ছিল। যা'ক, নজরুল সাহায্য কমিটি সম্বন্ধে সজনীকান্তের সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হলো। বুঝলাম তিনি শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীর ওপরে খুশী নন। বললেন, নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পরে তিনি কিছুদিন তার সঙ্গে মাতামাতি করেছিলেন। একদিন তার কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি হওয়ায় গিরিবালা দেবী তাঁকে কটু কথা শুনিয়ে দেন। তারপর হতে তিনি নজরুলের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে

দিয়েছিলেন। নজরুলের সঙ্গে মাতামাতির মাত্রাও কমিয়েছিলেন। কমিটি হতে মাসে মাসে দেড়শ' টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, আমার মনে পড়ে এই কথাই আমি সজনীকান্তের মুখে শুনেছিলেম, মাসী-মা'র মুখেও এই একই কথা শুনেছিলেম ব'লে আমার মনে পড়ে। কিন্তু জুলফকার সাহেব তাঁর পুস্তকে দু'শ' টাকার কথা লিখেছেন। এই নিয়ে আমি তর্ক করতে চাইনে। সজনীকান্ত আমায় বললেন, প্রথম মাসের টাকা তিনি নিজেই নজরুলের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তখনও নজরুলের কিছু কিছু জ্ঞান ছিল, সজনীকান্তকে চিনতেও পেরেছিল। সজনীকান্ত বললেন, নজরুল সেদিন তাকে বলেছিল, "আমার কিছু হ'লোনা।" উত্তরে সজনীকান্ত বলেছিলেন, "কেন, তুমি মুসলমানদের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।" সজনীকান্তের এই কথাটা আমার সেদিন ভালো লাগেনি। নজরুল আরও সজনীকান্তকে বলেছিল, "সুর? সুর কি টিকে থাকবে?" দেড়শ' টাকার সাহায্য বরাদ্দ হওয়ায় মাসীমা প্রমাদ গুণলেন। কী ক'রে চালাবেন তিনি সংসার এত কম টাকায়? তিনি আমায় ডেকে বললেন, "তুমি কি তহবীলের জন্যে একটা আবেদন জানাতে পার না? আমি বললাম, "মাসীমা, এই কমিটি থাকতে তা করাটা আমার পক্ষে উচিত হবে না।" তারপরে, কালীপদ গুহরায়দের ব্যাপারও ছিল। আমার নিকটে হতাশ হয়ে তিনি নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ করে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একখানা পত্র লিখেছিলেন। এই পত্রখানাও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সজনীকান্তকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আলোচনা হতে বুঝলাম, সজনীকান্ত গিরিবালা দেবীর এই পত্রের জন্যেও ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। বললেন, 'প্রায় না খুলেই' ডক্টর মুখার্জি পত্রখানা তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর পরে সজনীকান্ত যে-কথা আমায় বললেন, তাতে আমি বুঝেছিলেম যে এই কমিটি বেশী দিন টিকবে না। যে-কোনো অছিলাতে কমিটি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। সজনীকান্ত আমায়

জানালেন যে তিনি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে জানতে চেয়েছিলেন যে নজরুল আর কতদিন বাঁচতে পারে? ডক্টর রায় মত দিয়েছিলেন যে নজরুলের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো আছে। তার এখনও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে। আমি কাউকে কিছু বলিনি, কমরেড গোপাল হালদারকেও কিছু বলিনি, কিন্তু আমি তখন পরিষ্কার বুঝে নিয়েছিলেম যে এই কমিটির আয়ু আর বেশী দিন নেই। সত্যই কমিটি উঠে গিয়েছিল এবং এখন জুলফক্কার সাহেবের লেখা হতে জানতে পারছি যে কোন্ অছিলায় তা তুলে দেওয়া হয়েছিল। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত মুস্‌লিম কবি সজনীকান্ত দাসকে এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও গিয়ে খবর দিয়েছিলেন যে নজরুলের বাড়ীতে তখনও খরচের বাড়াবাড়ি। প্রতিদিনই মিঠাই-মণ্ডা চলেছে। চারদিক হতেই টাকা আসছে। সেই প্রতিষ্ঠিত মুস্‌লিম কবি যিনিই হোন না কেন, তাঁর চেয়েও সজনীকান্ত নজরুলের পরিবারের সঙ্গে বেশী পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে নজরুলের বাড়ীতে গিয়ে সব কিছু নিজের চোখে একবার দেখে আসতে পারতেন। মুস্‌লিম কবির নামটি জুলফকার সাহেবকে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কেন সেই নামটি তাঁর পুস্তকে ছেপে দিলেন না? সেই কবির নাম ছাপানোতে যদি তাঁর বেধে থাকে তবে তিনি বনগাঁর মহকুমা হাকীমের কথা এত ফলাও করে ছাপালেন কেন? সকলেই তো বুঝে নিয়েছিলেন কে ছিলেন এই মহকুমা হাকিম।

নজরুলের মাসে দু'শ টাকায় সাহিত্যিক বৃত্তি

শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় সরকার মাসিক দু'শ টাকা হিসাবে কবি নজরুল ইস্‌লামকে সাহিত্যিক বৃত্তি মঞ্জুর করলেন। তাতেই নজরুলের পরিবার তখনকার মতো ধ্বংসের হাত হতে বেঁচে গেলেন। এত বেশী টাকার সাহিত্যিক বৃত্তি নজরুলের আগে বাঙলা দেশে অন্তত আর কেউ পান নি।

উনিশ শ' ত্রিশের দশক নজরুলের জীবনের একটি বিশেষ যুগ। এই দশকে সঙ্গীত সাধনার ভিতর দিয়ে নজরুলের অপরূপ সৃষ্টির তুলনা নেই। সে গান রচনা করেছে, গান শিখিয়েছে, এক কথায় আমাদের সঙ্গীতকে সে নূতন নূতন অবদানে সমৃদ্ধ করেছে। গ্রামোফোন কোম্পানীর সহিত সংযুক্ত থাকায় তার পরিশ্রমের অন্ত ছিলনা এবং একান্ত-ভাবে তাকে মস্তিষ্কের পরিশ্রমই করতে হয়েছিল অত্যন্ত বেশী। নজরুলের যে এত বড় রোগ তা নোটিস না দিয়ে আসেনি। সেই নোটিসের ভাষা শুরুতে শুধু নজরুলই বুঝেছিল। আমি আগেই বলেছি যে তখন সে বিজ্ঞানের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে তার রোগ যখন সকলের চোখে প্রকাশ পেল তখন চিকিৎসা হয়েছিল বটে, কিন্তু এই "প্রাথমিক চিকিৎসা অত্যন্ত অপরিমিত ও অসম্পূর্ণ হয়েছে।" তখনও অবশ্য কোনো কোনো ডাক্তার বলেছিলেন যে বড় দেরী হয়ে গেছে। তখন যদি কবিকে ইউরোপে পাঠানো যেতো তা হলে তার মস্তিষ্কে অপারেশন অন্তত হ'তে পারত। তবে, টাকা থাকলেও সেই সময়ে কবিকে ইউরোপে পাঠানো সম্ভব হতোনা। কেন না, বিশ্বযুদ্ধ চলেছিল। কিন্তু 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠিত হয়েছিল বড় দেরীতে,—১৯৫২ সালের জুন মাসে। চার মাস রাঁচিতে চেষ্টা করার পরে সস্ত্রীক কবিকে ইউরোপে (লণ্ডনে) পাঠানো হয়েছিল ১৯৫৩ সালের মে মাসে। ১০ই মে তারিখে তাঁরা হাওড়া স্টেশন হতে রওয়ানা হয়েছিলেন।

ইউরোপে নজরুলের চিকিৎসা

লণ্ডনে বড় বড় ডাক্তারেরা কবির রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। ডাক্তার রাসেল ব্রেন, ডাক্তার উইলিয়াম স্যারগ্যণ্ট ও ডাক্তার ম্যাককিস্‌ক্‌-এর মতো প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ কবিকে নিয়ে তিনবার বসেছিলেন। শুনেছি প্রত্যেক বৈঠকে তাঁরা ২৫০ পাউণ্ড হিসাবে ফিস নিয়েছেন। প্রবীণ চিকিৎসক ডাক্তার রাসেল ব্রেনের মতে

কবির মস্তিষ্ক বিকৃতি দুরারোগ্য। রোগীর রোগ সম্বন্ধেও লণ্ডনেই দুই দল বিশেষজ্ঞের মধ্যে প্রবল মতভেদ হয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, রোগী 'ইন্‌ভলুশনাল সাইকোশিস' রোগে ভুগছেন, অপরদল কলিকাতার বিশেষজ্ঞদের ডায়োগনেসিসকেই সমর্থন করেছেন। তবে উভয় দলীয় বিশেষজ্ঞদের মতেই **প্রাথমিক চিকিৎসা অত্যন্ত অপরিমিত ও অসম্পূর্ণ** হয়েছে। লণ্ডনের 'লণ্ডন ক্লিনিক' নামক হাসপাতালে কবির মস্তিষ্কে বাতাস পুরে 'এয়ার এনসেফ্যালোগ্রাফী' নামক এক্স-রে পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগ অর্থাৎ 'ফ্রন্‌টাল লোব'দ্বয় সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। ডাক্তার ম্যাক্‌কিস্‌ক্ প্রমুখ ডাক্তারগণ বলেন যে 'ম্যাক্‌কিস্‌ক্ অপারেশন' নামক অস্ত্রোপচার বিধির দ্বারা যদি কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগে অবস্থিত ফ্রণ্টোথ্যালমিক ট্রাক্ট নামক স্নায়ুপথ মস্তিষ্কের অপরাংশ হতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তবে হয়ত রোগীর বর্তমান অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বদভ্যাসগুলির উপশম হবে, কিন্তু ডাক্তার রাসেল ব্রেন এই মতের বিরোধিতা করেন। অতঃপর কবির রোগ বিবরণী ও পরীক্ষার রিপোর্টসমূহ ভিয়েনা ও ইউরোপের অন্যান্য বহুস্থানের চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা করানো হয়। জার্মানীর বন ইউনিভার্সিটির মস্তিষ্ক শল্য বিদ্যার অধ্যাপক, প্রফেসর রোয়েট্‌গেন বলেন যে, ম্যাক্‌কিস্‌ক্ অপারেশন কবি নজরুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভিয়েনার মস্তিষ্ক শল্যবিদ ডাক্তার ম্যাককিস্‌ক-এর মতের বিরোধিতা করেন। উপরিউক্ত তিন্‌জনেই কবির মস্তকে সেরিব্রাল অ্যান্‌জিওগ্রাফি নামক পরীক্ষা (এক্স-রে) করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কবির সুহৃদগণের ইচ্ছায় কবিকে (ভিয়েনায়) নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রফেসর হবাগনার ইয়াউরেগ-এর সুযোগ্য ছাত্র ডাক্তার হান্‌সহফ-এর অধীনে ভর্তি করা হয়। গত ৯ই ডিসেম্বর (১৯৫৩) বুধবার কবির উপর সেরিব্রাল অ্যান্‌জিওগ্রাফি পরীক্ষা করা হয়। ডাক্তার হফ্ এই পরীক্ষার ফলদৃষ্টে দৃঢ় মত প্রকাশ

করেন যে, কবিবর পিক্‌স্ ডিজিজ্ নামক মস্তিষ্কের রোগে ভুগছেন। উক্ত রোগে মস্তিষ্কের সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী অংশগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ডাক্তার হফের মতে রোগীর বর্তমান লক্ষণগুলি এই রোগের সহিত মিলে যায়। ডাক্তার হফ বলেন যে, কবির ব্যাধি এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, নিরাময়ের বিশেষ কোনই আশা নেই।"

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৭শে তারিখে কলকাতার "যুগান্তর" দৈনিকে "ভিয়েনায় নজরুল" নাম দিয়ে কলকাতার 'নিউরো সার্জন' ডাক্তার অশোক বাগ্‌চীর একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। ডাক্তার বাগচী তখন ভিয়েনায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করছিলেন। নজরুল ইস্‌লামের চিকিৎসার ব্যাপারের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্তও ছিলেন। ওপরের উদ্ধৃতি তাঁর সেই লেখা হতে নেওয়া। আজহার উদ্দীন খান তাঁর "বাংলা সাহিত্যে নজরুল" নামক গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে (৬১ ও ৬২ পৃষ্ঠা) 'যুগান্তর' হতে ডাক্তার বাগচীর লেখা তুলে দিয়েছেন। আমার উদ্ধৃতি আমি তা থেকেই নিয়েছি। জেলখানায় পুরানো 'যুগান্তর' পাওয়ার উপায় নেই। তবে "বাংলা সাহিত্যে নজরুলের" ওই অংশটা আমি ডাক্তার বাগচীকে দেখিয়ে নিয়েছি। আমার অনুরোধে এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকার তাঁর সঙ্গে আমার মুলাকাত মঞ্জুর করায়, তিনি দয়া করে দমদম জেলে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমি অনেক বিষয় বুঝতে পেরেছি। বন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রোয়েটগেন ব্যক্তিগত ভাবেও কবিকে পরীক্ষা করেছেন। ইংল্যাণ্ডের ডাক্তাররা কবিকে পরীক্ষা করার জন্যে মোটা ফিস নিয়েছিলেন, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য স্থানের ডাক্তাররা বাঙলার জাতীয় কবিকে পরীক্ষা করার জন্যে কোন ফিস নেন নি। নজরুলরা ইউরোপ ত্যাগ করার পরক্ষণেই পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় ভিয়েনা গিয়েছিলেন। নজরুলের ব্যাপারে তিনি ডাক্তার হানস হফের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। নজরুলরা ১৯৫৩ সালের ১৪ই

ডিসেম্বরের শেষ রাত্রে রোম হতে হাওয়াই জাহাজে কলকাতা ফিরেছিলেন।

সোবিয়েৎ চিকিৎসকগণের মত

লণ্ডনের ও ভিয়েনার ডাক্তারদের রিপোর্ট সোবিয়েৎ দেশের ডাক্তারদের নিকটেও পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা রিপোর্টগুলি অধ্যয়ন ক'রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফ্‌তরের মারফতে জানিয়েছিলেন যে কবি নজরুল ইস্‌লামের জন্যে সোবিয়েৎ চিকিৎসকগণের আর কিছুই করণীয় নেই।

কলকাতায় পানবাগান লেনের বাসায় নজরুলরা যখন এসেছিল তখন নজরুলের সঙ্গে আমাদের, কাজে কাজেই আমারও, সংযোগ যে আগের তুলনায় আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হয়েছিল একথা আমি আগে বলেছি। নজরুল তখন একান্তভাবে গানের রাজ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তার ওপরে গ্রামোফোন কোম্পানীর নিকট হতে নিমন্ত্রণ পত্রও পেয়ে গেছে, এই অবস্থায় ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংস্রবে গিরেফতার হয়ে আমি মীরাটে চলে যাই। অনেক ঘাটের জল খেয়ে আমি আবার কলকাতায় ফিরে আসি ১৯৩৬ সালের জুন মাসের ২৫শে কিংবা ২৬শে তারিখে। ফিরে এসে আমার পূর্ব পরিচিত নজরুলকে আমি আর পাইনি। যে নজরুলকে তখন আমি পেলাম পেশার দিক থেকে সে গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে একান্তভাবে বাঁধা। এই কোম্পানীর কোটরেই তখন তার আশ্রয়। আবার তার যোগ ও সাধনা ইত্যাদি কি কি চলেছিল সে-সম্বন্ধে আমি কোনো খবর নিইনি। যদিও আমরা পরস্পরের নিকট হতে দূরে সরে গিয়েছিলেম তবুও আমাদের সাধারণ কথাবার্তা আগের মতোই হয়েছে। আমি তার আধ্যাত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো কথাই তুলিনি। আমি জানতাম আমার কথার কোনো জওয়াব না দিয়ে সে চুপ
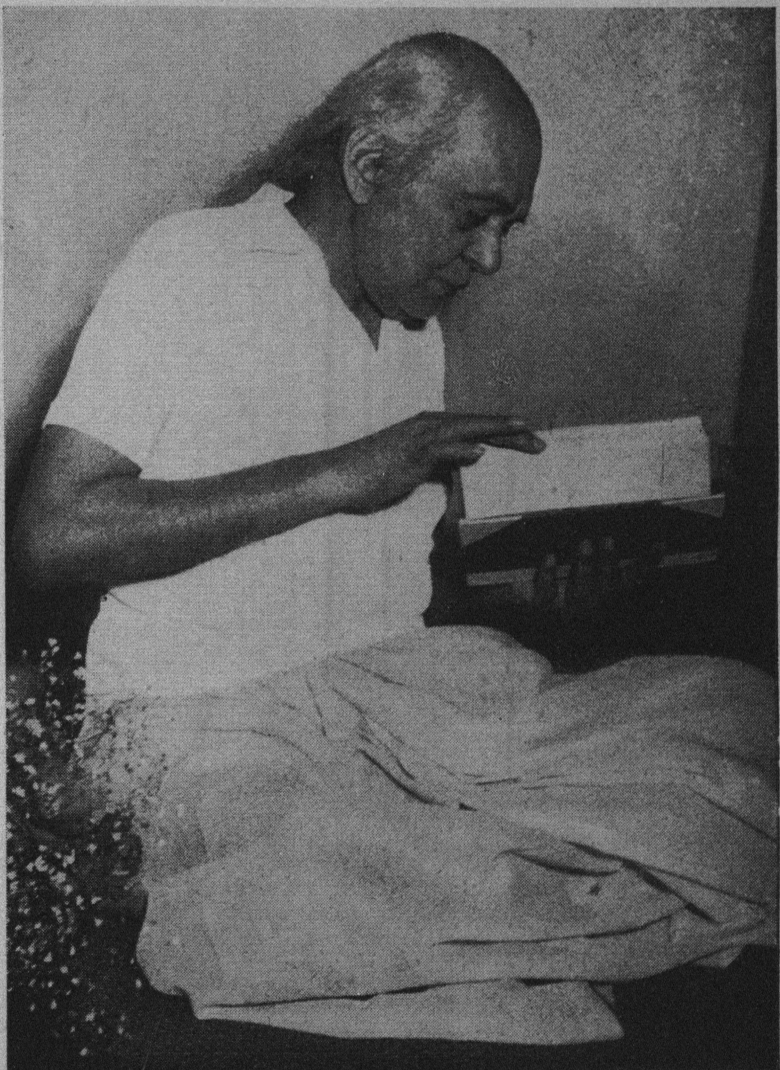
কাজী নজরুল ইস্‌লাম

(২৯শে ফাল্গুন ১৩৭১ সালে গৃহীত চিত্র)

করেই থাকবে। তার সঙ্গে আমার দেখাও এই সময়ে খুব কম হয়েছে। তার আর আমার মধ্যে কোনো আলোচনা হবেই বা কখন? কিন্তু আমি যখন জেলে ছিলেম তখন সে আবদুল কাদিরের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ১৯৩৭ সাল হতে যখন আমার নাতনী ও নাতিদের আগমন শুরু হয়েছে তখন সে তাদের ক'জনের নামকরণও করেছে। ১৯৩৬ সালের শেষ দু'মাস ও ১৯৩৭ সালের প্রথম দু'মাস আমি চন্দননগরে থেকেছি। তখন আমায় প্রায়ই কলকাতায় আসতে হতো এবং দু' এক রাত্রে কলকাতায় থাকতেও হতো। এই সময়ে নজরুলের সঙ্গে তার বাড়ীতে একদিন দেখা হওয়ায় সে বলল, যদি তোমায় কোনো দিন রাত্রে কলকাতায় থাকতে হয় তবে আমার এখানে থাকছ না কেন? এখানে তো থাকার জায়গা রয়েছে। তার পরে দু' এক রাত্রি আমি ওদের বাড়ীতে ছিলামও।

নজরুলের আধ্যাত্মিক যুগ ও আমি—আমরা পরস্পর হতে দূরে সরে গিয়েছিলেম

নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা হবে মনে ক'রে আমি নজরুলদের বাড়ী যেতাম না। আসলে যেতাম প্রমীলা ও গিরিবালা দেবীকে দেখার জন্যে। তাঁদের সঙ্গে দেখা করেই আমি চলে আসতাম। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন হয় তো নজরুলের সঙ্গেও আমার দেখা হয়ে যেতো। খুব বেশী ফুরসৎ তো আমারও ছিল না। পার্টির ও গণ-সংগঠনের সাংগঠনিক কাজে আমি ব্যস্ত থাকতেম। আমার ওপরে আবার পুলিসের কড়া নজর ছিল। এক দঙ্গল পুলিসের লোক পেছনে নিয়ে কারুর বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়াও আমি পসন্দ করতাম না। যাঁদের বাড়ীতে যেতাম তাঁরাও নিশ্চয় তাতে খুশী হতেন না। ১৯৩৭ সাল হতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার সাংগঠনিক কাজে প্রায়ই আমায় কলকাতার বাইরেও যেতে হয়েছে। ১৯৩৯ সালে (মাসের নাম ভুলে গেছি) প্রমীলার বাড়াবাড়ি অসুখের

সময়ে আমি তাকে হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়ে দেখে এসেছি। এই অসুখেই তার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। সব চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার পরে একদিন গিরিবালা দেবীকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এখন কি আর কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না? তিনি বললেন, লালগোলা হাই স্কুলের হেড্ মাস্টার শ্রীবরদাচরণ মজুমদার এখন হোমিপ্যাথিক ঔষধ দিচ্ছেন। তাঁরই নিকটে নজরুল দীক্ষা নিয়েছিল।

নজরুলের সুর-শিল্পী বন্ধুরা তার নিকটের বন্ধু ছিলেন কিনা সে-সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই। তবে, তার সাহিত্যিক বন্ধুরা ছিলেন তার অতি নিকটের বন্ধু। কিন্তু উনিশ শ' ত্রিশের দশকে সে যে আধ্যাত্মিকতার স্রোতে এমনভাবে ভেসে গেল তাতে কি তার বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে সকলের সম্মতি ছিল? আমার

নজরুলের আধ্যাত্মিক যুগে তার সাহিত্যিক বন্ধুরা

কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে তাঁদের সকলেই অলৌকিক ও অতি প্রাকৃত ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন। যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না তাঁরা চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই নজরুলকে বাঁচাতে পারতেন। তাঁরা কতটা কি করেছিলেন তা আমার জানা নেই। তবে, কিছু কিছু লেখা পড়ে এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে তার কোনো কোনো বন্ধু, তাঁরা তার সাহিত্যিক বন্ধুও ছিলেন, তার কুসংস্কারকে সাহায্য করেছেন।

এক সময়ে অমলেন্দু দাশগুপ্তের সহিত নজরুলের ঘনিষ্ঠতা খুবই

শেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তারই মতো আধ্যাত্মিক

বেড়েছিল। কালীপদ গুহরায়ও নজরুলের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁদের দু'জনকে সে পুনঃপ্রকাশিত দৈনিক 'নবযুগে' সঙ্গে নিয়েছিল। তাঁদের দু'জনার ঝোঁকই আধ্যাত্মিকতার দিকে ছিল। মনে হয় অমলেন্দু দাশগুপ্তের ঝোঁকটা ছিল কিছু বেশী। শ্রীকালীপদ গুহরায়ের সঙ্গে বহু বৎসর আমার দেখা হয় নি। তিনি নজরুলের

সাহিত্যিক বন্ধু হলেও তাঁর লেখাও আমি কখনও পড়িনি। তবে, এখন তিনি বানারসে সাধু হয়ে আছেন।

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেল হতে ১৯৪৪ সালের ১৭ই আগস্ট তারিখে জুলফকার সাহেবকে লিখেছিলেন :

"......কিন্তু কবির রোগের তো কোন উপশমই হইতেছেনা। কবির রোগমুক্তির একটা উপায় আমার গত চিঠিতে ছিল— 'যাঁরা ঈশ্বরজনিত এবং ঈশ্বর সদৃশ পুরুষ, তাঁদের কৃপা হইলে এই ব্যাধি অনায়াসে দূর হইয়া যাইতে পারে।' আপনি আমার সঙ্গে একমত হইয়াছেন। কিন্তু একমত হইলেই আমাদের কার্যসিদ্ধি হইবে না। তেমন লোককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমি যখন উক্ত পন্থাটির ইঙ্গিত করি, তখন এই ধারণাই ছিল যে, এর আড়ালের কথাটা আপনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু পারেন নাই। খুলিয়াই তাই লিখিতে হইল। হাঁ, তেমন লোক আছেন যাঁর ইচ্ছামাত্র এ ব্যাধি দূরীভূত হইবে। কিন্তু সে ইচ্ছাটি ঈশ্বর ইচ্ছার মতই আমোঘ অথচ তাঁরই ইচ্ছার মত mysterious, নিজের law নিজেই সৃজন করে, বাহিরের কোন কিছুর চাপ তাগাদা ইত্যাদির মজুরী সে খাটে না! যাক, এইটুকু জানিয়া রাখিয়া আপনাদের কর্তব্য আপনারা করিয়া যাইবেন। আমি সেই লোককে চিনাইয়া দিতেছি। বিনা দ্বিধায় পূর্ণ বিশ্বাসে আমার এই কথাটি গ্রহণ করিবেন। নজরুলের শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম একজনেই আমার কথিত লোক। তাঁকে আপনারা চেনেন, জানেন। আমার কাছ থেকে তাঁর এই পরিচয়টুকু জানিয়া নিন। তাঁর সঙ্গে তো আপনাদের দেখা হয়। তিনিও ওখানে জান নজরুলকে দেখিতে। তাঁর ইচ্ছা যদি হয়, বন্ধুর এ রোগ তিনি কালকে দূর করিতে পারেন। আমার কথা অবিশ্বাস করিবেন না।"

(জুলফকার হায়দর সাহেব লিখিত "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়," ১৯৮-১৯৯ পৃষ্ঠা)। শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্তের এই পত্রাংশ হতে তাঁকে বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। একই পথের পথিক জেনেই তিনি জুলফকার হায়দর সাহেবকে পত্রখানা লিখেছিলেন। এই পত্র লেখার বহু বৎসর পরে শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। জানাব জুলফকার সাহেব এখন ঢাকায় বসে কেবলই তস্‌বীহ্‌ (মালা) জপ করে যাচ্ছেন। শুধু তাঁর পুস্তকখানা লেখার জন্যে সাময়িকভাবে তিনি তাঁর তস্‌বীহ্‌ ছেড়েছিলেন। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে তাঁর নামের আগে 'সুফী' শব্দেরও যোগ হয়েছে। কিন্তু অভাগা নজরুল আজও রুদ্ধবাক্‌, সম্বিৎহীন ও জীবন্মৃত! অলৌকিক ও অতি প্রাকৃত ক্ষমতার অপার মহিমা !!

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর "কল্লোল যুগ" নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, "নজরুলের গুরু ছিলেন মোহিতলাল। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান নজরুলকে।"

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভুল

এটা যে তাঁর ভুল খবর সে দিকে কোনো কোনো লেখক তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমার লেখা "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে"তেও আমি তাঁর ভুল দেখিয়ে দিয়েছিলেম। তাঁর সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়েছিল তখন তিনি আমায় বলেছিলেন যে তিনি আমার পুস্তক পড়েছেন। তা ছাড়া, হালে তিনি নজরুলের বিষয়ে আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। শুনেছি তিনি 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' নাম দিয়ে নজরুলের একখানা জীবনী রচনায় লিপ্ত আছেন। কিন্তু খুব সম্প্রতি ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, তাঁর 'কল্লোল যুগে'র পঞ্চম প্রকাশ' বা'র হয়েছে। আমি বাইরে থেকে খবর নিয়ে জেনেছি যে এই পঞ্চম প্রকাশেও তিনি তাঁর ওপরে তুলে দেওয়া ভুলের কোনো সংশোধন করেন নি। তাঁর খবর যে ভুল এই সম্বন্ধে প্রমাণ পেয়েও

তিনি ভুল শোধরাতে রাজী হননি। গজেন ঘোষের আড্ডা থেকে নজরুলকে মোহিতলাল মজুমদারের কুড়িয়ে পাওয়ার কথা তিনি অজ্ঞতার বশে লিখেছিলেন। কিন্তু তারপরে তো তিনি 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদককে লেখা মোহিতলাল মজুমদারের সুদীর্ঘ পত্রখানা পড়েছেন এবং তা থেকে পরিষ্কাররূপে বুঝেছেন যে মোহিতলাল কিঞ্চিৎ সাধনা করেই নজরুলকে পেয়েছিলেন। সাহিত্য-বিচারে অচিন্ত্যকুমার তাঁর নিজের মত যেমন খুশী প্রচার করতে পারেন। কিন্তু যত বড় লেখকই তিনি হোন না কেন, ঘটনা বিকৃত করার কোনো অধিকার তাঁর নেই।

কাজী নজরুল ইস্‌লামের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে দেশে যে অনেক আলোচনা শুরু হয়েছে এটা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। আলোচনা যখন একবার আরম্ভ হয়েছে তখন তা যে চলতে থাকবে এ আশাও নিশ্চয় করা যায়। যাঁরা বলেন নজরুল একজন পদ্যকার মাত্র, কবিই নয়,—অবুঝ লোকেরা তাঁদের কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে আরও বেশী বেশী নজরুলের কবিতা পড়ছেন। ১৯২২ সালে প্রথম মুদ্রিত 'অগ্নি-বীণা'র এখন সপ্তদশ মুদ্রণ চলেছে, কোনো মুদ্রণেই দু'হাজারের কম ছাপা হয়নি। শুনেছি দু' হাজারের বেশীও ছাপা হয়েছে কোনো কোনো মুদ্রণে। কথা বলার শক্তি ও জ্ঞান হারাবার পরেও নজরুলের কবিতার মূল্য বিচার ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়েছেন। ভারত গবর্ন্মেণ্ট তাকে 'পদ্মভূষণে' ভূষিত করেছেন। একই সঙ্গে দু'টি রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান হতে নজরুল ইস্‌লাম সাহিত্যিক বৃত্তি পায়। পরে পরে আজহার উদ্দীন খান ও ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত নজরুলের দু'খানা বড় জীবনীও লিখেছেন। তার সম্বন্ধে ছোট ছোট বইও কয়েকখানা লিখিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও পুস্তক নজরুলের সম্বন্ধে রচিত হবে। হয়তো আরও সম্মান বর্ষিত হবে তার ওপরে।

কিন্তু আমি যে কথা বলতে চেয়েছিলেম। নজরুলের যে-ছবিটি বিভিন্ন লেখকেরা আঁকছেন তা তার সত্যকার ছবি হওয়া উচিত। কাজে কিন্তু তা হচ্ছে না, যদিও আঁকার মাল-মসলা তার বন্ধুরাই সরবরাহ করছেন। কেন জানিনে, ছবিটিকে চটকদার ক'রে তোলার দিকেই যেন তাঁদের ঝোঁক বেশী। এইভাবে বাড়াবাড়ি করলে আসল নজরুল হারিয়ে যায়। কেউ বলছেন নজরুল একজন জাত বোহেমিয়ান ছিল। কেউ বলছেন স্ত্রী-পুত্রের জন্যে তার মমতা ও দায়িত্ব বোধ ছিল না। তাঁদের ফেলে এক সপ্তাহের জন্যে কোথাও গিয়ে সে একমাস থেকে আসত। আবার একথাও কেউ বলেছেন যে তার মনের কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না। সে হঠাৎ অদ্ভুত ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসত। এই সব কথা যিনি বলবেন তাঁর উচিত গভীরভাবে নিজের স্মৃতিকে আলোড়ন করা যাতে সঠিক তথ্য তিনি সরবরাহ করতে পারেন। তা না হলে নজরুলের ছবিটিই বিগড়ে যাওয়ার ভয় থেকে যায়। যেমন ধরুন কথার কথা বলছি। নজরুল এক সপ্তাহের জন্যে গিয়ে কোনো খবর না দিয়ে এক মাস বাইরে থেকে গেল। তা হলে দেখতে হবে বারে বারে সে এই রকম করেছে কিনা। যদি মাত্র একবারই সে এই রকমটা ক'রে থাকে তবে তাকে কি নজরুলের স্বভাব ব'লে ধরে নেওয়া যায়? আর, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি মমতার কথা। বসন্ত রোগের মতো ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত পুত্রের শিয়রে বসে যে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিল এবং পুত্রের মৃত্যুর পরে শোকে যে পাগলের মতো হয়ে গেল, আমরা কি বলতে পারি যে পুত্রের প্রতি তার মমতা ছিল না? আর, ১৯৩৯ সালে স্ত্রী যখন কঠোর পীড়ায় আক্রান্তা তখন তার ব্যাকুলতা যিনিই দেখেছেন তিনিই আশ্চর্য হয়েছেন। স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। স্ত্রী যখন আর কিছুতেই ভালো হচ্ছে না তখন শিশু পুত্র দু'টিকে স্ত্রীর শয্যার পাশে টেনে এনে

নজরুলের বন্ধুদের ত্রুটি

বলল, "তোরা ধ্যানে বস্, বসে তাঁকে বল মা'কে ভালো ক'রে দাও।" নজরুল নিজেও বসল ধ্যানে। কিন্তু শিশু দু'টি তো ধ্যান বুঝে না। তারা কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে কাঁদতে লাগল। তাদের কান্না দেখে প্রমীলাও কান্না শুরু করে দিল।

এর পরেও কেউ কি বলতে পারেন যে স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তার মমতা ছিল না? জীবনে অবিবেচনার কাজ নজরুল অনেক করেছে। দায়িত্বহীনতার পরিচয়ও সে কখনও দেয়নি এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানীর ট্রেনারের ও হেড কম্পোজারের চাকরীর কাজ সে ঠিকই করেছে। এই কাজে তার আনন্দ ছিল সন্দেহ নেই, এই কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রে সে শরীরপাতও করেছে। কোনো কবিকে কোন্ অবস্থায় বোহেমিয়ান বলা যায় তা আমি বুঝি না। কিন্তু নজরুলের যে-সব কাজ ও আসক্তির কথা আমি বলেছি তাতে কি তাকে বোহেমিয়ান বলা যায়?

যাঁরা নজরুলের সম্বন্ধে চটকদার কথা বলেন ও লেখেন তাঁদের আমি একান্তভাবে অনুরোধ করব যে তাঁরা তাঁদের স্মৃতির সঙ্গে গভীরভাবে বোঝাপড়া ক'রে কথাগুলি বলবেন। নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকার যে লিখেছেন আগে হতে কোনো কথা নেই, বার্তা নেই, একজন লোক এসে কি প্রস্তাব করলেন, আর তৎক্ষণাৎ নজরুল গাঁটরি-বোঁচকা বেঁধে তার সঙ্গে কুমিল্লা রওয়ানা হয়ে গেল। এই কথাটা যে ঠিক নয় তা আমি এই পুস্তকের অন্য জায়গায় লিখেছি।

নজরুল সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা আগাগোড়া বানিয়েও বলছেন। যেমন 'জাগরণ' নামক মাসিক পত্রিকায় (কাগজখানা এখন আর নেই) একজন একবার লিখলেন যে একদিন তিনি নজরুলের বাড়ী যেতেই নজরুল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকুরিয়া লেকের ধারে বেড়াতে গেল। আবার তাঁরা ফিরেও এলেন নজরুলের বাড়ীতে। মনে রাখতে হবে যে তাঁরা হেঁটে গিয়েছিলেন এবং

ফিরেছিলেনও হেঁটেই . এসে দেখলেন প্রমীলা গলবস্ত্র হয়ে তুলসী তলায় প্রণাম করছে। নজরুলের জীবনে কলকাতায় তার সর্বদক্ষিণ বাসস্থান ছিল ইটালী এলাকার পানবাগান লেনে। সেখান থেকে কেউ পায়ে হেঁটে ঢাকুরিয়া লেকের ধারে বেড়াতে যান না। বেচারী প্রমীলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছিল। কিন্তু জাগরণের এই লেখাটি পড়ে তারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে কাগজের সম্পাদক আবদুল আজীজ সাহেবের নিকটে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল যে তার জীবনে সে কখনও তুলসী তলায় প্রণাম করেনি।

বানানো কথার একটি মাত্র নমুনা আমি এখানে দিলাম।

* * *

নজরুলের এখন দু'টি পুত্র সন্তান আছে। বড়র নাম কাজী সব্যসাচী ইস্‌লাম আর ছোটর নাম কাজী অনিরুদ্ধ ইস্‌লাম। কোনো মেয়ে তার নেই। নজরুল তার দুই ছেলের ডাক নামও নিজেই রেখেছিল, যথাক্রমে সুন্‌ইয়াৎ সেন ও লেনিন। সুন্‌ইয়াৎ সেনকে আমাদের দেশে সান্‌ইয়াৎ সেন বলা হয়। অনেকেই জানেন না, নজরুল তার ছেলেদের কি ডাক নাম রেখেছিল। ওদের দু'ভাইও জানে কিনা আমার সন্দেহ আছে। কারণ, সান্‌ইয়াৎ সেন এখন হয়েছে 'সানি' আর লেনিন হয়েছে 'নিনি'। 'সানি' আর 'নিনি' বিবাহিত। দু'জনার প্রত্যেকেই একাধিক সন্তানের পিতা। কবিত্বের কথা বাদ দিয়ে সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ পিতার কিছু কিছু গুণের অধিকারী। অনিরুদ্ধ সুরশিল্পীরূপে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত।

১লা জুলাই,
১৯৬৫

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি, কাব্য, গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও সংগঠনের বর্ণানুক্রমিক সূচী

ই

ঈ

উ

এ

ও

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

	যা আছে		যা হবে
পৃঃ ২১, লাইন ১১	করেছিলেম	—	করছিলেম
পৃঃ ৩৩, লাইন ৯	চৌধরানী	—	চৌধুরানী
ঐ লাইন ১০	চৌধরানী	—	চৌধুরানী
পৃঃ ৫২, লাইন ১২	কুমিল্লায়	—	কুমিল্লার
পৃঃ ৮১, ফুট নোট	দরাজস্ত্	—	দরাজদস্ত্
পৃঃ ৮২, লাইন ৪	থাকতাম	—	থাকলাম
পৃঃ ৮৮, লাইন ২	ভুলও	—	ভুল
পৃঃ ৯৫, লাইন ৫	ফজলুল সেলবর্সী	—	ফজলুল হক সেলবর্সী
পৃঃ ১৭৯, লাইন ২	মুক্তধার	—	মুক্তধারা
পৃঃ ১৮৫, লাইন ৭	পুনিয়া	—	পুর্নিয়া
পৃঃ ২০৭, লাইন ৬	উদ্বৃত	—	উদ্ধৃত
পৃঃ ২০৮, লাইন ১১	পুস্তকে যে লিখেছেন	—	পুস্তকে লিখেছেন
পৃঃ ২৩৪, লাইন ২৩	১৯১৯	—	১৯২১
পৃঃ ২৫৮, লাইন ২২	কালীর	—	কালীয়
পৃঃ ২৬২, ফুট নোট	প্রচলিত হয়ে	—	প্রচলিত না হয়ে
পৃঃ ২৮৯, লাইন ২১	ফটোস্টার্ট	—	ফটোস্টাট
পৃঃ ৩৪৪, লাইন ১১	লিখেদলীলখানার	—	লিখে দলীলখানার
পৃঃ ৩৫২, শেষ লাইন	উদ্ধৃতি	—	উদ্ধৃত
পৃঃ ৩৫৩, লাইন ১০	১৩২৩	—	১৯২৩
পৃঃ ৩৮৪, লাইন ১২	খুলিয়াছ	—	খুলিয়াছে
পৃঃ ৪২৭, লাইন ১৮	মনোকষ্ট	—	মনঃকষ্ট